ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ড. আব্দুলহামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান

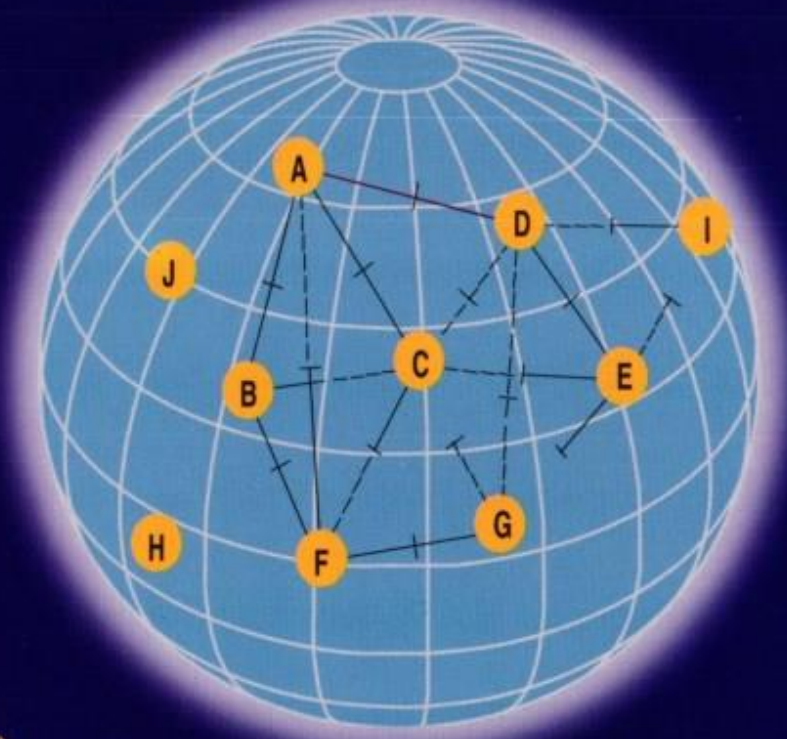

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
(বি আই আই টি)

ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ড. আবদুলহামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান

অনুবাদ

মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি)

www.pathagar.com

ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ড. আবদুলহামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান

অনুবাদ

মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি)

www.pathagar.com

ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ড. আবদুলহামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান

অনুবাদ ঃ
অধ্যাপক মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
(বি আই আই টি)
১৪৫ গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫ বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮০-২-৯১১৪৭১৬, ৯১৩৮৩৬৭
E-mail : biit org@yahoo.com
biit 89_info@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ২০০২ইং, শাওয়াল, ১৪২৩ হিঃ
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
ISBN-984-8203-30-3

প্রচ্ছদ ঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম

অক্ষর বিন্যাস ঃ মোঃ খোরশেদ আলম সরকার

মুদ্রক ঃ মাসরো প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ

মূল্য ঃ অফসেট ২৫০.০০ সাদা ঃ ২০০.০০

Islam O Antarjatic Shamparka is a Bengali translation of "Towards an Islamic Theory of International Relations" Written by Dr. Abdul Hamid A. Abu Sulayman, translated by Md. Prof. Zainul Abedin Majumder and pnblished by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), 145 Green Road, Dhaka 1205 Bangladesh.
Phone : 9114716, 9138367, Fax : 880-2-9114716, E-mail : biit org@yahoo.com, biit 89-info@yahoo.com
First Edition : December 2002
Price : White Tk. 200.00, Offset Tk. 250.00 US $ 15

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

'ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বইটি ডঃ আবদুলহামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান রচিত Towards an Islamic Theory of International relations বইটির বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে হানাহানির বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই বইটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ডঃ আবদুলহামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান এ বইতে মুসলিম চিন্তাধারায় যে সংকট রয়েছে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কুরআন এবং সুন্নাহর নীতিমালাকে সঠিকভাবে কার্যকর যোগাযোগের জন্য কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তা উদ্ভাবনের জন্য তিনি ইসলামী চিন্তাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রসারে ইসলামের শিক্ষাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী উপযোগী কারণ ইসলাম প্রকৃতভাবেই গ্লোবাল বা আন্তর্জাতিক। মানুষে মানুষে, গোত্রে গোত্রে, জাতিতে জাতিতে ঐক্যের যে মূলনীতি ইসলাম পেশ করেছে- তা কাংখিত বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একান্ত প্রয়োজন। অতএব বইটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছাত্র শিক্ষক সহ সকলের জন্য সুখপাঠ্য হবে বলে আমরা আশা করি। এ বই প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

মোঃ জহুরুল ইসলাম এফসিএ
সেক্রেটারী জেনারেল, বি আই আই টি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

মূল বইটি সম্পর্কে শহীদ ডঃ ইসমাইল রাজী আল ফারুকী ভূমিকা লিখেছেন, ডঃ আবদুলহামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান উপক্রমনিকায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। অনুদিত বইয়ের উপর মন্তব্য ও পরামর্শ রেখেছেন এদেশে উচ্চ মানের ইসলামী চিন্তা চেতনা বিকাশের অন্যতম পুরোধা, সাবেক সচিব ও বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান শাহ আবদুল হান্নান। এরপর বইটির গুরুত্ব, বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। অতি উচু মানের চিন্তা এ বইতে বিধৃত হয়েছে। প্রকাশ করা হয়েছে জটিল ইংরেজী বাক্যে। এ পরিস্থিতিতে বাধগম্য ও সুপাঠ্য বাংলায় বইটির রূপান্তর সত্যিই কঠিন বলে প্রতিভাত হয়েছে। অনুচ্ছেদের অনুবাদ অনেক সময় অনুচ্ছেদের শেষ দিক থেকে শুরু করতে হয়েছে। কারণ ইংরেজী বাক্যের বিন্যাস অনুসারে বাংলা করতে গেলে প্রকাশিত বক্তব্যের স্পিরিট ঠিক থাকে না। তাই এরূপ করতে হয়েছে। আরবী শব্দ, পরিভাষা ইত্যাদি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অননুদিত রাখা হয়েছে। কারণ এগুলোর সত্যিকার অর্থ প্রকাশক বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া দুষ্কর। যেমন জিহাদ শব্দটির মধ্যে যে ভাবধারা বিদ্যমান তা কোন বাংলা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এজন্য এটিকে অনুবাদ না করে আরবীই রাখা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টি বিশ্বমানবতার ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ ভাই ভাই, একই স্রষ্টার সৃষ্টি। এ পৃথিবীতে আমাদের জীবন, জন্ম, মৃত্যু, হাসি, কান্না, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, যেখান থেকে জীবিকা পাই, যে আলো বাতাস ভোগ করি তার সব কিছুর মধ্যে অনৈক্যের চেয়ে ঐক্যের উপাদানই বেশী পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের জ্ঞান, উপলব্ধি ও দৃষ্টির সংকীর্ণতার জন্য আমরা ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্যের উপাদানগুলোকেই বেশী বিকশিত করে বিশ্ব মানবতার সম্পর্ক ও শান্তিকে বিনষ্ট করেছি।

স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক থেকে উৎসারিত সম্পর্ক ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয় পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। বস্তুতঃ আল্লাহর নবীগণ সত্য, ন্যায়-নীতি, এবং পরস্পরের বিপর্যস্ত সম্পর্ককে পুনঃস্থাপন করার জন্য যুগে যুগে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এজন্য পবিত্র কুরআনে মানব সম্পর্কের মৌলিক ভিত্তি, নীতিমালা ও আদর্শ রয়েছে। এসবের অনুসরণ ও অনুশীলনের মধ্যেই মানুষে মানুষে উন্নততর সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত এ সংক্রান্ত নীতিমালা স্থান কাল পাত্র ও প্রেক্ষিত

www.pathagar.com

বিচারে উপলব্ধি করতে হবে। কিন্তু মুসলিম মানসে সুদীর্ঘ কালের সংকটে জ্ঞান ও উপলব্ধির জগতে দৈন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এ দৈন্যতাকে কাঠিয়ে উঠার জন্য আমাদের আলেম সমাজ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে কুরআন ও হাদিস এবং পদ্ধতি বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

লেখক আব্দুলহামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান এ বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য ইঙ্গিত করেছেন।

কুরআন ও হাদিসের কাংখিত মানব সম্পর্ক সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যিনি আমাদের জীবন মৃত্যুর মালিক, যার করুণাধারা প্রবাহিত এ বিশ্বচরাচরে, তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কের একটি ব্যাপার আছে। তাছাড়া জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মানুষ পরস্পরের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এজন্য পরস্পরের কল্যাণের স্বার্থেই জাতিগত ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ন্যায় পরায়ণতার উপর বিকশিত হওয়া উচিৎ। এরূপ একটি নীতিমালার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ এর আদর্শে। কিন্তু ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো সম্পর্কের উন্নয়নের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। এ বিষয়গুলোকে কুরআন ও সুন্নাহর নামে চালিয়ে দেয়া হয়। অথচ এসব সত্যিকার অর্থে কুরআন ও সুন্নাহর মৌল আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা তা গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পুনর্মূল্যায়নের দাবী রাখে। বইটিতে এ বিষয়গুলোর প্রতি ইসলামিক চিন্তাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষকে একটি ন্যায়ানুগ ব্যবস্থাধীনে আনার জন্য জাতি সংঘসহ ইতিপূর্বেকার সকল উদ্যোগ স্বীয় অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ইসলামই একমাত্র কালজয়ী আদর্শ যা থেকে উৎসারিত নীতিমালা সঠিক ভাবে বিকশিত হলে মানবজাতির জন্য পৃথিবীতে একটি শান্তির নীড় রচনা করা সম্ভব।

আমি আশা করি বইটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকুশলী, গবেষক, চিন্তাবিদ সহ সকল মুসলিম অমুসলিম পাঠক বৃন্দের চিন্তা ভাবনায় নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। এই বইয়ের অনুবাদ দেখে দিয়ে, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন অনুর্ভুক্ত করে এবং সময়ে সময়ে পরামর্শ দিয়ে বি, আই, আই, টি-এর উপদেষ্টা সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বি, আই, আই টি-এর সেক্রেটারী

www.pathagar.com

জেনারেল জনাব জহরুল ইসলাম সহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এব্যাপারে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আমার স্ত্রী ফেরদৌসী খানম, মেয়ে সুরাইয়া ও মারিয়া এবং ছেলে এস, এ মজুমদার ও এন, এ, মজুমদার অনুবাদে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সুহৃদ ছাত্র লুবাইন চৌধুরী মাসুম বইটির আরবী অংশের অনুবাদ ও পাদটীকার ক্ষেত্রে শ্রম দিয়েছে। আমি তাঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। এ বই এর মূল লেখক, আইআইআইটি, বিআইআইটি এবং এর মুদ্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট মাসরো প্রিন্টার্সসহ সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বইটির ত্রুটি বিচ্যুতি সুহৃদ পাঠক বৃন্দ নজরে আনলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেয়ার ইচ্ছা রইল।

আল্লাহ হাফেজ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার আব্বা মরহুম বশির উদ্দিন মজুমদার

ও

আম্মা মরহুমা জরিনা বশির এর রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

বইটির অনুবাদ প্রসংগে

ডঃ আবদুলহামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান রচিত *টুওয়ার্ডস এন ইসলামিক থিওরী অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স* বইটি আমি পড়েছি। এর অনুবাদও দেখলাম। আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রাচীন মুসলিম চিন্তাধারার তাত্ত্বিকদিক ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে যে সংকট বিদ্যমান লেখক সে সম্পর্কে গভীর অর্ন্তদৃষ্টি প্রসূত চিন্তা ভাবনা তুলে ধরেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, এর গতি প্রকৃতি ও কর্ম কৌশল সম্পর্কে প্রয়োজন গভীর অণ্বেষণ। এ বিষয়ে আমাদের তথ্য ভান্ডারের উৎসে যা কিছু আছে, যেভাবে আছে, সেগুলো খতিয়ে দেখা দরকার। সময় কালের প্রেক্ষিতে বিষয়গুলোকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। লেখক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের তথ্যাবলীকে পুনর্মূল্যায়ন করে আল কুরআন ও হাদিস এর আলোকে ও প্রজ্ঞামূলক দৃষ্টি দিয়ে সেগুলোকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে উপলব্ধির জন্য তাগিদ দিয়েছেন। পন্ডিতবর্গের দৃষ্টিকে আরও প্রসারিত করার জন্য তিনি বলেছেন। বহু ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি তিনি অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে, বল সংঘাত নিরসনে এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নে ইসলাম কার্যকর ও উজ্জল ভূমিকা রাখতে পারে। যে বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, সেগুলোর নিরসনে আরো দূরদৃষ্টি দিয়ে আমাদের সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। দৃষ্টি দিতে হবে প্রেক্ষাপট বিচারে কোন ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা খুজে বের করার জন্য। মানুষের মর্যাদা, ঐক্য, সংহতি এবং সম্পর্কের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি, কর্মকৌশল এবং ঐগুলোর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার প্রতি লেখক ইঙ্গিত করেছেন। ইসলামী নীতি আদর্শকে সঠিকভাবে তুলে ধরা গেলে এর ছায়াতলে মানুষ শান্তির প্রত্যাশায় আশ্রয় নেবে। বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা এ বিষয়ে অধ্যয়ন করে, যাঁরা পড়ান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশে বিদেশে কর্মে নিয়োজিত আছেন, তাঁদের সকলে এর মধ্য হতে দিক নির্দেশনা পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

বইটির ভাব উঁচুমানের এবং ভাষা অত্যন্ত জটিল। বিষয়টিকে ছোট ভাই অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার বাংলায় সহজ ও সরল ভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন বলে আমি মনে করি। এ কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে যাযা দিন। বি. আই. আই. টি বইটি প্রকাশ করে আরও একটি বিরাট কাজ করলো। আমি সকলের মঙ্গল কামনা করি। আল্লাহ হাফেজ।

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব

www.pathagar.com

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৬

মুখবন্ধ ঃ প্রথম সংস্করণ ২১

ভূমিকা ঃ ইসমাইল রাজী আল ফারুকী ২৭

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি ৪৭

প্রাথমিক ও মৌলিক সংজ্ঞা সমূহ ৪৭

ঐতিহ্যবাদ এবং পাশ্চাত্যবাদ ৪৯

সিয়ার ঃ আইনের একটি উৎস ৫১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব এবং তৎপরবর্তী বিকাশ

সিয়ার এর ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব ৬৩

ক্ল্যাসিকাল মুসলিম তত্ত্বের প্রকৃতি ৬৩

মৌলিক সংজ্ঞা সমূহ ৬৪

জিহাদ; দারুল ইসলাম; দারুল আহদ, দারুল হারব ৬৪

আল আহদ এবং আল আমান ৭০

আল মুশরিকুন, আল জিম্মা এবং আল জিয্‌য়া ৭২

খলিফা, আমীরুল মুমিনীন, ইমাম এবং সুলতান ৭৯

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম চিন্তাধারার ঐতিহাসিক মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি ৮৩

নাস্‌খ ঃ ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল ধারণা ৯০

সহিষ্ণুতা এবং ঐক্যঃ একটি কালোত্তীর্ণ উত্তরাধিকার ৯১

সহিষ্ণুতা এবং ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রতি সম্মান ৯৩

উম্মার ঐক্য ৯৭

ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য দিক ৯৯

www.pathagar.com

ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার অবক্ষয় ১০১
আধুনিক পরিবর্তন ঃ পদ্ধতি বিজ্ঞানের অভাব ১০৩

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

পদ্ধতি বিজ্ঞানের সংস্কার ১১১
মুসলিম পদ্ধতি বিজ্ঞান ঃ একটি স্থানকাল-সমস্যা ১১২
মুসলিম চিন্তাধারায় প্রধান উসূলের ছাপঃ ১১৪
উসূল ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি ১১৭
কুরআন ১১৮
সুন্নাহ্ ১১৮
কিয়াস ঃ (সদৃশ বর্ণনা) ১২২
সুন্নাহ এবং স্থান-কাল মাত্রা ১২৩
কুরআনে প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ ১২৭
ইজমা এবং পরিবর্তনশীল দুনিয়া ঃ ১৩৪

মৌলিক ত্রুটি বিচ্যুতি
পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাব ঃ ১৩৬
সার্বিক শৃংখলায়নের অভাব ১৪২
সার সংক্ষেপ ১৪৪

চতুর্থ অধ্যায়

বিধি বিধান থেকে রাজনৈতিক চিন্তায়ধারা ১৪৭
ইতিহাসের পুনর্গঠন ঃ নবী করিম (সঃ) বহিঃসম্পর্কীয় নীতির
রাজনৈতিক যৌক্তিক ভিত্তি ঃ ১৪৮
বদরের যুদ্ধের যুদ্ধবন্দী ১৪৯
বনু কুরাইযা ঃ নিরাপত্তা ও মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে চরম ব্যবস্থার ব্যবহার ১৫২
কুরাইশ ঃ পরাজিতদের জন্য সম্মান ১৫৭
ধর্ম এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা ১৫৮
কুরআনের ব্যাখ্যায় ধারাবাহিকতার পুনর্গঠণ ১৬৬
রহিতকরণ (নাসখ) ১৬৬
কুরআনের আভ্যন্তরীণ পদ্ধতির তাৎপর্য ১৬৯

www.pathagar.com

কুরআনে বাস্তব ঘটনার তাৎপর্য ১৭০
কুরআনের আভ্যন্তরীণ কাঠামো ১৭১
ধর্মান্ধতা হতে যুক্তিবাদে ১৭৫
ইসলামী কাঠামো ১৭৯

মৌলিক নীতি

তাওহীদ ১৮০
ন্যায় বিচার (আদল) ১৮১
শান্তি পারস্পরিক সমর্থন এবং সহযোগিতা ১৮২
জিহাদ ১৮৮
শ্রদ্ধাবোধ এবং অঙ্গীকার পূরণ ১৯০
মৌলিক মূল্যবোধসমূহ ১৯২
আধুনিক বিশ্বে বহিঃসম্পর্ক বিষয়ে মুসলমানদের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির কাঠামো ১৯৪
গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম নীতিমালার মূল্যায়ন ২০১
কূটনীতি এবং মৈত্রীর কৌশলসমূহ ২০২
নিরপেক্ষতার কৌশল সমূহ ২০৯
সার সংক্ষেপ ২১৫

পরিশিষ্ট (Addenda/Appendix)

প্রথম অধ্যায় ২১৯
দ্বিতীয় অধ্যায় ২২১
তৃতীয় অধ্যায় ২২২
পরিভাষা (Glossary) ২২৩
গ্রন্থ বিবরণী (Bibliography) ২২৭
বি আই টি প্রকাশনাসমূহ ২৪৪

www.pathagar.com

মুখবন্ধ ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ

এ বইয়ের প্রথম সংস্করণ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিরও হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন। এ প্রেক্ষাপটে জাতিসমূহের মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্ক, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের গৃহীত কর্মপন্থা পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে সংশ্লিষ্ট অধ্যায় সমূহের পুন র্মূল্যায়ণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ এমন সময়ই প্রকাশিত হল।

গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ততার জন্য আমি বইটির জন্য পূর্বে তেমন সময় দিতে পারিনি। বস্তুত পক্ষে সময় স্বল্পতার জন্য আমাকে কেবল বইটির একটি নতুন মুখবন্ধ লিখে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম নীতি পর্যালোচনার উপর শিরোনামে কিছু সংযোজন করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সে প্রেক্ষিতে মুসলিম বিশ্বের জন্য প্রণীত নীতির অবশ্যই বিবেচনা হওয়া উচিৎ। এভাবে পর্যালোচনা করে দেখা যায় ঐ নীতিগুলো ইসলামী উম্মাহ এবং তার লক্ষ্য সমূহ হাসিল করার ক্ষেত্রে কতদূর কার্যকর।

সাম্প্রতিক কালের আন্তর্জাতিক বিকাশ এবং মুসলিম বিশ্বের জাতি সমূহের অবস্থা আমার সুদীর্ঘ জীবন এবং অভিজ্ঞতার আলোকে লব্ধ উপসংহারগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এসব উপসংহার আমার সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত "Crisis in the Muslim Mind" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এসব সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমার পর্যাবেক্ষণ হল এই যে, পরিবর্তন আসতে হবে উম্মাহ এর বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভিতর হতে। সংস্কার শুরু করতে হবে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কারের মাধ্যমে, বিশেষ করে ইসলামী উদ্দেশ্য সমূহ সম্বলিত যৌক্তিক নীতিমালা এবং দৃষ্টি ভঙ্গির উপর ভিত্তি করে রচিত চিন্তার সুশৃংখল এবং পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি বিজ্ঞানের মাধ্যমে।

উম্মাহর অধঃপতনের মূল কারণগুলো কি তা উপলব্ধি করা মুসলিমদের জন্য সম্ভব হবে যদি মুসলিম চিন্তা ভাবনার সংস্কার করা সম্ভব হয়। মুসলমানগণ বর্তমানে যে সমস্ত সমস্যায় জর্জারিত সেগুলো থেকে নিজেদেরকে উত্তরণ করা সম্ভব হবে যদি তাঁরা এ কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন। এটা করতে পারলে তাঁরা নতুন উদ্যোগে গ্রহণ করতে পারবেন, ঐ সমস্ত উদ্যোগ যা তাঁরা আধ্যাত্মিক, বুদ্ধি বৃত্তিক এবং বস্তুগত সম্পদকে কার্যকর ভাবে ইসলামিক লক্ষ্য সমূহ অর্জনে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এভাবেই তাঁরা মানব জাতির অবশিষ্টাংশের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন, যেভাবে ইসলাম তার উম্মাহ এবং সামগ্রিক ভাবে সমগ্র সভ্যতার জন্য কাজ করে।

আভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় সাম্প্রতিক কালের আফগানিস্তানের মুসলমানদের অভিজ্ঞতা থেকে। সোভিয়েট

www.pathagar.com

ইউনিয়নের আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় মুজাহিদগণ বিজয়ী হলেও যুদ্ধ পরবর্তী রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এ বিষয়টিই পরিস্ফুট হয় যে, এ জন্য প্রয়োজনছিল বুদ্ধিবৃত্তিক সহ ব্যাপক সংস্কারের। মুসলিম মানসের সংস্কার সাধিত না হলে সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং রাজনৈতিক সাফল্যের মেয়াদ হবে স্বল্পকাল স্থায়ী এবং অকার্যকর।

আমার গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল সমূহের একটি থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহ বিভিন্ন স্তরে এবং ফোরামে পারস্পরিক সাহায্য এবং সহযোগিতার নীতি বিকশিত করবে। গবেষণাগুলোর আরও একটির ফলাফর অনুসারে বিভিন্ন ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ হচ্ছে যে, আমার পর্যবেক্ষণ সঠিক। চলমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে আঞ্চলিক জোট গঠনের প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে যে সমস্ত রাষ্ট্র নিজেদের অন্য রাষ্ট্রের সাথে জোট বদ্ধ করা থেকে দূরে রাখতে চায়, তারা নিজেদের সবল জাতি এবং জনগণের অবজ্ঞার শিকারে পরিণত করবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং তার ধর্ম নিরপেক্ষ বস্তুবাদী এবং একদলীয় ধাঁচের মার্কসবাদী সমাজ ব্যবস্থার পতনের পরও মুসলিম বিশ্ব যে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হয় তার অবসান ঘটেনি। বরং ঐ সমস্ত ভয়ঙ্কর অবস্থা আরও অবনতির দিকেই যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক অবস্থার যেসব নতুন পরিস্থিতি জাতীয়তাবাদী এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত (সাবেক দুই শক্তির ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিতগুলোর বিপরীতে) সেগুলো কেবল জাতিগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টির কাজই করে যাচ্ছে। এরূপ একটি পরিবেশে আবেগ এবং নেতিবাচক ধারণা কেবল আগ্রাসন এবং হৃদয়হীন ধ্বংশ লীলার দিকেই অবিশ্বম্ভাবীরূপে নিয়ে যায়। এটা এখানে প্রনিধানযোগ্য যে সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং এর অঙ্গরাজ্য সমূহের যেসব অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং সামাজিক সমস্যার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, সে অবস্থা সমভাবে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে ও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ অবস্থার মূলে রয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষ বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টি যার অংশীদার হল সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতা।

এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে উম্মাহ এবং তার অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের জন্য সুস্থ চিন্তা ধারা পুনর্জাগরণের কোন বিকল্প নেই। এরই মাধ্যমে সম্ভব মন তাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় জীবনী শক্তিকে সক্রিয় করে তোলা। এটা করা গেলে উম্মাহ তার হারানো রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারের দাবী নিয়ে দাড়াতে পারবে। যদি এটা করা যায় তাহলে মুসলমানদের এরূপ একটি নতুন প্রজন্মের আত্মপ্রকাশ ঘটবে যাদের উপলব্ধিতে থাকবে উম্মাহ-এর ধারণা এবং এর ঐক্য, সংহতি, এবং সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিষয়।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক জোটসমূহের অস্তিত্ব এটা অনিবার্য করে তুলেছে যে, অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা জনিত পরিমন্ডলে দীর্ঘকালীন এবং স্বল্প কালীন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যথাযথ সহযোগিতার জন্য মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহ সৃষ্টি ধর্মী এবং কার্যকর নীতিমালার বিকাশ সাধন এবং প্রয়োগ করবে। যদি তা সম্পন্ন করা যায় তবেই কেবল এ সমস্ত রাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অন্তরালে লুকায়িত মিষ্টি কথার কুটনীতির আবরণে ঢাকা স্বৈরাচারী উপনিবেশিক আকাংক্ষার শিকারে পরিণত হওয়া থেকে নিজেদের এবং স্বীয় স্বার্থকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

ইতোমধ্যেই বেশ কিছু সংখক নেতা এবং চিন্তাবিদ ইসলাম এবং মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে তাঁদের সন্দেহ, এমনকি আক্রমণাত্মক মনোভাবকে উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ করেছে। এ ধরনের উক্তির ভেতর দিয়ে সুস্পষ্টভাবেই এ অঞ্চলের উপর প্রভাব ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য পাশ্চাত্যের মনোভাব প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এসমস্ত বক্তব্যের আরও একটি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য হল নতুন নতুন রনক্ষেত্রের অনুসন্ধান করা যেখানে তারা তাদের মিত্রদের জড়ো করতে পারবে (যেমন সকলের একটি সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে)। এরূপ করে তারা ঐ সমস্ত ইস্যু থেকে নিজেদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয় যা তাদের নিজেদের ঐক্যের জন্য হুমকী স্বরূপ।

উম্মাহ এর নেতৃবৃন্দের এমন সব ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা রয়েছে যেগুলোকে অবহেলা করা যায় না। মঙ্গলদের, ক্রুসেডারদের, গ্রানডার এবং জেরুজালেমের ইতিহাসের পুনর্নাবৃত্তি একটি ভয়ংকর ব্যাপার। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সংস্কার ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। শক্তিমান ছাড়া কেউ নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারছেনা। সম্মান, ব্যবসা, সহযোগিতা কেবল তাদেরই জন্য যারা সমমানের এবং অংশীদার।

ব্যক্তির হৃদয় থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য শান্তির দর্শন কখনও বাস্তবায়িত হবে না অথবা এ দর্শন সত্যতার সংস্কারেও অংশগ্রহণ করবে না; যদি না তা জীবন্ত ইসলামী মডেল থেকে উৎসারিত হয়। এরূপ মডেল হবে উম্মাহ এর জনগণ এবং চিন্তাবিদদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিভূ।

মুসলিম বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী (যেমন দুর্নীতি পরায়ন রাজনৈতিক শাসনকালের জন্য পাশ্চাত্যের সমর্থন, সামরিক জান্তার জন্য সমর্থন অথবা মুসলিম জনগণের জন্য তাদের নেতৃত্ব নির্বাচনের অধিকারকে স্বীকার না করা, বিশেষ করে যখন ঐরূপ নেতৃত্ব ইসলামি ধাঁচের হয়) থেকে এ বিষয়টিই পরিস্ফুট হয় যে, পাশ্চাত্য ইসলামকে বুঝতে সক্ষম হয়নি। বরং ইসলামকে মধ্যযুগীয় বিবেচনা থেকে উৎসারিত রঙ্গে রঞ্জিত করেই দেখছে। এজন্য এটা অত্যন্ত জরুরী যে, মুসলিম চিন্তাবিদগণকে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি কি, তা উপলব্ধি করতে হবে। তাঁদেরকে উপলব্ধি করতে হবে সহযোগিতা এবং জনগণের মধ্যে সহঅবস্থান-এর পন্থাসমূহ, এসব বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য

www.pathagar.com

তাদেরকে অনেক কিছু শিখতে হবে। এর পরই তাঁরা পরামর্শ দিতে পারবে। ইসলামের ভূমিকা হল মানবজাতির কল্যাণের জন্য এবং সভ্যতার উন্নয়নের জন্য অবদান রাখা। অর্থনীতির অঙ্গনে ইসলামের উদ্দেশ্য হল সামাজিক সংশোধন, বাজার অর্থনীতি হল এর মাধ্যম। একইভাবে ব্যক্তি এবং দলের অধিকারের প্রতি ইসলাম অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিশ্বাস এবং জীবন পদ্ধতির প্রেক্ষিতে এ অধিকার সাধারণভাবে সমাজের অন্য ব্যক্তির, দলের, জনগণের অথবা জাতির জন্য ক্ষতিকারক হবে না। ইসলামের অঙ্গীকার ন্যায়পরায়নতার প্রতি। সকল প্রকার বাহুল্যতা, শারীরিক এবং নৈতিক অপরাধের বিরোধী ইসলাম। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা অবশ্য সংস্কার অথবা ন্যায়পরায়নতার ব্যাপারে উদাসীন। তৎপরিবর্তে অবাধ আচরণ এবং অপবিত্রতার জগতে প্রবেশ করার দরজা খুলে দিয়েছে পাশ্চাত্য। ফল দাড়িয়েছে এই যে, পরিবার এবং সমাজ এখন অপরাধের ভয়ংকর হুমকীর করলে। তাদের মনজগত আক্রান্ত হয়েছে দুরারোগ্য ব্যধিতে। আর যৌনরোগের বিস্তারতো ঘটছে দ্রুত গতিতে।

মুসলিম চিন্তাবিদদের এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, সংস্কার এবং শান্তির বিশ্বজনীন আদর্শ হিসাবে ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভ করে উম্মাহকে রোগমুক্ত করা তাঁদের দায়িত্ব। তদুপরি মুসলিম মানসের সংশোধন তথা উম্মাহ-এর সংশোধন প্রক্রিয়া কোন ভৌত সীমারেখার মধ্যে সীমিত থাকবে না। বরং তা সম্প্রসারিত হবে পৃথিবীর আনাচে কানাচে এবং সমকালীন সভ্যতার সর্বত্র। বর্তমান বিশ্বপল্লী এবং বিশ্ববাজারে একাকিত্ব কোন উপযুক্ত পছন্দ হতে পারেনা। বরং এজন্য দরকার একটি সাধারণ মাত্রার নীতিমালা, মূল্যবোধ এবং বিবেচনা যা বিশ্ব সমাজকে মানবীয় অস্তিত্ব রক্ষা এবংকাজ করার সুযোগ দেবে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, মুসলিম বিশ্বে সংস্কার, বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কার মুসলিম নেতৃত্ব এবংতাঁদের ভয় ও অজ্ঞতার স্থবির প্রকৃতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। একইভাবে ধর্মযুদ্ধের স্পিরিট এবং উপনিবেশিক শ্রেষ্টত্বের স্বপ্ন সাম্প্রতিক সভ্যতার স্বার্থ রক্ষা করবে না। এসব উপাদানের সবগুলোই বর্তমান সভ্যতার সংস্কারের জন্য বড় ধরনের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যায়। সাম্প্রতিক পৃথিবীর সভ্যতা যে ভাবে আগ্রাসন এবং সশস্ত্র সংঘাতের ব্যধিতে আক্রান্ত সে ক্ষেত্রেও এ উপাদানগুলোই সংশ্লিষ্ট।

বর্তমান পৃথিবীর অবস্থান হল একটি নতুন সন্ধিক্ষণে। এ অবস্থান একে নিয়ে যাবে সংস্কার অথবা সংশোধনের দিকে। অথবা নিয়ে যাবে ধীরে ধীরে সংঘাত এবং ধ্বংসের দিকে। এর অনেক কিছুই নির্মিত হবে ইসলামের বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তাবিদগণের দ্বারা। কারণ তাঁরা সংস্কারের পথ ধরে এগোণ। একই ভাবে সংস্কারের গতি কি হবে তা নির্নিত হবে উম্মাহর সামাজিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বারা, তা আরও নির্নিত হবে বিশেষ করে

www.pathagar.com

শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবংসাধারণ ভাবে উম্মাহর ক্ষেত্রে, সহযোগিতা এবং সংস্কারের নীতিমালা বাস্তবায়নে তাদের দক্ষতা দ্বারা।

দুর্ভাগ্যক্রমে কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্র সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গির বশবর্তী হয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের মুসলমানদের মুক্ত করার জন্য নিষ্ফল এবং বিভ্রান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তাঁদের কর্ম এবং নীতিমালা দ্বারা তাঁরা অন্যদের আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করেছে। ধ্বংশ করেছে মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যকার সহযোগিতার সম্ভাবনাকে। মুসলমানদের অবশ্যই সহনশীলতার শিক্ষা নিতে হবে। সংহতি অর্জন করতে চাইলে তাঁদেরকে পরস্পরের প্রতি হতে হবে শ্রদ্ধাশীল। এসব কিছুর জন্যই প্রয়োজন, সর্বাগ্যে প্রয়োজন, মুসলিম মানস এবং বুদ্ধি বৃত্তির সংস্কার।

এই বইটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এতে যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছিল তার অনেকগুলোই উম্মাহর বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। তবুও এ বইতে আরও কিছু বিষয় আছে যেগুলো সম্পর্কে কেবলমাত্র কতিপয় পাঠক ওয়াকেফহাল হতে পারেন। গ্রন্থকার এ বইতে উল্লেখিত বিষয়ে আলোচনা এবং সমালোচনা আহ্বান করছেন। কারণ একমাত্র বাস্তব আলোচনার মাধ্যমেই ধারণা বিকশিত এবং পরিস্কার হতে পারে। এ বইয়ের এবং লেখকের উদ্দেশ্য মুসলিম চিন্তাধারা এবং সমাজের সংস্কারের জন্য নবযাত্রার সূচনা করা। বহু শতাব্দী ধরে আলোচনা এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবংবুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদানের প্রক্রিয়া এক স্থবির রূপ লাভ করে আছে। মুসলিম মানসে সৃষ্টি হয়ে আছে বন্ধ্যাত্ব এবং উত্তেজিত ভাব।

উপসংহারে আমি এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। চূড়ান্ত সম্পাদনার কাজটি সম্পাদন করেছেন ওয়াই, টি ডিলোরেঞ্জো (Y.T. De Lorenzo)। তিনি বইটির নির্ঘন্টও প্রস্তুত করেছেন। জে উইলাফবি (Jay Willoughby) পুনসংশোধিত বইয়ের শৈলীগত সম্পাদন করেছেন। ইয়াহিয়া মনাস্ট্রা (Yahya Monastra) যত্নসহকারে বইটির পাদটীকা এবং গ্রন্থাবিবরণী প্রস্তুত করেছেন। আই আই আইটি এর লন্ডন অফিস কষ্ট স্বীকার করে বইটির প্রুফ দেখেছেন। সমগ্র প্রকল্পটির সমন্বয় করেছেন আই, আই, টি এর প্রকাশনা পরিচালক আলী রামাজান (Ali Ramadan)।

একমাত্র আল্লাহ পাকই তাওফীক দান করেন এবং সঠিক পথে পরিচালনা করেন।

আবদুল হামিদ এ. আবু সুলাইমান
কুয়ালালামপুর
মালয়শিয়া
রবিউল আখের ১৪১৪/অক্টোবর ১৯৯৩

www.pathagar.com

মুখবন্ধ ঃ প্রথম সংস্করণ

দু'টি প্রধান উদ্দেশ্যে এ বইটি লেখা। প্রথম উদ্দেশ্য হল ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি তা উপস্থাপন করা, ইসলামী চিন্তার মৌলিক সম্পদের সাথে পরিচিত হওয়া এবং মুসলিম, অমুসলিম, ধর্ম নিরপেক্ষ ও ধর্ম নিরপেক্ষ নয় এমন বুদ্ধিজীবীদের নিকট ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত তত্ত্বকে একটি বিশেষ শিক্ষনীয় বিষয় হিসাবে পেশ করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, কেন ইসলামী চিন্তাধারা দৃশ্যত সমকালীন ধারণা ও চিন্তার জগতে সক্রিয় এবং গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে তা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করে দেখা এবং শান্তি, নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে কেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ব্যর্থ হল সে দিকগুলো চিহ্নিত করে তা কাটিয়ে উঠার জন্য নতুন অন্তরদৃষ্টি ও বিকল্প ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

এ বই লেখার মূলে রয়েছে তৎপূর্বে আমার লেখা "অর্থনীতিতে ইসলামী তত্ত্ব দর্শন এবং সমকালীন উপকরণ" (কায়রো ১৯৬০) শিরনামের একটি আরবী বই রচনার অভিজ্ঞতা। ঐ বইয়ের একটি চমৎকার সারসংক্ষেপ "ইসলামে অর্থনৈতিক চিন্তার সমকালীন দিক সমূহ" নামক প্রবন্ধে দেখা যেতে পারে। প্রবন্ধটি ট্রাস্ট পাবলিকেশন, প্লেইং ফিল্ড ইন্ডিয়ানা আমেরিকা কর্তৃক ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এটি প্রকাশিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মুসলিম ছাত্র সমিতির তৃতীয় পূর্ব উপকুলীয় ১৯৬৮ সালের সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে।

এ অভিজ্ঞতা থেকে আমার একটি উপলব্ধি জন্মে। সেটি হল স্থবিরতা এবং উন্নত মুসলিম পদ্ধতি বিজ্ঞানের সংকীর্ণ প্রয়োগ। এর কারণে কঠোর মনোভাব এবং ইসলামী চিন্তাধারা থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক এই বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে ঐ বইটির ইসলামী দৃষ্টিকোন, এবং অর্থনীতির ইসলামী দর্শন বিষয়গুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সমম্ভব হয়েছে। ঐ বইতে যে পদ্ধতি বিজ্ঞানের ব্যবহার করা হয় তার যাত্রা শুরু হয় অর্থনীতি সংক্রান্ত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সকল বক্তব্যের সংকলনের মাধ্যমে। পরবর্তী ধাপে ঐসব বক্তব্যের স্বতন্ত্রীকরণ, বিন্যাস, ব্যাখ্যা এবং অন্তর্নিহিত যৌক্তিক সমন্বয় ঘটানো হয়। এ জন্য প্রয়োজন হয় ভাষা অধ্যয়ন, ঐতিহাসিক অবস্থা, উপায়, যোগ্যতা, পরিবেশ ইত্যাদির বিশ্লেষণ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির গ্রাজুয়েট হিসাবে আমার কারিগরি জ্ঞানের পদ্ধতিগত ব্যবহার। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে কুরআন এবং সুন্নাহর বক্তব্য রয়েছে। এসব বক্তব্যে যুক্তি এবং চিন্তা প্রণালী একটি সুসামঞ্জস্য এবং সুশৃঙ্খল দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক। ঐগুলো আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম, নীতি উন্নয়নের বিভিন্ন স্তর ইত্যাদির মধ্যে যে সাজুয্য এবং তাৎপর্য বিদ্যমান তা উপলব্ধি করতে এ পদ্ধতি আমাকে সাহায্য

www.pathagar.com

করেছে। এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে মানুষের উপলব্ধি বা বোধশক্তি বহির্ভূত পবিত্র উদ্দেশ্য (আহকাম তাওকিয়া) সম্পর্কে হঠাৎ কোন উপসংহারে উপনীত হওয়া থেকে আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। এটা কোন সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞা, বিকৃত, বা রহিতকরণের ঝোঁক প্রবণতা পরিহার করে চলতে আমাকে সাহায্য করেছে। শরীয়াতের লক্ষ্য ও নীতিমালা এবং বিশেষ স্থান কালের প্রেক্ষিতে পন্ডিত মন্ডলীর নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিবেচনা সমূহের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা জানা একান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ এ জ্ঞান সমকালীন প্রয়োজন এবং উপকরণের সাথে সামঞ্জস্যশীল নতুন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের দিকনির্দেশনা লাভের দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

মানুষে-মানুষে জাতিতে- জাতিতে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি, নিরাপত্তা সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণের বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি কি সে সম্পর্কে বোঝা ও নবতর অন্তর দৃষ্টি লাভের দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য এ বইয়ে চেষ্টা করা হয়েছে। ইসলামী চিন্তা ধারার ক্ষেত্রে উন্নত ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞান এবং ঐতিহ্যগত পন্থার প্রয়োগ প্রক্রিয়া অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণের একটি মাধ্যম এ বই।

বিশেষ করে রিদ্দাহ (স্বধর্মত্যাগ), বিশ্বাসের স্বাধীনতা, জিয়্যা (ব্যক্তিগত কর) ইত্যাদির মত অনেক সমস্যা বিষয়ক সমকালীন ইসলামী চিন্তাধারা সম্পর্কে এ বইয়ে নতুন দৃষ্টিকোন উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করা হয়েছে উসূল (ইসলামী পদ্ধতি) এর ভূমিকা সম্পর্কে, আলোচনা করা হয়েছে উলামাদের (শরীয়তের পন্ডিত) এবং ধর্ম নিরপেক্ষ পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের মুসলিম চিন্তাধারা এবং মুসলিম উম্মাহর চলমান স্থবিরতা সম্পর্কে। তাদের ভূমিকায় যে পার্থক্য বিদ্যমান সে সম্পর্কে ও আলোচনা করা হয়েছে। এ বই দাবী করছে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী তত্ত্ব এবং দর্শনই সমকালীন বিশ্বে শান্তির একমাত্র যথার্থ দর্শন। এটাই একমাত্র দর্শন, ধারণা এবং দৃষ্টি ভঙ্গি যা সকল মানুষের উৎপত্তি, স্বার্থ এবং পরিণতি সম্পর্কে অভিন্ন বক্তব্যের উপর জোর দেয়। ইসলাম মনে করে এ নীতিই মানুষের প্রকৃতি, আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক এবং আন্তদলীয় সম্পর্ক উপলব্ধির একমাত্র ভিত্তি। ইসলামে মানুষের প্রকৃতি, স্বার্থ এবং সম্পর্ক যেন পরস্পরের উপর উপস্থাপিত কতগুলো বৃত্তের (Over lapping circles) ন্যায়। অন্যান্য বিশ্ব দর্শন এবং আদর্শ গুরুত্ব আরোপ করে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা তথা যুদ্ধ বিগ্রহ ব্যবস্থাপনার উপর। জাতীয়তাবাদ এবং শ্রেণী দ্বন্দ্বের পাশ্চাত্য দর্শন দ্বন্দ্বমূলক প্রত্যক্ষণে স্বার্থ এবং লক্ষ্য সমূহের নেতিবাচক উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। দ্বন্দ্বের এ দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় যুদ্ধ এবং বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়।

ইতিহাসের শিক্ষা হল এই যে, স্থায়ী শান্তি অর্জনের একমাত্র পথ হল পারস্পরিক উপলব্ধি এবং সাম্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ। আর এর ভিত্তি হবে এ বিশ্বাসের উপর যে, আমাদের সকলের প্রকৃতি, স্বার্থ এবং গন্তব্য অভিন্ন। বিশ্ব সম্প্রদায় এ সক্রিয় বিশ্ব ব্যবস্থা এবং বিশ্ব সংস্থার পথ ধরে ইতিমধ্যেই যে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছে সেটা এক

www.pathagar.com

বিরাট সাফল্য এবং তা অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু এ প্রক্রিয়াকে আরো উন্নত ও গতিশীল ও কার্যকর করা যায় একমাত্র ইসলামের উপস্থাপিত শান্তি, সুসামঞ্জস্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং গঠনমূলক দর্শনের সুশীতল ছায়া ও কাঠামোর আওতায়। এ দৃষ্টি ভঙ্গির প্রতি রয়েছে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের পবিত্র অঙ্গীকার।

এ বইয়ে গোত্রে গোত্রে, জাতিতে জাতিতে এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ইসলাম কিরূপ সম্পর্কের দর্শন পেশ করে তার বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করা হয়েছে। বইটিতে আগামী দিনের মানব সভ্যতার জন্য এক নতুন প্রত্যাশা ও ব্যক্ত করা হয়েছে।

আশা করা যায় মুসলিম বুদ্ধিজীবী, পন্ডিত এবং নেতৃবৃন্দ এ বই থেকে ভাল করে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, তাঁদের নিকট ইসলামের আবেদন কি। আগামী দিনের মানব জাতির এবং মানব সভ্যতার অস্তিত্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাঁরা কিভাবে উন্নতর প্রক্রিয়ায় প্রচেষ্টা চালাতে পারেন সে সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা রয়েছে। এ বইয়ে ইসলামী জ্ঞান অন্বেষায় পদ্ধতি বিজ্ঞানের বিশ্লেষনমূলক আলোচনা মুসলিম পন্ডিতবর্গের উপকারে আসবে বলে আমি আশা করি। এ অভিজ্ঞতার ফলে তাঁরা ইসলামী লক্ষ্য, নীতি, পদ্ধতি, মূল্যবোধ এবং নির্দেশনার আলোকে মানব, প্রকৃতি, মানব সম্পর্ক এবং মানব পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। এর ফলে যে শুধু অন্তরদৃষ্টির সৃষ্টি হবে তা নয় বরং উদ্ভব হবে ইসলামের নতুন সামাজিক, মানবিক, প্রাকৃতিক এবং কারিগরি বিজ্ঞানের (প্রতিনিধিত্বমূলক বিজ্ঞান)।

এ বই পড়ে এটা মনে হতে পারে যে, আমি অবাঞ্ছিতভাবে মুসলিম মিল্লাত এবং তার অতীত জীবন ও তার চিন্তাধারার দুর্বলতাগুলোর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছি। মুসলমানদের কর্ম ধারার উপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। কারণ এর দ্বারা জাতীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কারিগরি এবং সামরিক অধগতির মূলে যেসব কারণ বিদ্যমান তা অনুসন্ধান করা সম্ভব হবে। একজন মুসলমান এবং সমাজ বিজ্ঞানী হিসাবে ইসলামের লক্ষ্য, আদর্শ এবং মুসলমানদের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন এবং এসব কীর্তি যে প্রশংসার দাবী রাখে তাও আমি অকপটে স্বীকার করি। আর এ কারণেই আমি নির্বিঘ্নে আমার খোলা ও বিশ্লেষণধর্মী উপলব্ধি সমকালীন বিশ্বে মুসলিম মিল্লাতকে যথাযথ গৌরবজনক ভূমিকায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার কাজে প্রয়োগ করতে চাই।

আমি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করছি যে বর্তমান বিশ্বের প্রয়োজন হচ্ছে ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী চিন্তা ধারার। শুধু তাই নয়, বিশ্বাস হিসাবেও প্রয়োজন ইসলামেরই। এ জন্য এ বইয়ে আমি সে সব মূল্যবোধ ও ধারণাগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য আন্তরিক প্রয়াস পেয়েছি যেগুলো সমকালীন বিশ্বে জাতি সমূহের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো উপহার দিতে পারে। সমকালীন মুসলমানদের অবস্থার পশ্চাতে কি কারণ

www.pathagar.com

বিদ্যমান এবং মুসলমানরা কিভাবে নিজেদের আদর্শকে নিজেরাই বিকৃত করছে, তা অধিকতর বিস্তারিত উপলব্ধির জন্য অমুসলিম বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আমার উপস্থাপিত গবেষণালব্ধ অত্র বইয়ের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য নিবেদন করছি। এতে সমকালীন বিশ্বের ইসলামী মনোভঙ্গি কি তা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন। এ উপলব্ধি ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁদের মধ্যে বিরাজমান ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বদ্ধ মূল ধারণাগুলোর নিরসন করবে এবং ইসলামের নীতি ও মূল্যবোধের আলোকে সকল মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য সাধারণ লক্ষ্য নির্ধারণের অংশীদার হিসাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে সাহায্য করবে।

নিজেদের জীবনাদর্শ এবং ধর্মের আলোকে শান্তি ও সহযোগিতার কাঙ্খিত একটি বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, লালন এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা মুসলিম এবং অমুসলিম সকলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম তার আদর্শের ছায়াতলে এমন এক বিশ্ব ব্যবস্থা উপহার দিতে পারে যেখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের গভীর বিশ্বাস নিয়ে বসবাস করতে এবং তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করে পারস্পরিক উপলব্ধি ও সাম্যের ভিত্তিতে সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে।

এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব এবং দর্শন দুনিয়ার সকল মানুষকে এক ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করে মানুষের সাধারণ উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ, স্বার্থ এবং উপলব্ধির এমন ব্যাপক ভিত্তিক মানবীয় উপাদানের উন্নয়ন ঘটাতে পারে যার সাহায্যে প্রতিবেশী থেকে শুরু করে পৃথিবীর সব মানুষকে নিয়ে একটি মাত্র সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সকল স্তরের উপযোগী কার্যকর রাজনৈতিক অবকাঠামো সমূহ এবং মানব সমাজের মধ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এটাই একমাত্র বাস্তব ও যোগ্য পন্থা যা শান্তি, নিরাপত্তা, সহযোগিতা এবং অংশদারিত্ব মূলক কার্যকর বিশ্ব ব্যবস্থা গঠনের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

স্বীয় দর্শন, মনস্তত্ত্ব, সভ্যতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সংহতি পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে অবশ্যই মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে। সংরক্ষণ করতে হবে তাঁদের মহৎ চিন্তাধারা, পদ্ধতি বিজ্ঞান এবং এসবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে। অন্যদের নিকট নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য এবং সম্মানিত করার পূর্বে মুসলমানদের অবশ্যই নিজেদেরকে হতে হবে নিজেদের জন্য সত্যবাদী এবং কল্যাণকর। একটি উন্নততর এবং শান্তির পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য রাখতে হবে কার্যকর অবদান।

চৌদ্দ বৎসরেরও বেশী আগে এ লেখার শুরু হয়েছিল নতুন মুসলিম প্রজন্মের জন্য একটি নতুন ও গতিশীল দর্শন হিসাবে। উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে ইসলামিক চিন্তাধারা এবং পদ্ধতি বিজ্ঞানের পুনরুত্থান ঘটানো যায় সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা। যা সঠিক সে সম্পর্কে এ বইয়ে খুব বেশী আলোচনা করা হয়নি। আলোচনা করা হয়েছে ঐসব

www.pathagar.com

বিষয়কে পরিশুদ্ধ করার জন্য যেগুলো নিপতিত হয়ে আছে ভ্রান্তির আবর্তে। মুসলিম উম্মাহর অবস্থা এতই সংকটজনক যে, আমরা যদি আমাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা, কাজকর্ম ইত্যাদি বিষয়ে কি ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে তা নিয়ে গবেষণা এবং আলোচনা করার জন্য মনের দুয়ার খুলে দেই তবে এতে হারাবার তো কিছুই নেই বরং কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে অনেক।

এ বইতে যা পেশ করা হয়েছে তা কোন ফতোয়া বা রায় নয়। বরং এগুলো হচ্ছে বিশ্লেষণ এবং মতামত। এসব মতামত নিবেদন করা হয়েছে অন্যদের উদ্দেশ্যে, যে কোন ভ্রান্ত ধারণা নিরসন এবং আরো অধিকতর গতিশীল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। ভাবের পারস্পরিক আদান প্রদানের এই প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু ইসলামিক চিন্তাধারা এবং একটি সমৃদ্ধ জাতির লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে।

প্রফেসর ইসমাইল আল ফারুকীর লিখিত শেষ কথাগুলো ভূমিকা হিসাবে এ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বইটির জন্য এক গৌরবজনক সম্মানের ব্যাপার। এ পৃষ্ঠাগুলোতে ইসলামের জন্য, জাতির জন্য এবং মানবতার জন্য এ ব্যক্তিত্বের ভালবাসা এবং অকৃত্রিম আন্তরিকতার এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান। এ ভূমিকায় এবং তাঁর অপরাপর লেখায় বর্ণিত ধারণাগুলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার কৃপায় পরকালে তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য হবে রহমত স্বরূপ এবং মুসলমান ও দুনিয়াতে সকল আন্তরিক মানুষের জন্য প্রবাহিত করবে স্থায়ী কল্যাণের ঝর্ণা ধারা। অবশেষে এ বইয়ের লেখক হিসাবে আমি জোর দিয়ে এবং পরিস্কার রূপে বলতে চাই যে, ইসলামী মূল্যবোধ, নীতি, চিন্তাধারা, পদ্ধতি বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও মুসলিম জীবনোদ্দেশ্যের পুনর্জাগরনের জন্য সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অবদান রাখতে পারে, এমন সকল প্রকার বিশ্লেষণ ও সমালোচনাকে আমি স্বাগত জানাই।

পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট আমার আরজ, তিনি যেন আমাকে যা ন্যায় ও সত্য তা বলার তৌফিক দান করেন। এ জন্য দুনিয়ায় ও আখেরাতে যেন আমার দু'টি এনাম নসীব হয়। আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার আরো আরজ, তিনি যেন আমার অপরাপর মুসলিম ভাইদেরকেও সত্য ও ন্যায়ের অনুসন্ধানে আমার সহযাত্রী হওয়ার তাওফীক এনায়েত করেন। আমরা সকলে যেন সত্যের অভিযানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। ন্যায় ও সত্যকে যেন আমরা মানুষের উপলব্ধি ও অনুসরণের জন্য সকল উন্মুক্ত করতে পারি। আমরা যেন এমন কিছু করতে পারি যাতে মানুষ ইসলামের বাণী থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারে।

রামাদান ১, ১৪০৭ মে ১৯৮৭
ওয়াশিংটন, ডি. সি

আব্দুলহামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান
পিএইচ ডি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইসমাইল রাজী আল ফারুকী

ইন্টারন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট্ অব ইসলামিক থ্যট কর্তৃক প্রকাশিত এ বইটি মূলত আন্তর্জাতিক বিষয়ে একটি পি, এইচ, ডি থিসিস হিসাবে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করা হয়েছিল। বইটির একাডেমিক মূল্যমান খুবই উচ্চাঙ্গের। কিন্তু তার চেয়েও এর মূল্য অনেক গুণ বেশী এ জন্য যে, বইটির বিষয়বস্তু হচ্ছে ইসলামী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। প্রাচীন মুসলিম ইতিহাসে বিকশিত এসব বিষয়গুলো হতে লেখক ঐ সব সাধারণ নীতিমালা চয়ন করার প্রয়াস পেয়েছেন, যে গুলোর ভিত্তিতে প্রাথমিক যুগে ইসলামী বিশ্বের কার্যাদি পরিচালিত হয়েছে। বস্তুতঃ লেখকের এই রচনার মূল্যমান একটি ডকটরেট ডিগ্রি লাভের মধ্যেই সীমিত নয়। এ রচনা তার চেয়েও অনেক বেশী উচ্চমানের এক অবদান। বর্তমান শতাব্দীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান ক্ষেত্রগুলোর একটি বিশেষ ক্ষেত্র হল একটি কার্যকর বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলামের উপস্থাপিত সত্যকে এ বইয়ে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় পৃথিবীতে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের যে সমস্ত হুমকির সৃষ্টি হয়েছে সে সংক্রান্ত বিষয়ে মানব জাতিকে আলোকিত করার চেয়ে অধিক জরুরী আর কিছু হতে পারে না। বর্তমানে মানবজাতি যে বিভীষিকার মধ্যে বসবাস করছে তার জন্য দায়ী হল পৃথিবীর উপর পাশ্চাত্যের বিগত দুই শতাব্দীর নেতৃত্ব। পাশ্চাত্যের বিশ্বজনীন সমাজের (Universal Community) ফাঁকা আদর্শের ফলশ্রুতি হচ্ছে পৃথিবীর বর্তমান সংকট। এ সংকটের সমাধান এবং একে বুঝার জন্য আমাদের ঐ আদর্শের ইতিহাস জানা দরকার।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বিশ্ব সমাজ আদর্শ

ইহুদী খৃষ্টবাদ (Judaic Christianity) নিজেকে ইহুদীবাদের মধ্যে একটি সংস্কার আন্দোলন হিসাবে গণ্য করত। এ মতবাদ ছিল ইসরাঈলের হারিয়ে যাওয়া গোত্রগুলোর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এর বিপরীতে পাশ্চাত্যের খৃষ্টবাদ (Western Christianity) বিশ্ব সমাজ আদর্শের (Universal Community Ideal) কথা-ঘোষণা করে। এ আদর্শবাদ ছিল রোমান রাষ্ট্র দর্শনের এক বিকল্প উচ্চারণ। এরপর কয়েক শতাব্দী যাবত পাশ্চাত্যের গীর্জা বিশ্ব সমাজ আদর্শের (Universal Community Ideal) দাবী করে। এর সাফল্য ছিল অত্যন্ত সীমিত। গীর্জার বিশ্ব কর্তৃত্ব অবিরাম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। চ্যালেঞ্জ আসে খ্রীষ্টানরাষ্ট্রের ভিতর ও বাহির হতে। গীর্জার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিল না।

www.pathagar.com

গীর্জার বিশ্বজনীন কর্তৃত্ব নির্মূল করার জন্যে সংস্কার আন্দোলনের শুরু হয়। এটি ছিল একটি সঠিক পদক্ষেপ। এ আন্দোলনে গীর্জার কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বেরই পতন ঘটেনি, এর সাথে এ সংস্কার আন্দোলন গীর্জার শাসন কর্তৃত্বেরও পতন ঘটায়। এ আন্দোলন প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করার এবং তারকারাজির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য মানুষের মনকে মুক্তি দান করে। পরিণতির ভিত্তি খ্রীষ্টান বিশ্বাস-এ ধারণার প্রতি সম্মতি দিতে ইউরোপ অস্বীকৃতি জানায়। এর পরিবর্তে আত্মপরিচয় ও বিচারের মাপকাঠি এবং নাগরিকত্বের ভিত্তি হিসাবে যুক্তিবাদের উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

সংস্কার আন্দোলনের পর দ্রুত এ প্রবণতার বিকাশ ঘটে। এর ফলে আসে আবার সে আলো 'বিশ্ব সমাজ আদর্শ'। কিন্তু এবার এ আদর্শের ভিত্তি হয় বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদ। 'ইউরোপীয় আলো' অবশ্য নিজস্ব প্রত্যয়ের শক্তিতে দীপ্তিমান ছিল না। এর প্রবক্তাগণ ধর্ম বিশ্বাসের সংরক্ষণ বা সমন্বয়ের জন্য তাঁদের যুক্তিবাদ নামক দর্শনকে আপোষ করতে বাধ্য করে। এ সংমিশ্রণের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের স্বপ্নের সভ্যতার সৌধ গড়ে তোলার জন্য এক ফাটলযুক্ত ভিত্তির ব্যবস্থা করে। কিন্তু এরূপ ভিত্তির উপর নির্মিত বিশ্ব সভ্যতার কোন প্রাসাদ নিরাপদ হতে পারে না। অপর পক্ষে নতুন আলোর প্রবক্তাগণের মানবতা ও বিশ্বজনীন সহজ সরল বক্তব্যের অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ এবং তার জনসাধারণকেই বুঝাবার প্রচ্ছন্ন ভাবগতি তাঁদের বক্তব্যের অন্তসার শূন্যতা প্রকাশ করে। প্রকৃত পক্ষে এ আলো প্রলয়ংকরী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। খৃষ্টবাদ এ আলোকে যুক্তিবাদের কারণে এক বিরাট হুমকি স্বরূপ মনে করে। ইউরোপের রাজকুমার বর্গ এটাকে প্রতিরোধ করে। কারণ এ জোয়ার গীর্জার কর্তৃত্বের বিকল্প ব্যবস্থা থেকে তারা যা কিছু লাভ করছিল সে লাভের অংশে কমতি সৃষ্টি করে। প্রথমোক্তরা যায় আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশের অনুকূলে আর শেষোক্তরা পক্ষ নেয় জাতীয়তাবাদের।

এভাবে এ আলোর বিশ্ব সমাজ আদর্শ অংকুরেই বিনষ্ট হয়। সংস্কার আন্দোলনে অবগাহন করে ইউরোপের গীর্জাগুলো ইউরোপীয় রাজশাসনের হাতে হাত মিলান। যুক্তিবাদ এবং তার সৃষ্ট বিশ্ব আদর্শের মোকাবিলা করার জন্য এটা করা হয়। তারা বিকশিত করে 'রোমান্টিসিজম' নামক এক আন্দোলনকে। এ আন্দোলন খ্রীষ্টবাদের নিরাপত্তা বিধান করে। এজন্য তারা যুক্তিবাদের পরিবর্তে আবেগ অনুভূতির ভিত্তির উপর সত্য এবং মূল্যবোধকে দাঁড় করায়। তারা রাজন্যবর্গের ক্ষমতাকেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা বিধান করে। এজন্য জাতয়ীতাবাদ বা গোষ্ঠীবাদের উপর দলীয় আনুগত্যের ভিত্তি রচনা করে। দলীয় স্বার্থ এবং রাজা বা জাতির প্রতি আনুগত্যের নিরিখে এ মতাদর্শ জনকল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করে। শ্লেয়ারম্যাকার (Schleiermacher) দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রথমোক্ত কাজের এবং ফুসটেল ডি কাউলাঞ্জেজ (Fustel de Coulanges)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় কাজের। একই ব্যাধির দুটি দিকের অনুকূলে যথেষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবতারণা করে তাঁদের উচ্চয়ের লেখনী। এ ব্যাধি হল রোমান্টিসিজম। এটা বৈশিষ্ট্যবাদের (Particularism) এক সংস্করণ এবং তা মঞ্জুরিত হয় একটি দর্শন ও একটি অক্ষদন্ড (axiology) হিসাবে। তাঁদের লেখার তোড়ে বিশ্বসমাজ আদর্শের ধারণা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

নতুন আলোর অপসৃষ্টি আরো দু'টি ধারণার সৃষ্টি করে। প্রকৃতির একক ও একচ্ছত্র প্রভুত্বের এবং এর অন্তর্নিহিত সত্যের ধারকের ভূমিকায় বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান শাখা হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে যুক্তি বাদের (Reason)। এর প্রধান প্রণোদনা আসে বিভিন্ন দিক থেকে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনের প্রেরণা থেকে। প্রেরণা আসে উন্মোচিত রহস্য লব্ধ কলা-কৌশল ও আবিষ্কার সমূহ সম্পূর্ণরূপে জাতীয় স্বার্থে সর্বোপরি জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বিধানের লক্ষ্যে জাতি সমূহের প্রতিযোগিতা হতে। মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সৌন্দর্য বিজ্ঞান এমন সব বিষয়ে পরিণত হয় যেখানে সত্যের অনুসন্ধান চালান যায় এবং যেগুলো সম্পর্কে যুক্তিবাদ যে কোন বক্তব্য রাখতে পারে। এ সমস্ত বিষয়গুলো পরিণত হয় ব্যক্তিগত অনুভূতির বিষয়ে। যে কেউই এসব ক্ষেত্রে বিচরণের স্বাধীনতা পায়। এ আপেক্ষিকতাবাদ এবং কল্পনাবাদের ছায়াতলে খৃষ্টবাদ আশ্রয় গ্রহণ করে। আর এটা করে নতুন যুক্তিবাদের আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য। অবশ্য এগুলো দ্রুত স্বয়ং খ্রীষ্টবাদের উপরই তাদের প্রভাব প্রকাশ করে।

মধ্য বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ব সমাজ আদর্শ

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (Friedrich Engels) খ্রীষ্টবাদের প্রধান নীতিসমূহ এবং বিশ্ব সমাজ আদর্শ বর্জনের যাত্রা হল শুরু। সামষ্টিক পর্যায়ে ইউরোপ পৃথিবীতে ধর্মকে দিল কুৎসিত নাম। ফ্রিডরিক এঙ্গেলস্ (Fricdrich engels) এবং কাল মার্কস দিয়ে (KarlMarx) ধর্মকে জনগণের আফিম নামে অভিহিত করতে সক্ষম হলো। ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফ্রিডরিক নীটজ এবং সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) ধর্মীয় নৈতিকতা এবং মনস্তত্ত্বকে মৃত্যুর সমতুল্য হিসাবে বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা ধর্মকে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ (Illusion) হিসাবে অভিহিত করেন এবং এর শেষ কৃত সমাগত বলে ভবিষ্যত বাণী করেন। তারা ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে বিকৃত করেন।

এ সব কিছু ঘটে ইউরোপে, যেখানে খৃষ্ট ধর্মই ছিল একমাত্র প্রভাব সৃষ্টিকারী ধর্ম। তাঁদের আলোর বাহক পূর্বসূরীদের মত এসব ইউরোপীয় সমালোচকবৃন্দ ধর্ম বলতে ইউরোপীয় খৃষ্টবাদকেই বুঝাতেন। কমিউনিজম এ শক্তিগুলোর মিলন ঘটিয়ে ইউরোপের অভ্যন্তরীণ শক্তিতে প্রচন্ডতা দান করে। ইউরোপের জাতিসমূহের মধ্যে যুদ্ধ ও

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতার অবাস্তব ব্যবস্থা বা নীতির বিরোধিতা করার বিষয়টিও এতে যুক্ত হয়। ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের অপবিত্র মিত্রতার ভিত্তি হিসাবে রোমান্টিসিজম নির্দিত হয়। কারণ উভয়ই অনুভূতি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদের উপর নির্ভরশীল।

কমিউনিজম পুনরায় বিশ্বসমাজ আদর্শের বক্তব্য উপস্থাপন করে। কিন্তু এবার অনুভূতি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিবর্তে বস্তু ও বস্তু সম্পর্কে ইতিহাস প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে এ আদর্শের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কাল পর্যন্ত কমিউনিজম খ্রীষ্টবাদ এবং জাতীয়তাবাদ উভয়েরই মোকাবিলা করে। ইহা নতুন পৃথিবীর লক্ষ্য হিসাবে বিশ্ব সমাজের আদর্শ ধারণার অগ্রগতি সাধন করে। কমিউনিজমে বস্তু এবং সর্বহারার কর্তৃত্ব এবং বস্তুবাদ প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী সময়ে বিশ্ব সমাজ আদর্শ প্রথমে মূল রাশিয়ার এবং পরে এর অনুসারী সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি লগ্নে চীনা বিপ্লবের পর ক্ষণকালের জন্য গৃহিত এ আদর্শ বিপ্লবের নায়ক মাও সেতুং এর মৃত্যুর পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়। সোভিয়েট সোসালিষ্ট রিপাবলিক কর্তৃক এ আদর্শ লংঘনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ চীনে তা পরিত্যক্ত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি বিশ্ব আদর্শের প্রতি আন্তরিক থাকতো এবং সে যদি চীনকে তার জাতি গোষ্ঠীবাদের উর্দ্ধে উঠে আসার জন্য সাহায্য করত তাহলে হয়তো বিশ্ব সমাজ আদর্শ বেঁচে থাকার সুযোগ পেত। দুর্ভাগ্যবশত পাশ্চাত্যে এবং কমিউনিষ্ট বিশ্বে ঐ আদর্শ আজ সম্পূর্ণ মৃত।

দুই বিশ্ব যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে দুই পরাশক্তি বৃটেন এবং ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল লীগ অব ন্যাশনস। তারা এর মাধ্যমে বিশ্ব ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণ রাখার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। কিন্তু এ সংস্থার পরিচালনায় তারা যা কিছু করছিল সেগুলো ছিল একান্তভাবে আপত্তিকর। কারণ এ দুই পরাশক্তি সংস্থাটিকে এশিয়া এবং আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশিক নীতি বাস্তবায়নের জন্য এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। সংস্কারবাদী আদর্শবাদ এবং স্বতন্ত্র নীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসন। তিনি ইউরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিরক্ত হয়ে লীগ অব নেশনস হতে আমেরিকাকে প্রত্যাহার করে নেন। রাশিয়াকে এর পূর্বেই বিরোধিতা ও সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র নীতির কারণে এ সংস্থা থেকে বাদ দেয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর বিশ্ব সমাজ আদর্শের কথা চতুর্থবারের মত জাতি সংঘের মাধ্যমে পুনরায় উত্থাপন করা হয়। আশা করা হয়েছিল এ সংস্থা পূর্ববর্তী বিশ্ব সংস্থার চেয়ে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কিন্তু একই দুর্বলতা এ বিশ্ব সংস্থাকেও প্রভাবিত করে। জাতিসংঘের গঠনতান্ত্রিক নীতিমালায় ঘোষণা করা হয় সংঘের সদস্য রাষ্ট্র সমূহ

www.pathagar.com

হবে সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্র এবং এসব রাষ্ট্র নিজ নিজ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্ম তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করতে পারবে। ফলে সংঘের গৃহিত প্রস্তাবলী বাস্তবায়ন করার বিষয়টি ন্যস্ত করা হলো সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এখতিয়ারে। এতে কোন জাতিকে প্রস্তাব বাস্তবায়নে বাধ্য করার কথা ছিল না। অবশ্য বৃহৎ শক্তিবর্গ সব সময় প্রস্তাব বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে বাধ্য করার জন্য একটা পথ বের করেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বৃহৎ শক্তি বর্গের ঐক্যমতে পৌছা ছিল জরুরী। লীগ অব ন্যাশন্স্-এ বিরোধের বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক উচ্চ বিচারাদালতে পাঠানো হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক উচ্চ বিচারাদালতের অস্তিত্ব বহাল থাকে। কিন্তু এর মর্যাদা রূপান্তরিত হয় নিছক প্রদর্শনী কেন্দ্র এবং প্রচারণা প্লাটফরম হিসাবে। জাতি সংঘে এর ক্ষমতা এবং আওতা সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। স্থায়ী সদস্যদের রয়েছে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা। নিরাপত্তা পরিষদ নির্বাহী ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তাবলীকে অকার্যকর করে দিতে পারে। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের কদাচিৎ একটি সমন্বিত সংস্থা হিসাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। কারণ এর যে কোন স্থায়ী সদস্য যখন দেখে যে কোন সিদ্ধান্ত তার নিজস্ব জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূলে যাচ্ছে তখনই সে সদস্য অপর চার সদস্যের বিরুদ্ধে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে এবং করে।

স্পষ্টত উভয় বিশ্ব সংস্থা স্ববিরোধী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হলো জাতিত্ব অর্থাৎ জাতীয় সার্বভৌমত্ব, সীমানা, জনগণ এবং জাতীয়তাবাদ। এটা এমন এক নীতি যার চূড়ান্ত লক্ষ্য, চূড়ান্ত মাপকাঠি এবং চূড়ান্ত বিচার্য হলো জাতীয় স্বার্থ। জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে বিশ্ব সমাজের কল্যাণ সাধন অসম্ভব। কারণ এর গঠনতন্ত্রই নির্দেশ করে যে, নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের জন্যই তার সকল কর্মকান্ড নিবেদিত হবে।

জাতীয়তাবাদী আদর্শে জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেয়ার নীতি নেই। অথচ এটাই হলো কার্যকর বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থার প্রথম শর্ত যা সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে পাবে। চূড়ান্ত মাপকাঠি হল জাতীয় স্বার্থ। তা জাতি রাষ্ট্রকে যে কোন মূল্যে এমনকি নৈতিকতা এবং ন্যায় বিচারকে পদদলিত করে হলেও রক্ষার জন্য বাধ্য করে। সুতরাং পরস্পরের এবং সমগ্র পৃথিবীর বিপরীতে কেবল মাত্র স্বীয় স্বার্থকে সংরক্ষণের জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গ নিরাপত্তা পরিষদের যে কোন প্রস্তাবে ভেটো দেয়ার ক্ষমতা নিজেদের মধ্যে রেখেছে। সাধারণ পরিষদের যে কোন প্রস্তাব অকার্যকর করার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গ এর বাস্তবায়ন নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নির্বাহী ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল রেখেছে। জাতিসংঘ বিশেষ প্রকল্প, সমস্যাবলী

www.pathagar.com

অথবা বিশ্বের জাতি সমূহের অপরাপর স্থায়ী প্রয়োজন সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখার জন্য অন্যান্য শাখা সৃষ্টি করেছে। এর কতগুলো তারা সরাসরি এবং কতগুলো পরোক্ষভাবে সংস্থার বাজেটে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে। উভয় ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের ইচ্ছাকেই বাস্তবায়ন করে। যেখানে প্রস্তাবাবলী তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায় সেখানে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয় অথবা প্রত্যাহার করার হুমকি প্রদান করে। এভাবেই নির্বাহী পরিষদকে তারা থামিয়ে দেয়। যে ক্ষেত্রে তারা একে অপরের সাথে একমত হতে পারে না সেখানে যে কোন প্রস্তাব পাশ করা হতে নিরাপত্তা পরিষদকে বিরত রাখার জন্য ভেটো প্রয়োগ করে। অসংখ্যবার ঈসরাইল সাধারণ পরিষদের এমন সব মতামতকে প্রত্যাখান করেছে যে গুলোতে ছিল মানব জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব। জাতিসংঘ যে কেবল তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অধিকার হতে বঞ্চিত তা নয়। এর এমন কোন সার্বক্ষণিক সেনাবাহিনীও নেই, যার মধ্যেমে জাতিসমূহের মধ্যে কোন আক্রমণকে থামানো যায়। অনেক সময় বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং তাদের তাবেদার গোষ্ঠী আক্রমণকারীর ঘৃণ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় বিধায় জাতিসংঘ নিষ্কর্মার মত নীরবে সুবিধাজনক পক্ষে অবস্থান নেয় এবং সাধারণ পরিষদকে আক্রমণকারীর বিপক্ষে ভোট দেয়ার সুযোগ প্রদান করে। অপরপক্ষে আক্রমণকারীরা নির্লজ্জের মত চালিয়ে যায় তাদের কর্মকান্ড।

সংজ্ঞা অনুসারে জাতিসংঘ কোন বিশ্ব সরকার নয়। এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল সদস্যরাষ্ট্র সমূহের মধ্যে আক্রমণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করার জন্য। কিন্তু এ ক্ষুদ্র দায়িত্বের ক্ষেত্রেও এ সংস্থা নিজেকে অক্ষম প্রমাণিত করেছে। এর পূর্বসূরীর মত বিশ্বের বক্তাদের জন্য একটি মঞ্চ হিসাবে এ সংস্থা তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেখানে, জাতিসংঘের সেখানে ভূমিকা হলো নিছক রাবার ষ্টাম্প অথবা শক্তিহীন দর্শকের মত। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর কিছুকালের জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গ এ ধারণা এবং আশাবাদ প্রচার করছিল যে, এখন হতে আর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হবে না এবং জাতিসংঘ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ফেডারেল ইউনিয়ন গঠন করবে। বর্তমানে এ আশা কেবল বোকার স্বর্গে বাস করে এমন ব্যক্তিই পোষণ করতে পারে।

ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তাদের যে সকল উপনিবেশকে স্বাধীনতা প্রদান করেছে তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামরিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনার উপায় উপকরনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা পূর্বের মতই বহাল রেখে চলেছে। ক্ষেত্র বিশেষে এ নিয়ন্ত্রণের কৌশল ও ধরন ভিন্নতর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রবেশের মাধ্যমে সাবেক উপনিবেশিক শক্তির মধ্যকার সংগ্রাম আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা উপনিবেশিক শক্তিকে হটিয়ে

www.pathagar.com

সেখানে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে সমগ্র বিশ্বে তাদের প্রভাব বলয় বিস্তার করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিল।

বিশ্ব সমাজের আদর্শ এবং মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র

'ইউরোপীয় আলোর' সূতিকাগারে ভূমিষ্ট এক উপগ্রহ হল বিপ্লবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইউরোপীয় সংকটের বিকল্প হিসাবে সে বিশ্ব সমাজ আদর্শকে উপস্থাপন করে। ১৭৭৬ খৃঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। এর পর হতে এ দেশটি ইউরোপ এবং সমগ্র বিশ্ব থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন। এজন্য সে ধর্মীয় এবং জাতীয়তাবাদী বিশেষত্বের দিক হতে বিশ্বের স্বর্গ হিসাবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। যারা আমেরিকায় বসবাসের জন্য গিয়েছিল তারাও নতুন বিশ্বের অভিভাবক রূপে উচ্চকণ্ঠ হতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুস্পষ্ট লক্ষ্য যে নতুন বিশ্ব সমাজ আদর্শকে পুরাতন বিশ্বব্যবস্থার স্থলে স্থাপন করা- এ প্রত্যয় উপরোক্ত অবস্থার কারণে শক্তিশালী হতে পারেনি। এ আদর্শবাদ যে উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার করেছিল তা মাত্র কয়েক দশক কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এরপরই বিশ্ব আদর্শের বক্তব্যের অন্তরালে ফুটে ওঠে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের কথা। স্পেন এবং বৃটেনের সাথে প্রতিযোগিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে "আমেরিকানদের জন্য আমেরিকা" মনরো-এর এ মতবাদের (Monroe doctrine) মাধ্যমে তার জাতীয়তাবাদের ইচ্ছাকে জাগ্রত করে। স্পেন-মার্কিন যুদ্ধে আমেরিকার বিজয় তাকে জাতীয়তাবাদী আদর্শে আরো এক ধাপ এগিয়ে দেয়। কিন্তু এবার সে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে নর্ম্যান বিজয়ের পূর্বে ইংরেজ জাতির ঐতিহ্যের আলোকে। এ সংজ্ঞা লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ এবং তাদের সাংস্কৃতিক পূর্বপুরুষ স্পেনের বিপরীতে আমেরিকাকে স্বতন্ত্র জাতি সত্ত্বা প্রদান করে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর স্বল্পকালীন সময়ের পৃথক অস্তিত্ব এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের পতনের পর আমেরিকা আত্মপ্রকাশ করে ইউরোপের জাতি গোষ্ঠীর আত্মাভিমানী এবং অবশিষ্ট বিশ্বের প্রতি উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ উত্তরাধিকারী হিসাবে।

পাশ্চাত্যের ব্যর্থতা

বিশ্বের জনগোষ্ঠীর জন্য শান্তি ও ন্যায় বিচারের এক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পাশ্চাত্য এবং পূর্ব ইউরোপের ব্যর্থতার এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ব্যর্থতার কারণ হল এই যে তাদের কেউই এমন কোন নীতিমালা সম্পর্কে অভিহিত নয় যা বিশ্ব সমাজ আদর্শকে কার্যকর করতে পারে। পাশ্চাত্যের মানসিকতা এবং সংস্কৃতি কখনো সামাজিক সংঘটনের কাঠামো হিসাবে জাতীয়তাবাদের ধারণার উপরে উঠতে পারেনি। নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টবাদ সে আদর্শের স্বপ্ন দেখেছিল এবং যুগ যুগ ধরে তা শিক্ষাও দিয়েছিল। কিন্তু গীর্জা

www.pathagar.com

এবং রাষ্ট্রের পৃথকীকরন এবং ভিন্নতর এক সমাজের আশায় বিভোর হয়ে খ্রীষ্টবাদ এ আদর্শের সাথে অমত করে। ধর্মকে কেন্দ্র করে যারা বেড়ে উঠেছে তারা ধীক্কার পাওয়ার ভয়ে হলেও ইতিহাস এবং পৃথিবীর জন্য বিশ্ব সমাজ আদর্শের ওকালতি করে। কিন্তু এটা করে ঐ ইতিহাস এবং বিশ্বের জন্য যারা চিরকালের জন্য মানুষের আশার প্রদীপ করেছে নির্বাপিত এবং এতে বানিয়েছে শয়তানের রাজত্ব। বিকল্প হিসাবে তারা বিশ্ব সমাজকে রহস্যময় অবয়ব হিসাবে অনুসন্ধান করে গীর্জায়। স্বভাবতই তারা এ আদর্শকে আইন, আদালত এবং সামরিক বাহিনী সম্বলিত একটি সংগঠন হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি। অপরপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য এ আদর্শের প্রতি নিছক মৌখিক সমর্থনের কথা জ্ঞাপন করে। এটাকে তারা এ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস হিসাবে ব্যবহার করে। তারা এ আদর্শকে ব্যবহার করেছে তাদের নিজেদের জনগণের জাতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বৃহৎ শক্তিবর্গ এ শতাব্দীতে যা করেছে তার প্রভাব বিশ্বের ইতিহাসের জন্য অনেক সুদূর প্রসারী এবং মানব জাতির শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক বিপদজনক। বিগত দুই শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এ ব্যর্থতা পৃথিবীকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে এমন দুই দৈত্যের কবলে নিক্ষেপ করেছে, যারা পরস্পরকে এবং সমগ্র পৃথিবীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে সক্ষম। বলা হচ্ছে যে, তাদের নিয়ন্ত্রণে যে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে তার পরিমাণ হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি পুরুষ, মহিলা এবং শিশুর জন্য ৫০০ পাউন্ড বিস্ফোরকের সমান। এগুলোর বৈচিত্রতার কোন সীমা সংখ্যা নেই, নেই কোন সামঞ্জস্যতা। তারা চায় একে অপরকে বশীভূত করতে, চায় পৃথিবীকে শাসন করতে, চায় মানুষের শক্তিকে হরণ করতে। যদি কোথাও কোন শান্তি এবং সমঝোতা সম্ভব হয় সেটা হতে হয় তাদের নিজস্ব সুবিধার জন্য। এরূপ শান্তি স্থাপিত হয় ভুক্তভোগী অবশিষ্ট পৃথিবীর স্বার্থের বিনিময়ে। সুতরাং এরূপ ব্যবস্থা নেহাৎ ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীর অপর কোন অংশে তাদের হিংস্র থাবা বিস্তারের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য এরূপ সমঝোতা করে থাকে। যদিও বলা হয় 'স্নায়ু যুদ্ধ' শান্তির বিগত ৪০ বছর কেটে গেছে সন্ত্রাসের ভারসাম্যের কারণে। এ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে বৃহৎ শক্তি দ্বয়-নিজেদের মধ্যে। কিন্তু তা করেছে কোন শান্তি বা ন্যায় বিচারের খাতিরে সদিচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নয় বরং এ জন্য যে তারা একে অপরকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করতে সক্ষম। মানবতা ভয়ে প্রকম্পিত হয় যখন এ দানবদ্বয়ের যে কোন একটি অপরের প্রতি অভিযোগ করে বা হুঙ্কার ছাড়ে। মানবতাকে এ পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেয়ার করুন মূহূর্তটি যে কখন এ দুই দৈত্যের জন্য হাজির হবে সে সম্পর্কে কখনও নিশ্চিত হওয়া যায় না। বিগত তিন দশকে বার্লিন, পেলেষ্টাইন, হাঙ্গেরী, সাইপ্রাস, ভিয়েতনাম, কিউবা এবং কোরিয়ার প্রশ্নে পৃথিবী কয়েকদফা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিল। এ দুই দৈত্য সবসময় তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতির উপর জোর দিচ্ছে। পৃথিবীর নিরাপত্তার জন্য

www.pathagar.com

কার্যকর কিছুই করছে না।

দুই শক্তিধর তাদের জাতীয় আয়কে অপরিমিত অনুপাতে গবেষণা, উন্নয়ন, নির্মাণ এবং যুদ্ধাস্ত্র বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যয় করে। তাদের ইউরোপীয় মিত্রদের অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ তাদের তুলনায় কম। এখাতে ব্যয়ের ভর্তুকি প্রদান এবং একের বিরুদ্ধে অপরের ব্যবহৃত সমরাস্ত্রগুলোর ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্যই কি দুই অক্ষ শক্তি তৃতীয় বিশ্বের জনগোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতার উন্নয়ন সাধনে তৎপর ? উপনিবেশিক শক্তিগুলো তৃতীয় বিশ্বের জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামোর আওতায় সংগঠিত করেছিল। কিন্তু এসব রাষ্ট্রের সীমানা তারা এমনভাবে নির্ধারণ করেছিল যার ফলে প্রতিবেশী দেশের জনগোষ্ঠির মধ্যে বজায় থাকে চিরস্থায়ী শত্রুতা। উভয় অক্ষশক্তি ক্রমাগতভাবে তৃতীয় বিশ্বের জাতি সমূহের মধ্যে শত্রুতাকে করছে উৎসাহিত। তারা প্রতিবেশীদের মধ্যে পুরানো শত্রুতা উস্কে দিচ্ছে অথবা সৃষ্টি করছে নতুন শত্রুতা। তৃতীয় বিশ্বের জাতি সমূহকে একের বিরুদ্ধে অন্যকে যুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে। তারা প্রত্যেক জাতির মধ্যস্থিত আভ্যন্তরীন সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক আন্দোলনকে সহযোগিতা করে। এসব কাজের ফলে তৃতীয় বিশ্বের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের লোকদের ব্যাপারে এবং প্রতিবেশীদের সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত্র। এ ভীতি তৃতীয় বিশ্বের শাসক গোষ্ঠীকে পরাশক্তি বর্গের উপর করছে আরো নির্ভরশীল। দরিদ্র জাতিগুলোকে পাশ্চাত্যের যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ে বাধ্য করার জন্য পরাশক্তিবর্গ অব্যাহত অভিযান চালাচ্ছে। দরিদ্র দেশগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে এসব অস্ত্র ব্যবহার করছে। পুরাতন অস্ত্রকে প্রতিস্থাপন করছে নতুন নতুন অস্ত্রসস্ত্র কিনে। এসব অস্ত্র দ্বারাই তারা নিজেদের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করছে। আবার ধ্বংস প্রাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পুনঃনির্মিত হচ্ছে বৃহৎশক্তি বর্গ কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল, যন্ত্রপাতি এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারা। তাই দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে এ অবস্থা অব্যাহত রাখার জন্যই যে পাশ্চাত্যের কার্যক্রম নিবেদিত তা বলা কি অযৌক্তিক হবে? যদি তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতিত কোন দেশ এ অবস্থার শিকার হওয়া সত্ত্বেও শক্তিশালী হওয়ার পথে অগ্রসর হয় তাহলে এ মেকিয়াভেলিয় নীতি তার সমগ্র সম্পদকে প্রকৃত গঠনমূলক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত না করে নিয়োজিত করছে তার নির্ভরশীল মর্যাদাকে বিলুপ্ত করার কাজে। অপর পক্ষে বৃহৎ শক্তিবর্গের নীতির শিকার কোন দেশ দরিদ্র হলে সে দেশকে তারা অর্থ কর্জ দেয় তাদের অস্ত্রসস্ত্র এবং ভোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য। এভাবে সেদেশটির ভবিষ্যৎ জোর পূর্বক বন্ধক হয়ে যায় ঋণদাতা দেশের নিকট।

দরিদ্র তৃতীয় বিশ্ব পরস্পর বিনাশী মতভেদ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং সশস্ত্র শত্রুতায় লিপ্ত। তারা কাঁচামাল উৎপাদন করে। এ সমস্ত কাঁচামাল দুই পরাশক্তি ক্রয় করে নিজেদের

www.pathagar.com

নির্ধারিত দামে। তৃতীয় বিশ্ব আমেরিকা এবং ইউরোপের শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য ব্যবহার করে। তারা তাদের প্রধান খাদ্যের জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য এমনকি তাদের দৈনিক রুটির জন্যও নির্ভরশীল পরাশক্তিদ্বয়ের যে কোন একটির বদান্যতার উপর। অর্থাৎ পরাশক্তি ও তাদের মিত্রগোষ্ঠী তৃতীয় বিশ্বের জন্য যে ব্যবস্থা নির্ধারিত করে রেখেছে সে ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করতে হয় তাদেরকে। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিরই প্রভুত্ব চলে এসব রাষ্ট্রে। অথচ তাদের নীতি হল চূড়ান্তভাবে নৈতিক বিবেচনা বর্জিত। কাইজার এবং যীশুর সাম্রাজ্য, রেইন হোল্ড নীবুর (Reinhold Niebuhr) এর মতে সকল প্রকার জাতীয় নীতিকে যীশুর আদর্শ হতে মুক্ত করে এবং জাতি রাষ্ট্রকে প্রত্যেক নৈতিক বিধান অবজ্ঞা করার অনুমতি প্রদান করে।

উৎপাদিত দ্রব্যের দাম যাতে না কমে সে জন্য পশ্চিমা দেশগুলো তাদের নাগরিকদেরকে নিজেদের ক্ষমতার চেয়ে কম উৎপাদন করার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে বেতন প্রদান করে। এটা করার পেছনে তাদের নিজস্ব যুক্তি রয়েছে। তাদের নৈতিকতা তাদের ক্রয় করার জন্য মওজুদ করার জন্য পণ্যাগার যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখন ক্রয়কৃত খাদ্যশস্য ধ্বংস করার জন্যও তাদের অনুমতি দেয়। এটা তারা করে দ্রব্যমূল্য এবং ব্যবসার স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। যখন মানবজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী অপুষ্টিতে ভুগছে, লক্ষ্য কোটি মানুষ ক্ষুধায় আক্রান্ত এবং কোটি কোটি মানব সন্তান প্রতিবছর দুর্ভিক্ষ এবং ক্ষুধার জ্বালায় নিশ্চিহ্ন হচ্ছে তখন বৃহৎ শক্তি বর্গ উৎপাদন হ্রাস, মওজুতদারী এবং খাদ্য শষ্য ধ্বংসের মত সর্বনাশা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশ্চাত্যের অনুশীলিত নীতিতে অনৈতিকতা এবং অমানবিকতার এ হল এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

মানব জাতিকে বিপর্যয় এবং ভয় ভীতির ছায়াতলে এভাবে বসবাস করতে বাধ্য করা এবং দুই পরাশক্তি ও তাদের মিত্র গোষ্ঠীকে উৎপাদন ধ্বংস এবং যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ এবং পুনঃসরবরাহ করতে দেয়া মানবতার বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ অপরাধ। যুদ্ধ শিল্পের (বর্তমান বছরের বিক্রয় মাত্রা এক ট্রিলিয়ন ডলার) মত একটি সবচেয়ে সংকটজনক অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং স্বার্থান্বেষী মহলকে তাদের ক্ষমতা ও বড়াইয়ের খাতিরে মানুষে মানুষে ঘৃণা বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টির কার্যক্রম অবাধে চালিয়ে যেতে দেয়ার বিষয়ে নির্বিকার থাকা সত্যিকার অর্থে এক শয়তানী কাজ। কিন্তু সংক্ষেপে ওটা হল বিগত দুই শতাব্দী যাবত পাশ্চাত্যের অদূরদর্শী কর্তৃত্বের ফলশ্রুতি। বিশ্ব এখন নিরাপদও নয়, শান্তিপূর্ণও নয় এবং সন্তুষ্ট ও নয়। বিশ্ব এমন একটি টাইম বোমার রূপ ধারণ করে আছে যে কোন মুহূর্তে এর ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। দুই পরাশক্তি বলয়ে মাত্র অল্প কয়েক মিলিয়ন লোক ক্ষমতা এবং প্রাচুর্যের মধ্যে অবস্থান করছে। অপর পক্ষে তাদের

www.pathagar.com

স্বদেশবাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী দরিদ্র এবং তাদের সামনে নেই কোন অনুসরণযোগ্য আদর্শ। তাদের কতক চেয়ে আছে এমন কোন অলৌকিক ক্ষমতার দিকে যা তাদের জন্য বয়ে আনতে পারে সৌভাগ্যবানদের মত ক্ষমতা বা প্রাচুর্য। অবশিষ্ট মানবতা হল অপুষ্টির কবলে, ক্ষুধার্ত অথবা মৃত্যু পথযাত্রী। এটা কেবল বড় ধরনের কোন ব্যর্থতা নয়। এ হল এক ভয়াবহ ও মর্মান্তিক বিপর্যয়।

বিশ্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে চিন্তার দৈন্য

আন্তর্জাতিক আইন অথবা বিশ্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য চিন্তার ঐতিহ্য খুবই দুর্বল। ঐ ঐতিহ্যের অবদান বিশ্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে খুবই সামান্য। বিশ্ব ব্যবস্থার বিষয়াদিতে পাশ্চাত্যের রেকর্ড কনভেনশন ও শক্তির ব্যবহারের চেয়ে তেমন বেশী কিছু নয়। চিন্তার এ দৈন্যই কি এরূপ অনুশীলনের কারণ বা দর্পন ? কনভেনশন এর ভিত্তি ব্যতীত প্রতিচ্য কখনো আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ করেনি। দুই রাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে মধ্যস্থতার মাধ্যমে অথবা পূর্ববর্তী চুক্তির সূত্র ধরে। প্রায় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য ছিল বিবাদমান পক্ষের মধ্যে কনভেনশন বা সন্ধি স্থাপনের দিকে। এরূপ কনভেনশন বা সন্ধি স্থাপন দ্বারা মনে করা হয়েছে যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। চুক্তি, সন্ধি বা কনভেনশনে উপনীত হওয়া সম্ভব না হলে সংঘাতের অবসান একমাত্র শক্তি প্রয়োগ বা ad baculum দ্বারা সম্ভব মনে করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক আইন নামক মধ্যযুগে যে মতবাদ আলোচিত বা পরিচিত ছিল তা পরিণত হয় নিছক একাডেমিক বা ধর্মীয় আলোচনার বিষয় হিসাবে। এ মতবাদ স্কলাসটিসিজম এর উত্থানের পরে আবির্ভূত হয়। প্রাকৃতিক আইন (Law of nature) কখনও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি। সপ্তদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টিকে আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট করার বিষয়ে পাশ্চাত্যের কোন চিন্তাবিদই অনুসন্ধান করেননি। এশিয়া এবং আফ্রিকার নতুন পৃথিবীতে কলোনী স্থাপনের জন্য ইউরোপের রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে ছিল কাড়াকাড়ি। ঐ সময় সংঘটিত হচ্ছিল অনেক ধর্ম যুদ্ধ। সকল প্রকার মহড়ার ক্ষেত্র ছিল এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশ সমূহ। এ অবস্থায় আন্ত ইউরোপীয় সমঝোতা এবং চুক্তির ভিত্তি হিসাবে প্রকৃতির আইনকে গ্রহণ করার জন্য গ্রটিয়াস অনুপ্রাণিত হয়ে এ আদর্শের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইউরোপীয় উজ্জীবনে (Enlightenment) কিছু কালের জন্য এ আদর্শ অনুশীলনের পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু শীঘ্রই রোমান্টিসিজমের আবির্ভাবের সাথে সাথে এ আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক আচার আচরণ প্রক্রিয়া সত্যিকার অর্থে তত্ত্ব থেকে বহুদূরে। তত্ত্ব কখনো কর্মপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেনি। অইউরোপীয়দের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেদন বা প্রার্থনা জানানোর জন্য না ছিল কোন কনভেনশন, না ছিল কোন ট্রিটি। তাছাড়া এশীয়

www.pathagar.com

এবং আফ্রিকানরা হল খৃষ্টধর্মের বিপরীত ধর্মবিশ্বাসী। এ কারণে একমাত্র যুক্তি হল তাদের বিরুদ্ধে শক্তির ব্যবহার প্রযোজ্য। সুতরাং কোন কিছুই ইউরোপীয়দেরকে নির্মম এবং নৃশংস উপায়ে পদানত এবং পরাজিত করার জন্য শক্তি প্রয়োগের পথ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তাদের এ আচরণ ব্যক্তি এবং সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই ছিল সমানভাবে প্রযোজ্য।

আমরা দেখেছি কি পরিস্থিতিতে লীগ অব ন্যাশনস এবং জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল এসব সংস্থার ব্যর্থতা সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করেছি। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে এ ব্যর্থতা পাশ্চত্যকে প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর কোন বিকল্প চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেনি। কি আমেরিকা কি পূর্ব বা পশ্চিম ইউরোপ- সকলের মনই এক্ষেত্রে থেকেছে নির্বিকার, চিন্তায় অক্ষম। এ সংকট উত্তরণের জন্য, এর সমাধানের জন্য তাদের মনে সৃষ্টি হয়নি কোন ব্যাকুলতা।

একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য বর্তমান প্রয়োজন

বর্তমান বিশ্বের একান্ত প্রয়োজন এমন এক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবে ন্যায় এবং স্থায়ী শান্তি। এ ব্যবস্থায় থাকবে না জুলুম, থাকবেনা অত্যাচার। এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে। এ ব্যবস্থা পৃথিবীর মানুষের নিজেদের ন্যায় সংগত ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনকে ঢেলে সাজাবার সুযোগ দেবে। এ ব্যবস্থা সমগ্র পৃথিবীতে একটি ফেডারেল অথবা কনফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। যে সরকারের থাকবে একটি নির্বাহী ও নীতি প্রণয়নকারী প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার উপর ন্যাস্ত থাকবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব। এটাকে সাহায্য করবে প্রণীত আন্তর্জাতিক আইন। এ ব্যবস্থায় থাকবে বিচারের পদ্ধতি। এ বিচার পদ্ধতির মাধ্যমে সকল সরকার, প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় এবং ব্যক্তি যাতে ন্যায় বিচার পেতে পারে- তা নিশ্চিত করা হবে। এরূপ একটি ব্যবস্থা ছাড়া পৃথিবীতে কখনো শান্তি আসতে পারে না। ফেডারেল বিশ্ব সরকারের স্বার্থে জাতি রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজ নিজ সার্বোভৌমত্বের দাবী ত্যাগ না করলে ন্যায় বিচার এবং শান্তির ব্যাপারে কখনো আশ্বস্ত হওয়া সম্ভব হবে না।

গঠন কাঠামো যাই হোক না কেন, একটি বিশ্বসরকারের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান পৃথিবীতে অনিবার্য হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে আনবিক অস্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনসংখ্যার ঘটছে বিস্ফোরণ। আণবিক অস্ত্রের ভান্ডারের মওজুদ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে পরাশক্তিবর্গের পৃথিবীর সম্পদ গ্রাস করার লোভ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মানব জাতির সংখ্যাগরিষ্ট অংশ ঘৃণা এবং অসন্তোষে হচ্ছে বিক্ষুব্ধ যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা

www.pathagar.com

যায়নি। এমতাবস্থায় পাশ্চাত্যের দ্বারা আনীত এবং বিগত দুই শতাব্দী যাবত তাদের দ্বারা ঠেকিয়ে রাখা এ বিশ্ব ব্যবস্থা আর টিকে থাকতে পারে না। এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হবে। অথবা শান্তিপূর্ণ এবং যৌক্তিকভাবে ঘটাতে হবে এতে পরিবর্তন। আর এ পরিবর্তন অনিবার্যভাবে প্রয়োজন মানবতার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য।

আর্নোল্ড টয়েনবির রূপক উপমা দিয়ে বলা যায় পৃথিবী নামক এ গ্রহের অধিবাসীবৃন্দ কাজ করে ভেড়ার মত এবং লাফ দিয়ে বাঁধ পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুর কোলে। এটা করার পেছনে এমন কোন যুক্তি সংগত কারণ নেই। এটা করে শুধু তাদের নেতাদের অনুসরণের জন্য। আর যদি বিবেকবান সৃষ্টি হিসাবে তারা কাজ করতে চায় তাহলে তাদের জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা পরিত্যাগ করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার পরিকল্পনা এবং বিনির্মাণ করা এবং এর বাস্তবায়ন সম্প্রসারিত করাই হল মানবতার প্রথম কর্তব্য। কিন্তু ইসলাম ব্যতীত মানবতার কাছে বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য অন্য কোন উত্তরাধিকার নেই।

কেবলমাত্র অতি সাম্প্রতিক কালে জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্র সমূহের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য এরূপ একটি আইনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করে। এ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হল বিশ্ব মানবাধিকার বিল। এ বিলটিতে এমন অনেক কল্যাণকর দিক রয়েছে যেগুলোর আবেদন সত্যিকার অর্থে বিশ্ব জনীন এবং যেগুলো প্রকৃত অর্থেই মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলো কাঙ্ক্ষিত আদর্শ হতে এখনো রয়েছে অনেক দূরে। এ বিলে যেসব মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার কিছু অংশ হল সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত। এগুলো ঐ সমস্ত সাক্ষী গোপাল রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে যে সমস্ত রাষ্ট্র তাদের জনগণ বা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। মানবাধিকারের সনদ তার প্রবক্তাদের দ্বারাই হয়েছে পদদলিত। তারা এটাকে তাদের শত্রু বা প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা যুদ্ধের উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছে। এটা কখনো আদালত পদ্ধতির রূপ পরিগ্রহ করেনি যার আওতায় ভুক্তভোগীরা তাদের দুঃখ দুর্দশার আওয়াজ তুলে মানবাধিকার লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার অর্জন করতে পেরেছে। এভাবে সনদটি আজ পর্যবসিত হয়েছে নিছক কাগজের লেখায়- ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে, যখন মানবাধিকারের লংঘন পরাশক্তি এবং তাদের মিত্রগোষ্ঠীর স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে। এ সনদ আজ শুধু প্রচারণার কৌশল বলেই মনে হয়।

ইসলামের উপস্থাপিত বিশ্ব ব্যবস্থা

আসলে ঘটনা হল এই যে, আন্তর্জাতিক নৈতিকতা, আইন এবং আইন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্ব ইসলামী ঐতিহ্যের উপর নির্ভরশীল। সর্বোপরি এ বই প্রকাশ এবং পাঠকদের

www.pathagar.com

নিকট উপস্থাপন করার যৌক্তিকতা হল জনসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনার সূত্রপাত করা। আমাদের প্রত্যাশা হল, সর্বত্র মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানবগোষ্ঠীর চিন্তা চেতনাকে ইসলামের উপস্থাপিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নীতিমালা সম্পর্কে জাগ্রত করা এবং তাদের মন ও সংকল্পে এ নীতিমালা বাস্তবায়নের ভিত্তি স্থাপন করা।

বইতে উপস্থাপিত ইসলামের অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সার অথবা এর মূল্যায়নের পূর্বে এই বইয়ের পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে কথিত বক্তব্যের সাথে সামগ্রিকভাবে ইসলামী আদর্শের মূল বক্তব্য কি তা এখানে সংযোজিত করতে চাই। বইটিতে উপস্থাপিত এতদবিষয়ে ইসলামের অবদান সম্পর্কে পাঠকবর্গের নিকট হতে কাঙ্ক্ষিত মূল্যায়ন সন্নিবেশে হবে সামগ্রিক বক্তব্যের উপসংহার।

ইসলামের অঙ্গীকার

ইসলাম এবং এর অনুসারীবৃন্দ একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ বলে নিজেদেরকে মনে করে। বর্তমান সংকটের প্রেক্ষিতে এ অঙ্গীকারকে স্মরণ করে যাওয়া যথাযথ বলে গণ্য করে। কারণ এরই মাধ্যমে আমরা ঐ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারি যিনি সমগ্র মানবজাতিকে শান্তির রাজ্যে প্রবেশের নির্দেশ প্রদান করেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন মানবজাতির জীবন ও কার্যাবলীকে ন্যায়নীতি এবং দায়িত্বশীল ভ্রাতৃত্বের অমীয় ধারায় বিন্যাস করার জন্য। দ্বিতীয়ত মানব জাতিকে বর্তমান কালের সীমাহীন প্রতিযোগিতা এবং নিরর্থক দুঃখ দুর্দশার কবল এবং ভবিষ্যতের অনিবার্য ধ্বংসলীলার হাত হতে রক্ষা করার এটাই একমাত্র উপায়। সুতরাং শান্তি-সুবিচার এবং ভ্রাতৃত্বের এক বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতি মুসলমানদের এ অঙ্গীকার একাধারে ধর্মীয় এবং একান্ত প্রয়োজনীয়। ইসলাম মনে করে এরূপ একটি বিশ্ব ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা করা, এর জন্য কাজ করা এবং এর প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মত্যাগ করা হল বীরত্ব এবং পূণ্যের কাজ। এটা দয়া এবং খোদা ভীরুতার উপাদান। এ ব্যবস্থার বাস্তব রূপ দান প্রক্রিয়ায় জীবন উৎসর্গ করার নাম ইচ্ছে শাহাদাৎ। আর শাহাদাতের পুরস্কার হল অনন্ত জীবনের জন্য বেহেস্ত- স্বর্গ সুখ। এরচেয়ে মহান অথবা সঠিক শক্তিশালী প্রত্যাশা আর কিছু হতে পারে না।

প্যাক্স ইসলামিকা

ইসলাম এমন এক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়তে চায় যেখান হতে চিরতরে যুদ্ধের অবসান হবে। শান্তির জন্য ইসলামের অঙ্গীকার সর্বাত্মক, বিশ্বজনীন এবং ব্যাপক। যে কেউ ইসলামের উপস্থাপিত বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে চাইলে সেজন্য প্রয়োজন হবে সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

সদস্যের সেনাবাহিনীর বিলোপ ঘটানো, অস্ত্র ভান্ডারের ধ্বংস সাধন অথবা সেগুলোকে বিশ্বসরকারের নিকট অর্পন। কেবল মাত্র জনজীবনের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আদালতের রায় কার্যকর করার জন্যই প্রয়োজনীয় বাহিনী থাকবে। আদালতের রায়, মধ্যস্থতা অথবা চুক্তি, পূর্ব আলোচনা ব্যতীত যে সমস্ত বিরোধ বা দাবীর সুরাহা করা যায় না সেগুলো বাদে সকল ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখার নিয়মাবলী বা চুক্তিনামা জনগণের নাগালে দেয়ার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সকলে এ ব্যবস্থা মেনে চলার জন্য যেমন বাধ্য তেমনি এর সুফল ভোগ করারও অধিকারী। আন্তর্জাতিক আইনের আওতাধীন আদালতের রায় অথবা শান্তি চুক্তির আওতায় আসাকে প্রত্যাখান করা বস্তুতপক্ষে যুদ্ধ অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার শামিল। আর এ দুটির কোনটিই নৈতিক অথবা যৌক্তিক দিক থেকে সমর্থন যোগ্য নয়। ইসলাম চায়, দুনিয়ার সকল মানুষ এবং সকল জাতি শান্তির রাজ্যে প্রবেশ করুক। এজন্য ইসলাম তার অনুসারীদেরকে এটা করার জন্য সোৎসাহে নির্দেশ প্রদান করে। সমষ্টি কর্তৃক প্রণীত (যা শান্তিপূর্ণ অবস্থানের জন্য গৃহিত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত) শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থার বিরোধী জাতির বিরুদ্ধে ইসলাম বল প্রয়োগমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি সমর্থন দান করে। একই বিশ্ব জনীন শর্তাবলীর আওতায় প্রণীত যে শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা সকলে গ্রহণ করেছে সে ব্যবস্থা যদি কোন জাতি বর্জন করে তাহলে ইসলাম এটাকে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর বলে মনে করে।

সদস্য পদের ভিত্তি

ইসলামের আন্তর্জাতিক আইন মিল্লাত অথবা ধর্মীয় সমাজকে মৌলিক পরিচিতি কাঠামো হিসাবে গণ্য করে। আর ইসলামী বিশ্বব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে মুসলিম, খৃষ্টান, ইহুদী, জোরোয়াষ্টারীয়, সাবায়েন, হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায় সমূহকে। ইসলাম গোত্রবাদ এবং জাতীয়তাবাদকে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ যে মানব জাতিকে আল্লাহ তার গুণাবলীর অংশ বা আত্মা দিয়ে সম মর্যাদা সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন তাকে বর্ণ, ভৌগলিক, ভাষা ও সংস্কৃতি ভিত্তিক গোত্রবাদ বা জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ গন্ডিতে আবদ্ধ করতে চায় না। এভাবে মানুষকে বিভক্ত করা মানবতা বিরোধী। এটা মানুষের মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। প্রত্যেক মানুষের পরিচিতি হবে তার চিন্তাধারা, আদর্শ, স্বতঃস্ফূর্ত কাজকর্ম এবং কৃতিত্বের ভিত্তিতে। জন্মগত পরিস্থিতি, জৈবিক অথবা সামাজিক গঠন মানুষের পরিচিতির নিয়ামক হওয়া সংগত নয়। কারণ এসব তার ইচ্ছাধীন নয়। প্রথম হিজরী (৬২২ খৃঃ) সনে মদিনার ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রথমে যে অমুসলিম সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি প্রদান করে তারা হল ইহুদী সম্প্রদায়। এরপর ক্রমান্বয়ে স্বীকৃতি পায়, খ্রীষ্টান, সাবায়ন (Sabean) হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় সমূহ।

www.pathagar.com

এ সব সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মীয় পরিচিতির মাধ্যমে নিজেদের স্বতন্ত্র বজায় রাখার পক্ষে ইচ্ছা প্রকাশ করে। যে সমস্ত লোক কোন ধর্মের ভিত্তিতে পরিচিত হতে আগ্রহী নয় সে সব লোককেও ইসলামী আইনতন্ত্র সমানভাবে স্বীকার করে। কিন্তু এজন্য শর্ত হল তারা যেমনভাবে জীবন যাপন করতে চায় তা পরিচালনার জন্য আইন কানুনের একটি উত্তরাধিকার থাকতে হবে। সেরূপ আইন কানুন ধর্মনিরপেক্ষ হলেও কোন আপত্তি নেই। কেবলমাত্র সেরূপ দলকেই ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থার সদস্য পদ দেয়া যাবে না যাদের নিজস্ব আইন কানুন শান্তি এবং বিশ্ব ব্যবস্থার পরিপন্থী। তাদের আদর্শের ধর্মীয়, নৈতিক এবং সামাজিক রাজনৈতিক উপাদান যাই হোক না কেন, বিশ্ব ব্যবস্থায় যোগদানের জন্য তাদের যোগ্যতার মাপকাঠি হবে তাদের মানবতাবোধ এবং শান্তির জন্য প্রত্যাশা। সুতরাং ইসলামী আইন বিজ্ঞান বর্তমানে এ আশ্বাস দিতে পারে যে, যে কোন ভিত্তিতে জাতীয়তার দাবীদার যে কোন দল ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থার সদস্য হতে পারে।

স্বাধীনতা (Liberty)

ইসলাম এবং ইসলামের উপস্থাপিত বিশ্ব ব্যবস্থায় এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয় যে বন্দীদশা অবস্থায় কোন বন্দী পিতামাতার ঘরে জন্ম নেয়া সন্তান ব্যতীত সকল মানব সন্তানই জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং যতদিন তারা বেঁচে থাকে ততদিনই তাদের সে স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে। যুদ্ধের মাধ্যমে যোদ্ধাদেরকে বন্দী করাই হল বন্দী দশার একমাত্র স্বীকৃত উৎস। এসব বন্দী তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত মুক্তিপণের মাধ্যমে আইনগতভাবে মুক্তিযোগ্য। বন্দীরা নিজেও তাদের মুক্তির জন্য চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বন্দীদের সৃজনশীল কাজের দ্বারা নিজেদেরকে মুক্ত করার প্রস্তাব বন্দীর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়া অবৈধ।

একইভাবে মানুষ যেহেতু মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী সেজন্য তাদেরকে আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে জোর পূর্বক গ্রেফতার করা, আটক রাখা এবং কারারুদ্ধ করা যায় না। ইসলাম এমন কোন আইনকে বৈধ বলে গণ্য করে না যা কোন সরকারকে কোর্টের ফরমান ব্যতীত কোন লোককে জোর করে গ্রেফতার করার, আটক রাখার বা কারারুদ্ধ করার ক্ষমতা প্রদান করে। নিজের ছেলে মেয়েদেরকে ইচ্ছানুযায়ী লেখা পড়া শেখানোর এবং তাদের জীবনকে নিজের জাতীয় ঐতিহ্যের আলোকে গঠন করার পূর্ণ স্বাধীনতা সকল মানুষের আছে। কারো জাতিত্ব গ্রহণ করার জন্য কাউকে জোর করা অবৈধ। যে কোন ব্যক্তি তার জাতিত্ব ত্যাগ করে অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বেচ্ছায় এরূপ করা হলে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান দেখাতে হয়।

www.pathagar.com

অবাধ চলাচল (Openness)

ইসলামের উপস্থাপিত বিশ্ব ব্যবস্থা এ পৃথিবীকে আল্লাহপাকের সাম্রাজ্য হিসাবে গণ্য করে। এখানে মানুষ তাঁর দয়ার দান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এর অর্থ হচ্ছে মানুষকে তাদের গতিবিধির ব্যাপারে নিষেধ করা যায় না। তারা যা পছন্দ করে তা করার জন্য স্বাধীনতা দিতে হবে। যে পর্যন্ত তারা দেশের সীমানা এবং জনগণকে নিয়ন্ত্রণকারী আইন কানুন মেনে চলতে ইচ্ছুক থাকে সে পর্যন্ত তারা দেশে প্রবেশ, অবস্থান এবং বসবাস করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আগমন ও বহির্গমন অনুমতি, আবাসিক বা কর্ম অনুমতি, সংরক্ষণকারী শুল্ক ছাড়পত্র ইত্যাদির মত নানা প্রকার বিধি নিষেধ দ্বারা মানুষ এবং মালামালের চলাচল অবশ্যই থাকতে হবে অবাধ। এ সমস্ত পদ্ধতি এবং এগুলোর লালন ও প্রয়োগকারী শতাব্দী কালের অধিক পুরাতন প্রতিষ্ঠান সমূহের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে। মানুষের পেশা এবং কাজ স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার অধিকার আল্লাহর বিশ্ব সাম্রাজ্য ব্যবস্থায় অলংঘনীয়। একইরূপে মানুষের অধিকারে এ দুনিয়ায় যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে সেগুলোর মালিকানার ব্যাপারেও সে স্বাধীন। যেখানে খুশী সেখানে তার সম্পদ নিয়ে যাওয়ার জন্যও সে স্বাধীন। অন্যের সম্পদের উপর আক্রমণ বা তা হরণ করার মত কিছু না হলে কোন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করা যায় না। একটি সত্যিকার ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থায় যে কোন দেশের অর্থনীতি এবং প্রশাসন হবে সমগ্র পৃথিবীর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

সাম্য (Egalitarianism)

জন্মগতভাবে সকল মানুষই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সে থাকেও এ সমমর্যাদা নিয়ে। শিক্ষা, কাজ, ক্ষতিপূরণ লাভের সুযোগ সকলেরই প্রাপ্য। পার্থক্য থাকবে কেবল বুদ্ধি, জ্ঞান, কাজ এবং উৎপাদন, দক্ষতা, গুণ বা সততার ক্ষেত্রে। কোন ব্যক্তির সম্পদ, মৃত্যু, উপহার অথবা দানের মাধ্যমে তার উত্তরাধিকারীর নিকট যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীর জীবনের সুযোগ সুবিধা অন্যের তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়ে যেতে পারে। এর মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হলেও সাম্যনীতির প্রতি কোন হুমকি সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু কোন সামজিক শ্রেণীই সংরক্ষিত ক্লাব হতে পারে না। ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থায় এমন কোন দল, শ্রেণী বা সংগঠন থাকতে পারে না যাতে যোগ্য এবং আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী কোন ব্যক্তির প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। ঐ সব সংগঠনের সদস্যপদ লাভের জন্য এমন কোন যোগ্যতার শর্ত আরোপ করা যাবে না যেগুলো স্বতস্ফূর্ত সিদ্ধান্ত এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জনযোগ্য হতে পারে না। গোষ্ঠীবাদ জৈবিক ভিত্তি, ভাষা, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান বা বয়স ইত্যাদি ভিত্তির উপর যে কোন বৈষম্যবাদকে ইসলাম মানবতা এবং স্রষ্টার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য করে এবং এরূপ বৈষম্যকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করে।

www.pathagar.com

সার্বজনীনতাবাদ (Universalism)

ইসলামের বিশ্ব ব্যবস্থায় সমগ্র মানব সমাজ হল এক ভ্রাতৃসংঘের সদস্য। জৈবিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক যে কোন জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য বা পৃথকীকরণের সুযোগ ইসলামে নেই। অধিকন্তু বিশ্বের গোত্র, জাতি এবং রাষ্ট্রের মধ্যকার শত্রুতা এবং যুদ্ধকে ইসলাম শান্তির লক্ষ্যে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। জাতি রাষ্ট্র সমূহ তাদের গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য সুবিধাজনক আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান সংরক্ষণের জন্য নাগরিকত্ব, অভিবাসন, বিদেশীকে স্বদেশীকরণ সংক্রান্ত যে সমস্ত আইনের সৃষ্টি করে রেখেছে সেগুলো বিলোপ করা হবে। বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের পরস্পরের সাথে মেলামেশার জন্য কোন প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব রাখা হবে না। আর এরূপ করার জন্য সত্যিকার অর্থে তারা হবে উৎসাহিত।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সত্যিকার বিশ্বজনীনতাবাদ মানবতার কাঠামোতে বিরাট সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করবে। এরূপ উদার ব্যবস্থায় অনেক সম্প্রদায়ই তাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। মানবজাতিকে যদি তার জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে হয় এবং মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে তাদের স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায় আর তারা যদি তাদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষের আলোকে স্বীয় মর্যাদা পেতে চায় তাহলে অনিবার্যরূপে প্রয়োজন এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। মানব জাতিকে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং একটি মাত্র বিশ্ব সম্প্রদায় সৃষ্টি করা এক অনন্য এবং শক্তিশালী সামাজিক আদর্শ। এটা বিশ্ব সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দকে তাদের গোষ্ঠীগত এবং জাতি রাষ্ট্রের আওতায় প্রাপ্ত পূর্ব মর্যদাকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি প্রদান করবে। এ ব্যবস্থা তাদের স্থানীয় সম্প্রদায় অথবা সকলের জন্য উন্মুক্ত মধ্যবর্তী সম্প্রদায় ভুক্ত হয়ে থাকার সুযোগ দান করবে। একই সাথে তারা বিশ্বজনীন মানবতাবাদের আদর্শের পতাকাবাহী হতে সক্ষম হবে।

ন্যায় বিচার (Justice)

পৃথিবীর কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ দল তার চার পাশের গরিষ্ঠ দলের আইনকানুনের আওতায় বসবাসের জন্য বাধ্য থাকবে না। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কানুনের আওতায় দীর্ঘ দিন বসবাস করতে বাধ্য হলে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যায় যদিও এ পরিবর্তন হয় অত্যন্ত ধীর গতিতে। ইসলামের বিশ্ব ব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে একটি জাতি (মিল্লাত) হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। শাসনতান্ত্রিকভাবে তাদেরকে তাদের জীবন প্রণালী অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্য ইসলামী বিশ্বব্যবস্থা আইনগত অধিকার প্রদান করে। যদি অন্য কোন অনুরূপ

www.pathagar.com

মানবগোষ্ঠী একই জাতিত্বের অধিকারী হয় তাহলে তাদের সমগোত্রীয়দের সাথে মিশে একটি বড় জাতি হয়ে বসবাস করার জন্য তাদেরকে স্থান পরিবর্তন করে অর্থাৎ একই স্থানের অধিবাসী হওয়ার জন্য অভিবাস পরিবর্তন করার স্বাধীনতা প্রদান করে। ইসলামের জাতিপুঞ্জের আইনের চরিত্র সামষ্টিক প্রকৃতির। এ আইন সকল মানব গোষ্ঠীর নিজস্ব আইন কানুনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বৈধ অধিকার প্রদান করে। ইসলামী ব্যবস্থায় কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ দলই সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসাবে বিবেচ্য নয়। কারণ তাদের আইনগত অধিকার সংখ্যা গরিষ্ঠ দল সমূহের অধিকারের মতই আইনের চোখে সমান। সংখ্যালঘিষ্ট দল এ আইনগত অধিকার থাকার কারণে তাদের কোন সদস্যকে সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট হারাবার ভয় থাকে না। যদি কোন সদস্য স্বেচ্ছায়দলত্যাগ করে অন্য দল বা জাতিতে মিশে যেতে চায় তাহলে সে সিদ্ধান্তকে ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থা অবশ্যই সম্মানের চোখে দেখে।

যদি কোন জাতি অপর জাতির অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে অবস্থার শিকারে পতিত জাতি আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে। আদালত আইনের অভিভাবক হিসাবে মামলার বিবেচনা করে রায় দিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে। আদালত সমূহকে কোন জাতির বিরুদ্ধে অথবা স্বয়ং বিশ্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আনীত যেকোন ব্যক্তি কর্তৃক যে কোন অভিযোগের বিচার করারও ক্ষমতা প্রদান করা হবে। ন্যায় বিচারের দ্বার হবে উন্মুক্ত, এর প্রক্রিয়া হবে অবাধ, ধারা কার্যকর হবে দ্রুত। এমতাবস্থায় ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিক এ বিষয়ে আশ্বস্ত হবে যে তার অধিকার অলংঘনীয়, অতি পবিত্র।

সর্বোপরি প্রত্যেক নাগরিক আশ্বস্ত হবে যে, ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব এবং তা নাগালের মধ্যে। ন্যায় বিচারের এ সহজলভ্যতার ফলশ্রুতিতে মামলা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কমে যাবে। মামলার ব্যবস্থাপনাও কঠিন হবে না। কারণ ইসলামী আইনে আদালত অবমাননা, মিথ্যা হলফ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য আইনগত অধিকার হারানোসহ ক্ষতিপূরণ মূলক জরিমানার মত কঠিন শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। যে ক্ষেত্রে দরিদ্রতার জন্য অথবা দেউলিয়াত্বের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়করা সম্ভব হবে না সে ক্ষেত্রে রয়েছে সশ্রম শাস্তির ব্যবস্থা। অধিকন্তু সশ্রম শাস্তি জনসমক্ষে কার্যকর করা হলে তা জনগণের জন্য হবে অপরাধের প্রতিরোধমূলক শিক্ষনীয় বিষয়। অন্যায়ের শিকার ব্যক্তির জন্য এ আশ্বাসের চেয়ে অধিক মূল্যবান কিছু নেই যে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ন্যায় বিচার চেয়ে তা পেয়েছে।

নিজের মতে আনার এবং অন্যের মতে যাওয়ার স্বাধীনতা
(The Freedom to convince and to be convinced)

শেষ কথা হলো এই যে, ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থা জন্মগতভাবে এবং মানবিক বিচারে

www.pathagar.com

প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার এবং সে যে জাতির সদস্যভুক্ত হতে চায় সে জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার এবং তার সন্তান সন্ততির জীবন সে জাতির আইন কানুন মোতাবেক গঠন করার অধিকার প্রদান করে। ইসলাম মনে করে আল্লাহপাক প্রত্যেক মানুষের মনে জন্মগতভাবে বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এবং মানুষকে তার পছন্দ এবং মানবিক বৃত্তি সমূহের চর্চা করার জন্য ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তার এ স্বাধীনতার উপর ইসলাম কোন অভিভাবকত্ব সমর্থন করেনা। অপর পক্ষে ধর্ম এবং আইনগত বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ এবং অভিভাবকত্বকে ইসলাম ব্যক্তির প্রতি, মানবতার প্রতি, সৃষ্টির স্বর্গীয় উদ্দেশ্যের প্রতি প্রকাশ্য অপমান বলে মনে করে।

ইসলামের আন্তর্জাতিক আইন জাতি-রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক সত্যের বিরুদ্ধে তাদের নাগরিকবৃন্দকে আচ্ছাদিত করে রাখার জন্য যে সমস্ত পর্দার সৃষ্টি করে রেখেছে সেগুলোকে ছিন্ন বিছিন্ন করে ফেলবে। এটা করা হবে এ দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য যে পরিণামে সত্যের জয়ই অনিবার্য। কারণ সত্য হল তত্ত্বগত দিক দিয়ে আল্লাহ পাকেরই জ্ঞান এবং সত্য প্রায়োগিক দিয়ে এবং সতসিদ্ধ ভাবে তাঁরই পবিত্র ইচ্ছা।

ফিলাডেলফিয়া, পিএ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি

অভ্যন্তরীণভাবে দূর্বল, অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ, হতাশাগ্রস্ত, অভ্যন্তরীণ চাপে জর্জরিত, দ্বন্দ্ব সংঘাতে পরিপূর্ণ, বৈদেশিক শক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং প্রায়ই অত্যাচারিত বর্তমান মুসলিম বিশ্ব সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে। এর আধুনিক ইতিহাস দুঃখজনক ঘটনাবলীর ইতিহাস। ইসলামের সর্বাত্মক বিপ্লবের উষালগ্নে মুসলিম জাতি ছিল মানব সভ্যতার অভিভাবক। তারা ছিল সভ্য দুনিয়ার প্রভু এবং কেন্দ্রীয় আকর্ষণ। বর্তমান মুসলিম সমাজ প্রভু তো নয়ই বরং সভ্যতার অংশীদারও নয়। এখন মুসলিম এবং ইসলামকে বিশ্ব রাজনীতিতে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা বলে মনে করা হয়।[১]

কি করে এ অবস্থার সৃষ্টি হল এবং কিভাবে মুসলমানগণ এ অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে ?

মুসলিম দেশগুলোতে সকল প্রকার দুর্গতির জন্য বৈদেশিক শক্তি এবং সাবেক সাম্রাজ্যবাদকে দোষারোপ করা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। যদিও এ অভ্যাস মুসলমানদের অনেক দুঃখ কষ্ট ও বাধাবিঘ্নের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে, তথাপি এ প্রক্রিয়ার দ্বারা দুর্গতির অভ্যন্তরীণ কারণগুলো ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এ রোগগুলো অবক্ষয়ের এমন এক প্রক্রিয়ায় গতি সঞ্চার করেছে যা মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতাকে করেছে নির্মূল। ফলশ্রুতিতে এ দুর্বলতা বহিঃশত্রুকে এনেছে দৃশ্যপটে। আর তাদের আগমনে সমস্যা হয়েছে জটিল থেকে জটিলতর। অভ্যন্তরীণ কারণগুলো পুরোপুরি অনুধাবন না করে বাইরের কারণ এবং সেগুলো দ্বারা মুসলমানদের জন্য সৃষ্ট জটিলতার সমস্যা নিয়ে কার্যকর কিছু করা সম্ভব নয়।

প্রাথমিক এবং মৌলিক সংজ্ঞা সমূহ

এ বিপর্যয়ের ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন মৌলিক ঐতিহাসিক পটভূমি এবং মৌলিক কতগুলো আলোচনা।

একটি ধর্ম এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের প্রকাশ ঘটে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে। ইসলামের শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) (৫৭০-৬৩২ খৃঃ) ছিলেন প্রখ্যাত আরব গোত্র কুরাইশ এর অন্তর্ভুক্ত। কুরাইশ ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) পুত্র ইসমাইল (আঃ)

[১] মুসলিম বিশ্ব বলতে এখানে এমন সকল লোককে বোঝানো হচ্ছে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয় এবং ইসলাম ধর্ম ও ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম মনে করে তারা পৃথিবীর যেখানেই বসবাস করুক না কেন।

www.pathagar.com

এর বংশধর। আরব উপ-দ্বীপের পশ্চিমাংশে অবস্থিত পবিত্র মক্কা নগরীর অভিভাবক ছিলেন এ কুরাইশ গোত্র। পরিণত ৪০ বৎসর বয়সে মুহাম্মদ (সঃ) এ মর্মে অহী (প্রত্যাদেশ) প্রাপ্ত হন যে তিনি নবী এবং আল্লাহর বার্তাবাহক নিযুক্ত হয়েছেন। মূলত পবিত্র কুরআনে রেকর্ডকৃত এ অহীই হল শরীয়াতের (পৃথিবীতে মানুষের জীবনের সকল প্রকার আচার আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে মুহাম্মদ (সঃ) এর মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহর ইচ্ছা)[২] প্রথম উৎস। শরীয়াতের দ্বিতীয় উৎস হল নবী (সঃ) এর সুন্নাত। সুন্নাত হল সংগৃহীত নবী করিম (সঃ) এর সকল প্রকার উক্তি, কাজ এবং অনুমোদিত ও অননুমোদিত বিষয় যা তিনি বলেছেন বলে জানা গেছে।

মুসলিম আইন বিজ্ঞান (ফিকাহ) সাধারণ নীতিমালা হতে পদ্ধতিগতভাবে আইনে উপনীত হওয়ার জন্য নিজস্ব একটি পদ্ধতি বিজ্ঞানের উন্নয়ন করে। এ পদ্ধতি বিজ্ঞানের উন্নয়ন করা হয়েছে শরীয়াতের ধারায় ব্যাখ্যা প্রদান এবং সাধারণ নীতিমালা হতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য। যেমন *কিয়াস* (তুলনা করা) এবং *ইজমা* (ঐক্যমত)। তথ্য সূত্রের উৎস এবং পদ্ধতি বিজ্ঞান এ দু'টোর সম্মিলনে সৃষ্টি হয়েছে উসূল (মুসলিম আইন শাস্ত্রের উৎস এবং পদ্ধতি)। উসূল এর কিয়দংশ মৌলিক এবং কিয়দংশ সম্পূরক। মৌলিক উসূলের সংখ্যা চার-*কুরআন, হাদীস, ইজমা* এবং *কিয়াস*। মুসলিম আইন শাস্ত্রবিদগণের বিভিন্ন দলের মধ্যে কত সংখ্যক উসূল ব্যবহৃত হবে বা কয়টির উপর গুরুত্ব দেয়া হবে এ নিয়ে মতভেদ আছে। অবশ্য সকল দলের সংখ্যাতেই কুরআন এবং *সুন্নাহ* অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় অধ্যায়ে মুসলিম চিন্তাধারা সম্পর্কিত পদ্ধতি বিজ্ঞানের আলোচনা কালে *উসূল* সম্পর্কে ও আলোচনা করা হবে।

দশম শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলমানগণ স্বীকৃত আইন-শাস্ত্র বিষয়ক মতবাদগুলোর সংখ্যা চার-এ সীমিত করেছেন। এগুলোকে বলা হয় আইন শাস্ত্রের চার সুন্নী *মাযহাব*। তখন থেকে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলিম চিন্তাধারা অনড় বৈশিষ্ট্যের গন্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং অনুকরণ *(তাকীলদ)* দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে প্রাধান্য লাভ করে।[৩] ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিকতাবাদীগণ আইন শাস্ত্রে এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথাকথিত আধুনিক ইজতেহাদের[৪] প্রধান শক্তি হিসাবে তালফিক (সংগৃহীত উদাহরণ হতে আবিষ্কার) এর ধারণা প্রবর্তন করেন। এন, জি কোলসনের ভাষায় ঃ

'তথাকথিত আধুনিক ইজতিহাদ ঐশী গ্রন্থ হতে জোর করে ঐরূপ ব্যাখ্যা প্রদানের

---

[২] কুরআনের আয়াতের বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'আল-কুরআনুল করীম' (ঢাকা, ১৯৯৩) এর হুবুহু অনুসরণ করা হয়েছে।- অনুবাদক

[৩] পরিশিষ্ট নোট ১ দ্রষ্টব্য

[৪] ইজতিহাদ হল আইনের সম্প্রসারণে মানবীয় যুক্তি ব্যবহার করা

www.pathagar.com

চেয়ে তেমন বেশী কিছু নয় যা নিজের খেয়াল খুশী অনুযায়ী নির্মিত পূর্ব ধারণা প্রসূত মান দন্ডের সাথে খাপ-খায়। এটা প্রতিভাত হয় যে, আধুনিক মুসলিম আইনশাস্ত্র এখন কোন পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারেনি.....। পদ্ধতি বিজ্ঞানের নীতির সামঞ্জস্যের অভাবে আধুনিক আইন শাস্ত্রে সংস্কার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী মনোভাব কাজ করেছে। তদুপরি স্থায়ী সংস্কার কর্মের অধিকাংশগুলো স্থায়িত্বের কাল বিচারে মনে হবে ঐগুলো নিছক ক্ষণস্থায়ী প্রয়োজন এবং আংশিক সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।[৫]

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে মধ্যযুগের বিচার্য বিষয়ক চিন্তাধারাকে এ পুস্তকে ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব বা চিন্তাধারা হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

ঐতিহ্যবাদ এবং পাশ্চাত্যবাদ

মুসলিম চিন্তাধারা, প্রযুক্তি এবং সামাজিক পদ্ধতি যখন *তাকলীদকে* প্রতিষ্ঠিত জীবন পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে স্থবির হয়ে পড়ে তখন ইউরোপ আত্মনিয়োগ করে নতুন ধ্যান ধারণা ও পদ্ধতি উন্নয়নের কাজে। সপ্তদশ শতকে যুদ্ধবিদ্যা এবং রাজনৈতিক সংগঠনের দিক দিয়ে ইউরোপ মুসলিম বিশ্বকে অতিক্রম করে। এর ফলশ্রুতিতে মুসলমানরা আত্মরক্ষামূলক অবস্থা গ্রহণ করে পড়ে থাকে।

ইউরোপের সাথে ঘনিষ্ট এবং বেশী বেশী যোগাযোগের ফলে মুসলিম কর্তৃপক্ষসমূহ বিশেষ করে সামরিক ও সংশ্লিষ্ট পেশার প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ এবং সেগুলো প্রয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়। মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ সমূহ সামরিক ও পেশাদারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, ইউরোপ থেকে শিক্ষক ভাড়া আনে এবং নতুন দক্ষতা ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জনের জন্য মুসলিম দেশের ছাত্রদেরকে ইউরোপে প্রেরণ করে। এ পদক্ষেপ মুসলিম দেশসমূহের সামাজিক কাঠামোর জন্য এক মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে। এ পদক্ষেপ সমাজের ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দেয়। কারণ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ হল ইসলামের বৈরী এক আদর্শবাদ। এ অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হল আলেম সম্প্রদায় এবং পন্ডিত ব্যক্তিগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিজেদেরকে গভীরভাবে নিবিষ্ট রেখেছেন তাকলীদ এবং আইন শাস্ত্রের নিরস চর্চায়। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না।

পদ্ধতিগতভাবে পরীক্ষণ কেন্দ্রিক পর্যবেক্ষণ মূলক জ্ঞান অর্জনের যে ধারণা সে

---

[৫] N.J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), পৃ: ৭৫, ৮০-৮১, ১৫২-১৫৪, ১৯৬-১৯৯, ২১১-২১৭, ২২০-২২৩, আরও দ্র. M. Khadduri, "From Religion to National Law," in *Modernization of the Arab World,* ed. J. Thompson and R. Reischauer (New York: Van Nostrand, 1966), পৃ: ৪১.

www.pathagar.com

সম্পর্কে তাঁদের অর্জিত শিক্ষার দৈন্য ছিল। এ অবস্থা তাঁদেরকে নতুন বিকাশমান সামাজিক বিজ্ঞান সমূহ এবং ঐ সবের পদ্ধতি ও প্রয়োগ সম্পর্কিত গুরুত্বের ব্যাপারে তাঁদেরকে শত্রু ভাবাপন্ন করে ফেলে রাখে। সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংগঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন জ্ঞান এবং পদ্ধতির ঢেউ কিরূপ পরোক্ষ প্রভাব সৃষ্টি করবে সে সম্পর্কে তাঁদের কোন চৈতন্য ছিল না। এ নতুন জ্ঞানের বিকাশের অন্তর্নিহিত শক্তি ইসলামের মূল্যবোধ, লক্ষ্য এবং সামাজিক মডেলের সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত তা অনুধাবন করতেও তাঁরা সক্ষম ছিল না।

মুসলমানদের মধ্যে পেশাজীবীও আমলা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। ক্রমেক্রমে এ শ্রেণী গুলোর শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে। কিন্তু ইসলামের উপর ওলামাদের ন্যায় তাদের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞানের ও আদর্শিক সচেতনতার অভাব ছিল। ইসলামের প্রতি তাদের অঙ্গীকারও তেমন জোরালো ছিল না। অমুসলমান সংখ্যালঘুদেরও আর একটি শ্রেণী ছিল। পেশাজগতে ছিল তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা। অপরদিকে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবতো বিধ্যমান ছিলই। এসব কারণে জ্ঞান এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ- এ দু'টি ভাগে বিভুক্ত হয়ে পড়ে। আলেম সমাজ প্রকৃত পক্ষে এক ঘরে হয়ে থাকার অবস্থায় চলে যায়।

ধর্মীয় শিক্ষা প্রাথমিক যুগে ইসলামী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত অপরিবর্তনীয় ঐতিহাসিক ধর্মীয় কতগুলো ঐতিহ্যের রক্ষক এবং প্রতীকে পরিণত হয়। অপর পক্ষে মুসলিম চিন্তা ধারার পরিপন্থী ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমবর্ধমানভাবে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শ গ্রহণ করতে থাকে। এ প্রক্রিয়া মুসলিম শিক্ষা এবং চিন্তাধারার পুনঃর্জাগরণে কোন অবদান রাখেনি। অপরপক্ষে পদ্ধতিগত পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষন মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি কৌশল হিসাবে কখনও গণ্য হতে পারেনি। ফলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা পড়ে থাকে মৃয়মান অবস্থায়।

এ বিপরীতমুখী শ্রেণীকরণ উভয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রেরণা এবং প্রত্যয়ে অবক্ষয়ের এমন এক প্রভাব সৃষ্টি করে যার ফলশ্রুতিতে আলেম সমাজ হয়ে পড়েছে সরকারী শিক্ষাক্রমের সাথে সম্পর্কহীন। সরকার এবং আমলাতন্ত্র হয়েছে জনবিচ্ছিন্ন পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী। পাশ্চাত্যের প্রেরণা ও ধ্যান ধারণার উৎসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী- এ দু'ধরনের শিক্ষিত লোকদের মেরুকরণ হয়েছে দু'টি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে। তাকলীদ (অনুকরণ) এবং তালফীক (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা হতে সত্যানুসন্ধান) এর অনুসায়ী সমকালীন মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের উভয় অংশ ইসলামের পুনর্জাগরণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নতুন মুসলিম মনস্তত্ত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কল্যাণের চেয়ে ক্ষতিই করেছেন বেশী। আধুনিক বিশ্বে ইসলামী

www.pathagar.com

দৃষ্টিকোণ এবং জীবনের বস্তুগত দিকের মধ্যে একটি সম্মত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ধার্মিক এবং ধর্মনিরপেক্ষীদের সম্মিলন ঘটানো দরকার। এটা করা নিবেদিত প্রাণ মুসলিম বিবেকের একান্ত কর্তব্য। সুতরাং ইসলামের উপলব্ধি এবং বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থান কাল বিষয়টি পরিস্কার করে নেয়া মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য। এ সংকটের নিরসন হলে আজকের আশু প্রয়োজনীয় মৌলিক, গতিশীল এবং বাস্তবধর্মী নীতিসমূহ লাভ করা সম্ভব হবে। এটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আমাদের অবশ্যই ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় উদ্ভাবিত এবং ব্যবহৃত কৌশল সমূহের উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা বিস্তৃত করার কাজ করতে হবে। বিশেষ করে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যেখানে রাজনৈতিক এবং আইনগত উপাদানসমূহ সুস্পষ্ট রূপে বিদ্যমান ছিল এবং যে সব ক্ষেত্রে অমুসলিম দলসমূহের সাথে যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় সংশ্লিষ্ট ছিল।

(৩) *সিয়ার* ঃ আইনের একটি উৎস-

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে ইসলামী গ্রন্থাবলীর আলোচনা এবং বিশ্লেষণকালে কতিপয় লেখক এ ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যে ফিকাহ্ নিজেই আইন এবং এটা আইনের দ্বিতীয় কোন উৎস নয়। আধুনিক প্রেক্ষাপটে ফিকাহর এ দিকটি সম্পর্কে অবহিত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া মধ্যযুগের মুসলিম সরকার পদ্ধতির উপরও গবেষণা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ আইন প্রণয়নের জন্য আধুনিক মুসলিম প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তাকে রীতিবদ্ধ করার জন্য মুসলমানগণ যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ঐ প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করার জন্য উক্ত রূপ গবেষণা প্রয়োজন।[৬]

ফিকাহ্, উসূল আল ফিকাহ এবং *শরীয়াতের* অর্থের মধ্যে কিরূপ পার্থক্য বিদ্যমান তা পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন। এ পৃথিবীতে মানুষের আচরণ কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কে *রাসূল* (সঃ) এর মাধ্যমে প্রকাশিত মহান আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাই হল *শরীয়াত*। *উসূল আল ফিকাহ্* হল প্রত্যাদেশের উপাত্ত উৎস হতে আইন এবং আদেশ-নিষেধ প্রণয়নের বিজ্ঞান। *ফিকাহ* হল *কুরআন* ও সুন্নাহ হতে এবং *উসূলের* অন্যান্য নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রণীত আইন কানুনের সমাহার। সুতরাং বাস্তবে *ফিকাহ্র* অর্থ দাড়ায়

---

[৬] দ্রঃ Muhammad Hamidullah, *The Muslim Conduct of State*, ৫ম সংশোধিত সং (Lahore, Pakistan: Sh. Muhammad Ashraf, 1963), পৃ: vii-viii এবং 3-10; Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1952), পৃ: ২৫১-২৯৫, এবং Majid Khadurl's introduction to the classical work of Siyar, *The Islamic Law of Nations* by Muhammad al Shaybani, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1966). পৃ: ৬৩-৬৮.

www.pathagar.com

মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক লিখিত আইন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও মতামতের সামগ্রিক যোগফল যা সকল মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞের আইনের ম্যানুয়্যাল-এ পাওয়া যায়। *ফিকাহ্‌কে শরীয়াতও* বলা হয়। কারণ এর মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে এবং বাস্তবক্ষেত্রে আল্লাহর প্রকাশিত ইচ্ছার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতিনিধিত্ব হয়ে থাকে। সাধারণ অর্থে *ফিকাহ্* সাহিত্য এবং *উসূল ফিকাহ্, ফিকাহ্* বিজ্ঞানের অন্তর্গত।[৭]

ইসলামী ধারণামতে আইন হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধে সজ্জাত কতগুলো দিক-নির্দেশনা। এসব আইন আল্লাহ তায়ালার স্বর্গীয় উদ্দেশ্যের লক্ষ্যাভিমুখে নিবেদিত। সুতরাং প্রথমত আদেশের চেয়ে উপদেশদানই এসব আইনের লক্ষ্য। এসব আইন প্রণীত হয়েছে নৈতিক শিক্ষাদান এবং বাস্তবে কার্যকর করার জন্য।

পাশ্চাত্য ধারণা মতে আইন হচ্ছে এমন কতগুলো নিয়ম নির্দেশনার সমাহার যা কার্যকর করার জন্য জাতিসমূহ কর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহিত হয়েছে। বিভিন্ন উপায়ে এ অনুমোদন অর্জিত হয়। এ উপায়গুলো হল লিখিত দীর্ঘ রচনা, প্রথা, নৈতিক এবং ধর্মীয় অঙ্গীকার অথবা এ সবের যেকোন সংযোজন।

আধুনিক পাশ্চাত্য আইনের সাথে সামগ্রিকভাবে *শরীয়াতের* আইন অথবা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক *শরীয়াতের* আইনের সংশ্লিষ্ট অংশের অনুধ্যন এবং তুলনা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারণাগত স্বচ্ছতা একান্ত প্রয়োজন। এরূপ স্বচ্ছতা থাকলে শক্তি ও দুর্বলতা এবং ভ্রান্তি ও স্থবিরতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব।

এভাবে বর্তমানকালের মুসলমানদের মৌলিক সমস্যাগুলোর একটি চিহ্নিত করা সম্ভব। সমস্যাটি হল চিন্তা এবং পদ্ধতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা। কোন্ আইন মুসলমানেরা নির্বাচিত করবে, অনুমোদন করবে বা প্রত্যাখ্যান করবে, সমস্যা সেটা নয়। বরং সমস্যা হল মুসলিম চিন্তাধারার গলদ কি এবং *শরীয়াত* কেন মানুষকে আর সেরূপ নিয়মকানুন সরবরাহ করছে না, যেগুলো তাকে আরো কার্যকরভাবে তার মানবীয় পরিবেশ এবং গন্তব্য নিয়ন্ত্রণে সক্ষম করতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা এ সমস্যার উপর বিস্তারিত আলোচনা করব। এ আলোচনার মাধ্যমে বুঝা যাবে কিভাবে সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাচীন মুসলিম পদ্ধতি বিজ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। এতে আরো জানা যাবে এসব ত্রুটিগুলো কিভাবে মুসলিম চিন্তাধারায় সংকটের গভীরে বিরাজমান আছে। আধুনিক বিশ্বে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ অংশগ্রহণের বিষয় সম্পর্কে এটা আমাদের সাহায্য করবে।

---

[৭] দেখুন পরিশিষ্ট নোট-২ টীকা-২

www.pathagar.com

সমস্যার প্রকৃতির উপর কিছুটা আলোকপাত করার জন্যই কেবল এখানে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে কিছু ভুল ধারণা এবং ত্রুটিপূর্ণ তুলনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়ার জন্য। ক্লাসিক্যাল সামাজিক পদ্ধতির প্রক্রিয়ায় মুসলিম সমাজের জন্য আইনের মৌলিক উৎস হিসাবে কাজ করাই হল *ফিকাহ্* এবং *সিয়ার* এর ভূমিকা-এ বিষয়টি বুঝাবার জন্য আমরা এখানে প্রয়াস পেয়েছি।[৮]

বিষয়টি পরীক্ষা করার পূর্বে *আল সারাখসি* কর্তৃক প্রদত্ত *সিয়ার* এর সংজ্ঞাটি আমরা উল্লেখ করতে চাই। কারণ এটা মুসলিম আইন বিজ্ঞানে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হত সেগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করবে। এর ফলে *ফিকাহ* এবং *সিয়ার* সামগ্রিকভাবে কেন 'আইন' এর অর্থে কাজ না করে ঠিক আইনের একটি প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করেছে- সে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা সহজ করবে। *আল সারাখসি* আইন বিজ্ঞানের ধারণা মতে *'সিয়ার* এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

সীয়ার বিশ্বাসীদের (মুসলিম) সাথে ঐ সমস্ত লোকদের আচরণ বর্ণনা করে যারা শত্রু ভূ-খন্ডের অবিশ্বাসী (অমুসলিম) এবং ঐ সমস্ত লোক যাদের সাথে চুক্তি করা হয়েছে এবং যারা সাময়িকভাবে মুসটামান- এমন কোন রাষ্ট্রের প্রজা, যে রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং যাদেরকে মুসলিম ভূ-খন্ডে প্রবেশ করতে নিরাপদ আচরণের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে) অথবা স্থায়ীভাবে মুসলিম ভূখন্ডে অবস্থানকারী যিম্মি-(মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজা) ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) এবং বিদ্রোহী (বাঘুন)।[৯]

মুসলমানদের সাথে যেসব লোক এবং রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান তাদের সাথে সভ্য আচরণের আইন কানুনও *সিয়ার* এর অন্তর্ভুক্ত শত্রুপক্ষের সাথে আচরণের বিধি বিধানের সাথে ঐ সমস্ত আইনের মত পার্থক্য রয়েছে।

যখন আমরা বলি *ফিকাহ্* মুসলিম আইনের উৎস তখন কিন্তু এ কথা বলে স্বয়ং *ফিকাহ্* এর উৎসের সাথে আইনের উৎসকে মিশিয়ে ফেলা ঠিক নয়। *ফিকাহ্* এর উৎস বলতে এখানে বুঝান হচ্ছে *কোরআন* এবং *সুন্নাহকে*। আর এ দু'টো মিলে হল *শরীয়াত*। *ফিকাহ্* হল মুসলিম পন্ডিতবর্গ, উচ্চমানের আলেম, বোদ্ধা এবং স্বাধীন চিন্তার অধিকারী সংস্কারকবৃন্দ *(মুজতাহিদুন)* কর্তৃক আইন বিজ্ঞানের ধারায় প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, প্রতিপাদন এবং মতামতের সমাহার।[১০]

---

[৮] প্রাগুক্ত

[৯] M. Khadur's introduction to al Shaybani, *The Islamic Law of Nations*, পৃ: ৪০, quoting Shams al Din Muhammad bn Ahmad ibn Sahl al Sarakhsi, *Kitab al Mabsut* (The Detailed Work of Jurisprudence) (Cairo: 1960), পৃ: ২.

[১০] দেখুন পরিশিষ্ট, টীকা-৩

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম চল্লিশ বছরের ইতিহাসের পরবর্তী উমাইয়া শাসনামলে *ফিকাহ* এরূপ অবস্থায় উপনীত হয়। মুসলিম সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ লাভের প্রচেষ্টায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলাকালে মুসলিম সমাজের একনিষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গ আইন এবং *দ্বীনের* (ইসলামী জীবন পদ্ধতির) অন্যান্য দিকের উপর গবেষণা ও অনুধ্যানের মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয় সামাজিক এবং অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়াদিতে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে ঐসব বিষয়ে কল্যাণ সাধনের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ, অর্থাৎ নবী করিম (সঃ) ও প্রথম চার খলিফা *(খোলাফায়ে রাশীদূন)* এবং অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) এর যুগ আদর্শ যুগ হিসাবে বিবেচিত। ঐ সময়ই আইনের অনেক পদ্ধতি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। উমাইয়া শাসন আমল হতেই সরকারের কর্ম পদ্ধতিতে বিচারকদের মতামতের বাইরেও অনেক বিষয়াদি বিবেচনায় আনা হয়। ইসলামের অনেক বিজিত রাজ্যের জনগোষ্ঠী তাদের ইসলাম পূর্ব রীতি নীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার আচরণ করতে থাকে। এভাবে তারা সরকার এবং বিচারকগণের প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনের মূল্যমান থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নেয়।

সুন্নী মুসলমান বা অধিকাংশ মুসলমান (আল-জামাহুর) হানাফী, মালেকী, শাফী এবং হাম্বলী মতাদর্শের (মাযহাব) অন্তর্ভুক্ত বলে আমরা জানি। এ দলগুলোকে প্রকৃতপক্ষে একই দল হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কারণ এদের ইসলাম সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই প্রকার। যদিও এ মতবাদগুলো ইসলামের (যেমন ইসলামের মৌলিক ভিত্তি ৫টি, ৪টি বা ৬টি নয়) মৌলিক নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং ঐক্যবদ্ধ হতে পারে ইসলামের মৌলিক দার্শনিক এবং ধর্মীয় বিষয়াদির ভিত্তিতে তথাপি অবশ্য তারা সকল প্রকার আইনগত মতামতের ক্ষেত্রে ঐক্যমত পোষণ করে না।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আওতা হতে গৃহীত কতিপয় উদাহরণ নিলে দেখা যাবে যে একটি ধারণা প্রকৃত সত্য হতে কত দূরে। ধারণাটি হল এই যে *জিহাদ* এবং *সিয়ার* এর উপর মৌলিক লেখাগুলো আজও জাতিসমূহের মধ্যে একটি ইসলামী আইনের রূপ পরিগ্রহ করে আছে। এবং এটা একটা সমন্বিত মৌলিক আইনের পদ্ধতি হিসাবে টিকে আছে।[১১] এ সমস্ত উদাহরণ হতে জানা যায় কিভাবে বিভিন্ন মাজ হাব জীবন এবং মরণ সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়সমূহ নিয়েও মতানৈক্য করে। এক মাজহাব যেখানে মৃত্যুদন্ড

---

[১১] এ প্রসংগে M. Khadduri, *War and Peace*, and M. Hamidullah, *The Muslim Conduct of State*, ভাল দৃষ্টান্ত, আরও দেখুন আরও দ্র. A. Khallaf, *Khulasat Tarikh al Tashri al Islami* (Kuwait: Dar al Qalam, 1971), পৃ: ২৩-৪৯ এবং ৬৫-৮২, এবং S; Ramadan, *Three Major Problems Confronting the World of Islam* (Tacoma Park, MD: Crescent Publications, n.d.) পৃ: ১-৬

www.pathagar.com

প্রদান করে বা দাবী করে অপর মাজহাব সেখানে ঐ বিশেষ মামলার দোষী ব্যক্তির মুক্তি ও নিরাপত্তা জারী করে। অপরাপর কিছু বিষয়ে চার মাজহাব কর্তৃক সম্ভাব্য প্রায় সকল প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে দেখাও অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে মাজহাবগুলোর মধ্যে ঐ সমস্ত সুস্পষ্ট মত পার্থক্য তত্ত্বগত ধারণার বিভিন্নতার ফলশ্রুতি নয়। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখব মাজহাবগুলো *উসূল*- এর বিষয় সম্পর্কে আংশিকভাবে একমত বা আংশিকভাবে দ্বিমত পোষণ করেছে। *উসূল* থেকে সৃষ্টি হয়েছে উৎসের। ঐ উৎস ব্যবহৃত হয়েছে আইনগত মতামত গঠনের জন্য। সকল বিষয়ে সকল মাজহাব *কুরআন* এবং *সুন্নাহ্‌র* ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে। তারা ইজমাকেও (ঐক্যমত) উৎস এবং পদ্ধতি হিসাবে স্বীকার করেছে। কিন্তু প্রয়োগের পরিধির ব্যাপারে সকল ক্ষেত্রে ঐক্যমতে আসতে পারেনি।

এ বিষয়টি কাদের ঐক্যমতের প্রশ্নের চতুর্দিকে আবর্তিত হয়েছে? এটা কি *রসূল* (সঃ) এর *সাহাবীগণের* (রাঃ) ঐক্যমত; নাকি সকল মদিনাবাসীর ঐক্যমত নাকি ঐ সকল লোকদের ঐক্যমত যারা "বাঁধে এবং ছাড়ে" (এ প্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ জনমতের নেতৃবৃন্দ) নাকি ওলামায়ে কেরামগণের অথবা *উম্মাহর* (জাতির)?[১২] অভিজাত ও জনমত সৃষ্টিকারী নেতৃবৃন্দ এমনকি আরো একটি প্রকট আকার ধারণ করে যখন এটা হানাফী মাজহাবেব মতভেদ আইন বিজ্ঞানের ইসতিহসান (আইনজ্ঞের অগ্রাধিকার) এর পর্যায়ে আসে। শাফী মাজহাবে এটাকে উসূলের অন্তর্ভুক্ত করতে চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করেছে।

এ মতভেদগুলো *উসূলের* অন্তর্নিহিত প্রকৃতির জন্য প্রকট আকার ধারণ করেছে। উৎস এবং পদ্ধতি সমূহের মধ্যে সুশৃঙ্খল এবং ব্যাপক তত্ত্বায়নের বিষয় অন্তর্ভুক্ত নেই। বিশেষ কোন অনুশীলন এবং বিষয় সম্পর্কে *কুরআন* এবং *হাদীসের* আলোকে অবরোহ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এগুলোকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ নবী করিম (সঃ) প্রণীত একটি সামগ্রিক সামাজিক পদ্ধতি তখন বিদ্যমান ছিল। জুরিগণ এর আওতায় কাজ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

বিশেষ করে মতভেদ কি পরিমাণ করা যেত তা জানা যাবে সুন্নী মুসলমানগণের আইন বিষয়ক নিম্নোক্ত মতামতের উদাহরণ থেকে।

জিহাদ কি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ সংগঠনের একটি বাধ্যবাধকতা না ইসলামের সংরক্ষণের প্রয়োজনে একটি কর্তব্য?

---

[১২] Muhammad Abu Zahrah, Malik : *Hayatuh wa 'Asruh wa Ara'uh wa Fighuh* (Malik : His Life, His Age, His Opinions, and His Jurisprudence) (Cairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1963), পৃ: ৩২২-৩৩৫, ৩৫২-৩৬০.

www.pathagar.com

আল সাওরী (রঃ) এবং আবু হানিফা (রঃ) এ প্রশ্নে একইরূপ অবস্থান গ্রহণ করেন। অপর পক্ষে হানাফী আইনবিদ আল সারাখসি (রঃ) গ্রহণ করেন শাফী মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল বিপরীত অবস্থান।[১৩]

আল সাওরী বলেন ঃ

মুশরিকরা যুদ্ধ আরম্ভ না করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য নয়। কিন্তু তারা যুদ্ধ আরম্ভ করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য। আবু হানিফা (রঃ) এর মতে জিহাদ মুসলমানদের একটি কর্তব্য কিন্তু প্রয়োজন না হলে তাদের যুদ্ধ করার দরকার হয় না।

আল সারাখ্সী বলেন ঃ

(মুসলমানদের উপর) *জিহাদ* এবং যুদ্ধের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে পর্যায়ক্রমে ..... (চূড়ান্ত পর্যায় হল) অবিশ্বাসীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সর্বাত্মক আদেশ। এর অর্থ হল *জিহাদ* একটি অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু এ বাধ্যবধকতার অর্থ হচ্ছে ইসলামকে রক্ষা করা এবং *মুশরিকদেরকে* পরাস্ত করা।

শাফী (রঃ) বলেন ঃ

জিহাদকে পছন্দের বিষয় করার পর আল্লাহ একে অবশ্য কর্তব্য করেছেন। সুতরাং *জিহাদ* অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যেক সফল ব্যক্তি অবশ্যই এর অনুশীলন করবে যে পর্যন্ত না দু'টি বিষয় অর্জিত হয়। এর একটি *ইসলামের* শত্রুদেরকে মোকাবিলা করার জন্য উল্লেখযোগ্য শক্তি অর্জন। দ্বিতীয়টি হল পর্যাপ্ত মুসলিম শক্তির সমাবেশ। মুসলিম শক্তির পরিমাণ এরূপ হতে হবে যা সকল মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণ এবং কিতাবী লোকদের নিকট হতে *জিয়য়া* (অমুসলিম প্রজাবৃন্দ কর্তৃক মুসলিম রাষ্ট্রে প্রদত্ত টেক্স) আদায় করার লক্ষ্যে জিহাদ চালিয়ে নেয়া যায়।[১৪] যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ মুসলিম শক্তি এ কর্তব্য পালন করে তবে যে সমস্ত মুসলিম জেহাদে অংশ গ্রহণ না করে তাদের পাপ গণ্য করা হবে না।[১৫]

অমুসলিম শত্রুপক্ষের প্রজাবৃন্দকে *(আল হারবী)* কি কোন অপরাধের জন্য মুসলিম আইনের আওতায় শাস্তি প্রদান করা যায় যেহেতু এদেরকে একবার মুসলিম ভূ-খন্ডে

---

[১৩] Al Shafi, *Al Umm* (Cairo : Dar al Sha'b, 1903), খ: ৪, পৃ: ৮৪-৮৫ এবং ৯০ এবং al Shaybaini, *Sharh al Siyar* (Cairo: Ma'had al Mukhtutat bi Jami at al Duwal al 'Arabiyah, 1958), খন্ড-১, পৃ: ১৮৮

[১৪] জিয়য়া শব্দটি আরবি ক্রিয়া জায়া থেকে এসেছে, যার অর্থ পূরণ করা বা বিনিময়ে কিছু দেয়া

[১৫] Al Shafii, *Al Umm*, খণ্ড ৪, পৃ: ৯০

www.pathagar.com

প্রবেশ করলে নিরাপদ আচরণ অথবা নিরাপত্তার *(আমান)* নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে?

একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ- আল আওজাই বলেন যে *তারা মুসলিম আইনের আওতায় শাস্তি (হুদূদ)* পাওয়ার যোগ্য নয়। নিরাপত্তার অধিকারী এক শত্রু প্রজা কর্তৃক কৃত ব্যভিচার অথবা চুরি সম্পর্কিত এ প্রশ্নের জবাবে আবু হানিফা (রঃ) বলেন, *"সে প্রচলিত আইনের অধীনে শাস্তির (আল হদীদ) আওতাধীন নয়। কিন্তু সে যা চুরি করেছে তা ফেরত দিতে বাধ্য"*। সুতরাং সে ব্যভিচারের জন্য সম্পূর্ণরূপে শাস্তি বেঁচে যায়।

শাফী (রঃ) বলেন, *"যখন শত্রু পক্ষের প্রজা মুসলিম ভূ-খন্ডে প্রবেশ করে এবং অপরাধ করে তখন তারা মুসলিম আইনের আওতায় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তাদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা দু'রকমের হতে পারে। প্রথম' যে অপরাধ মানবাধিকার ক্ষুন্ন না করে তা ক্ষমা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়, যে অপরাধ মানবাধিকার ক্ষুন্ন করে তা শাস্তির আওতাধীন।*[১৬]

৩. তৃতীয় উদাহরণ হল যে মুসলমান ইচ্ছাকৃতভাবে কোন অমুসলিম প্রজাকে হত্যা করে তার শাস্তি কি? কোন ইহুদী খৃষ্টানের অথবা পারসিকের রক্তপণ মুসলমানের রক্তপণের সমতুল্য। যদি কোন মুসলিম এদের যে কোন একজনকে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি কি প্রাণদন্ড (কাওদ)?

আল শাফী (রঃ) বলেন, *কোন মুমিন (বিশ্বাসী) কোন অবিশ্বাসীকে হত্যার জন্য প্রানদন্ডের আওতায় থাকবে না। কোন ইহুদী অথবা খৃষ্টানের রক্ত পণ হচ্ছে একজন মুসলমানের রক্তপনের এক-তৃতীয়াংশ। অপর পক্ষে একজন পারসিকের রক্ত পণ হল আট শত দিরহাম।*[১৭]

৪. চতুর্থ উদাহরণ হল অমুসলিমদের জীবনের বিনিময়ে জিযয়া গ্রহণ সংক্রান্ত প্রশ্নঃ

সুন্নী আইন বিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদে অন্ততঃ তিনটি অবস্থান এ বিষয়ে লক্ষ্য করা যায়। শাফী এবং হাম্বলী মতবাদের দাবী হল জিযিয়া কেবল কিতাবী এবং পারসিকদের নিকট হতেই গ্রহণযোগ্য। বহুত্বে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির নিকট হতে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফী ও মালেকী মতবাদ অনুসারী আরব বহুত্ববাদী ব্যতীত সকল অমুসলিমের নিকট হতে জিযিয়া গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় আরেকটি মত অবশ্য মালিক (রঃ) এর সম্পর্কে

---

[১৬] প্রাগুক্ত খ.৭. পৃ: ৩২৫-৩২৬.

[১৭] প্রাগুক্ত খ. ৭. পৃ: ২৯০-২৯১.

www.pathagar.com

অবতারণা করা হয়। বলা হয় যে তিনি আওজাই এবং সাওরীর মতের সাথে একমত। আর তা হলো এই যে জিয়িয়া সকলের নিকট হতেই গ্রহণযোগ্য। [১৮] বিপরীতক্রমে শেষোক্ত অবস্থান হল বহুত্ববাদীদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করো। এভাবে তারা জীবনে বেঁচে যায়। অপরপক্ষে প্রথম অবস্থান অনুযায়ী তাদেরকে এ সুযোগ দেয়া যায় না।

৫. যুদ্ধে যে শ্রেণীর লোক হত্যার আওতাধীনে পড়ে না তাদের শ্রেণীর আওতা বৃদ্ধি বা কমিয়ে কি মানুষের জীবন রক্ষা করা কর্তব্য?

ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, *যে সমস্ত লোক অন্ধ, পাগল অথবা খুব বৃদ্ধ তাদেরকে হত্যাকরা উচিত নয়। যে সব লোক সন্ন্যাসীর আশ্রমের (আহলাল সাওয়ামী) অধিবাসী বাঁচার জন্য তাদেরকে তাদের পর্যাপ্ত মালামালসহ আবাসে রেখে দেওয়া উচিৎ।* [১৯]

আল সাওরী (রঃ) এবং আল আওজাই (রঃ) হত্যার যোগ্য লোকের শ্রেণীর পরিধি আরও সংকুচিত করেন। তাঁর মতে কেবল অতি বৃদ্ধ লোকজনকে হত্যা করা অনুচিত। [২০]

আল শাফী (রঃ) একজন অতি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত। তিনি বলেন, *"এরূপ সকল শ্রেণীর লোককে হত্যা করা যায়।"* [২১]

এ বিষয়ের উপর ইবনে রুশদ (এভারোজ) লিখেনঃ *মতপার্থক্যের কারণ হল কিছুসংখ্যক আসাবের (ঐতিহ্যের)-এবং কোরআনে পাক ও রাসূল (সাঃ) এর বক্তব্যের মধ্যকার সাধারণ অর্থের আপাত দৃশ্যমান বৈপরীত্য।*

হত্যার যুক্তি প্রসঙ্গে তাঁদের বিভিন্ন অবস্থানই হল এসব মত পার্থক্যের কারণ। যাঁরা মনে করেন যে হত্যার যুক্তি হল অবিশ্বাস জনিত অবস্থা, তাঁরা হত্যার ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম করেন না। যাঁরা অবিশ্বাসীদেরকে হত্যার যুক্তি হিসাবে যুদ্ধ করার ক্ষমতাকে কারণ হিসাবে গণ্য করেন তারা যুদ্ধ করতে অক্ষম অবিশ্বাসীদেরকে হত্যার আওতা

---

[১৮] Ibn Qudamah, *Al Mughni* (Cairo: Maktabat al 'Asimah, n.d.), খ.৯. পৃ: ১৯৪-১৯৫, এবং ৩১৯-৩২৪, and Wahbah al Zuhayli, *Athar al Harb fi al Fiqh al Islami: Dirasah Muqaranah* (The Effects of War in Islamic Jurisprudence : A Comparative Study) ২য় সং (Damascus: Al Maktabah al Hadithah, 1965), পৃ: ৭১২-৭১৫.

[১৯] Ibn Rushd, *Bidayat al Mujtahid* (Cairo : Maktabah al Khanji, n.d.), খ.১. পৃ: ৩১০-৩১১.

[২০] প্রাগুক্ত

[২১] প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

বহির্ভূত বলে গণ্য করেন। এ মতাবলম্বীগণ যারা শত্রুতায় লিপ্ত নয়, যেমন কৃষক ও চাকর তাদেরকেও হত্যার আওতাবহির্ভূত বলে মনে করেন। অবিশ্বাসী হলেও মহিলাদেরকে হত্যা করার বিষয়ে মহানবী (সঃ) এর নিষেধাজ্ঞার আলোকে এ বিধি যুক্তি যুক্ত। [২২]

জনৈক সমকালীন ইসলামী লেখক এ বিষয়ে একটি অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে বিষয়টি এক বিশেষ ধরনের যুক্তিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট। ঐ রূপ যুক্তিতে একদিকে জুরীগণ ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা অনুমোদন করেন (স্বধর্মত্যাগীদের ক্ষেত্রে) এবং অপরদিকে একই সময় কোন দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন পছন্দকে একটি শর্ত হিসাবে গণ্য করেন। [২৩]

অপর একজন মুসলিম লেখকের মতে যদি কেউ ফিকাহ এর সমস্ত কর্মকে তুলনা করেন তাহলে একজন জুরী যে সমস্ত উপসংহারে উপনীত হবেন সেগুলো অন্য জুরীর মতামতের বিপরীত হতে পারে।

মতপার্থক্য এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাতে পারে যার ফলে একজন জুরীর রায়ে কোন ব্যক্তির জীবন যেখানে বিপন্ন হবে অপর জুরীর রায়ে সে ব্যক্তির জীবন হয়ত রক্ষা পাবে; একজন জুরীর রায়ে যেখানে সম্পদের মালিকানা ন্যায় সংগত হবে অপর জুরীর রায়ে হয়ত সে মালিকানা অস্বীকৃত হবে। একটি সম্পর্ক যেখানে একজনের রায়ে স্বীকৃত হবে অপরের রায়ে হয়ত তা নিষিদ্ধ হবে। [২৪]

সুদূর অতীতে ইবনে আল মুকাফফা এর পর্যবেক্ষণে একই বিষয় ধরা পড়ে। তিনি খলিফা আল মনসুরকে বিচার সম্পর্কিত এরূপ সকল মতামতকে সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ এবং যুক্তি তর্ক সহ একটি পুস্তকে একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করে নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। এরপর খলিফা নির্ধারণ করবেন কোনটিকে অনুমোদন দেয়া যায়। এটা এজন্য প্রয়োজন যেন সকল প্রকার রায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ও যথার্থতা বজায় থাকে। [২৫]

---

২২ প্রাগুক্ত

২৩ 'Abd al Mutaial al Saidi, *Al Huriyah al Duniyah fi al Islam* (Religlous Freedom in Islam) ২য় সং (Cairo : Dar al Fikr al 'Arabi, n.d.), পৃ: ৪৬

২৪ Muhammad Fathi 'Uthman, *Dawlat al Fikrah allati Aqamaha Rasul al Islam 'Aqib al Hijrah: Tajribah Mubakkirah it al Dawlah al Iduyulujuah fi al Tarkh* (The Ideological State Which the Messenger of Islam Established after the Immigration : An Early Attempt for an Ideological State in History) (Kuwait; Al Dar al Kuwaytiyah, 1968), পৃ: ৮৩

২৫ Subhi Mahmasani, *al Awda al Tashriyah fi al Duwal al 'Arabiyah : Madiha wa Hadiruha* (Legal Systems in the Arab States : Past and Present) ৩য় সংশোধিত সংস্করণ (Beirut : Dar al Ilm li al Malayin, 1965), পৃ: ১৫৮-১৫৯.

www.pathagar.com

কথিত আছে যে খলিফা আল মুনসুর রাষ্ট্রের আইন বিষয়ে তাঁর মতামতকে অনুমোদন করার জন্য ইমাম মালিককে (রঃ) তাগিদ দেন। মালিক (রঃ) যদিও সুন্নাহ এবং আইন বিজ্ঞানের উপর *মুয়াত্তা* (অভিগম্য) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন কিন্তু তিনি ঐরূপ অনুমোদন দানের বিষয়ে আপত্তি জানান। [২৬]

মুসলিম জাতির ইতিহাসের সুদীর্ঘকালে দেখা যায় ওলামাগণ শরীয়াহ কোর্টের বিচারক হিসাবে কাজ করেছেন এবং *ফতোয়া* (আইনগত অথবা ধর্মীয় ঘোষণা) প্রদান করেছেন। এক সময় এ সমস্ত আইন বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব আংশিকভাবে ওসমানীয় সুলতানগণ গ্রহণ করেন। তাঁরা আদেশ এবং প্রশাসনিক বিধান জারি করতেন। তারা ওলামাদের অথবা অন্য কাউকে নিয়োগ করতেন। নিয়োগকৃত ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক বিষয়াদি দেখা শুনা করতেন। [২৭]

ফিকাহ্ ম্যানুয়েলের কিছু অংশ ছিল যেগুলো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্নাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সমস্ত অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে *জিহাদ* এবং আনুষাঙ্গিক বিষয় যেমন *জিযিয়া* ও *আল সিয়ার*। এসব হল সত্যিকার অর্থে উচ্চাঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়। এসব বিষয়কে ওলামাগণের মতামতের নিছক প্রয়োগ বা তা মেনে চলার বিষয় হিসাবে ধরে নেওয়া যায় না। ওলামাগণের অবস্থান ছিল তখন ক্ষমতার কেন্দ্র এবং নীতি নির্ধারণ কার্যাবলী থেকে বহুদূরে। [২৮]

সবকিছু একত্রিত করে আমরা বলতে পারি যে, *ফিকাহ* হল সামগ্রিকভাবে ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণ যুগের শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের চিন্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐ সময়টুকু খ্যাত ছিল মহান খেলাফত (High Caliphate) হিসাবে। সাধারণত এ সময়ের পরিধি ৭৫০ হতে ১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐতিহ্য মন্ডিত জীবন পদ্ধতির এটা ছিল এক সুবিন্যস্ত এবং সুসামঞ্জস্য উপাদান। এর দ্বারা বিকশিত ও পরিচালিত হয়েছে একটি সফল সমাজ ও সভ্যতা- সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আইনগত

---

[২৬] Uthman, উদ্ধৃত গ্রন্থ

[২৭] দ্রঃ H. A. R. Gibb, *Studies on the Civilization of Islam,* ed. Stanford J. Shaw and William R. Polk (Boston: Beacon Press, 1962), পৃ: ৭-১৪, ১৪৮-১৪৯, H. A. R. Gibb, "Religion and Politics in Charistianity and Islam in J. Procter, *Islam and International Relations* (New york: Frederick A. Praeger, 1965), পৃ: ১০-১২, S. Mahmasani, *Al Awda al Tashriyah,* পৃ: ১৭৪-১৭৫. Thomas Naff, "The Setting and Rationale of Ottoman Diplomacy in the Reign of Selim III (1789-1807)." পৃ: ৩-৪, গ্রন্থকার কর্তৃক আমাকে এ অপ্রকাশিত পেপারটি দেয়া হয়েছে।

[২৮] দ্রঃ Ibn al Qayyim, *Ahkam Ahl al Dhimmah,* ed. Subhi al Salih (Damascus: Matba at Jamit at Dimashq, 1971), খ.৯. পৃ: ১৭৮ এবং ৩১৯. al Shafi, *Al Umm,* খ. ৪. পৃ: ৮২, ১৫৫, ১৭০, এবং T. Naff, "The Setting of Ottoman Diplomacy." পৃ: ১৭.

www.pathagar.com

প্রয়োজনের নিরিখে। *ফিকাহ* এবং *সিয়ার* হল নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির অংশ বিশেষ। এটাকে এ জন্য বিবেচনা করা উচিৎ ইসলামী আইনের একটি প্রধান উৎস হিসাবে, স্বয়ং ইসলামী আইন হিসাবে নয়।

ফিকাহ এর এ মর্যাদা নির্ণিত হলে এটা ব্যাখ্যা করার জন্য সহায়ক হবে যে, কেন সমকালীন মুসলিমগণ আধুনিক প্রয়োজন এবং চ্যালেঞ্জের আলোকে শরীয়তের স্পিরিট এবং লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে *ফিকাহর* বিষয়াবলীকে পুন পরীক্ষণ নিরীক্ষণ করার প্রয়োজন অনুভব করেন। এ বিষয়টিই হল ইজতিহাদের দরজা পুনঃ উন্মুক্ত করা। আধুনিক মুসলিম আইন প্রণয়নে আলেম সমাজের অবস্থানের ক্ষেত্রে কতগুলো ধারণাগত বিপত্তি নিষ্পত্তির জন্য এ দৃষ্টিভঙ্গি সাহায্য করবে।

মুসলিম জুরীগণের মতামত আইনের আধুনিক ধারণা অনুসারে কখনও আইন বলে স্বীকৃত নয় এবং তা কখনও আইন হিসাবে পরিগণিত ছিলওনা। এগুলো ছিল আইনের উৎস মাত্র। *ফিকাহর* গুরুত্ব এ কারণে ছিল যে এর উৎস হল কুরআন এবং হাদীস। আর কুরআন ও হাদীসের প্রভাব মুসলিম মানসে অপরিমেয়। মুসলমানদের প্রয়োজনের আপেক্ষিকতায় এ মতামতগুলোর অগ্রাধিকার, প্রযোজ্যতা এবং সুবিধার কারণে আইনের উৎস হিসাবে এগুলো গুরুত্ব পেয়েছে।

খিলাফত অথবা ইসলামের সোনালীযুগের সরকারগুলোর প্রশাসন, আইন প্রণয়ন এবং বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী ভালভাবে বর্ণিত ছিল না অথবা এগুলো প্রণালী বদ্ধভাবে আঞ্জামও দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসনামলে এমনকি বিভিন্ন খলিফা ও সুলতানের সরকারে এসব শাখাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কেও ছিল ভিন্নতা। আধুনিক কালে মুসলিম সামাজিক পদ্ধতির কাঠামো এবং সংগঠনের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আরো অধিক কার্যকর এবং যথাযথ সামাজিক পদ্ধতি ও সরকারী কাঠামোর। এ প্রেক্ষিতে আধুনিক মুসলিম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ নতুন অঙ্গীকারের ছায়াতলে সমবেত হতে শুরু করেছে। সে অঙ্গীকার হল ইসলামী আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি। সে অঙ্গীকার হল ইসলামী মুসলিম বিশ্বের জন্য প্রয়োজনের নিরিখে একটি কার্যকর রাজনৈতিক ভিত্তি বিনির্মান এবং সরকারের কার্যাবলিকে উপলব্ধি ও প্রণালীবদ্ধ করণের। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইসলামী লক্ষ্য, মূল্যবোধ এবং আধুনিক প্রয়োজন ও কার্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে সংস্কার সাধন করা না হলে এ লক্ষ্য কিছুতেই অর্জিত হতে পারে না।

এ পরিস্থিতি থেকে চিন্তাধারাকে আরো সম্প্রসারিত করার জন্য কতিপয় অনুমানের সৃষ্টি হয়। আলেম সাম্প্রদায় এবং মুসলিম জুরীগণ আইন প্রণেতার সাথে যোগ দিবেন

www.pathagar.com

এবং তাঁকে প্রভাবিত করবেন, তাঁকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারণা এবং মতামত দিবেন। কিন্তু যেহেতু বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতকে আর আইন বলে বিভ্রান্তিতে জড়ানোর অবকাশ থাকবে না সেহেতু মুসলিম সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এ নিয়ে বিশৃঙ্খলা, মতভেদ এবং অসহিষ্ণুতার মাত্রাও হ্রাস পাবে। সুতরাং সরকারের ঐতিহ্যগত ম্যাকানিজম আরো সহজভাবে কাজ করতে পারবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে *জিহাদ* সংক্রান্ত ইসলামী *ফিকাহ্* এবং *সিয়ার* এর উপর লেখা ইসলামী সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করা হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষয়টির মুসলিম কাঠামো এর গতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে মুসলমানদের ইতিবাচক অংশগ্রহণ কতদূর সম্ভব তা অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব তৎপরবর্তী বিকাশ

সিয়ার এর ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব

মোহাম্মদ ইবনে হাসান আল শাইবানী, মোহাম্মদ ইবনে ইদ্রিছ আল শাফী, আবুল আল হাসান আল মাওয়ারদী, আল গাজ্জালী এবং ইবনে তাইমিয়ার মত খ্যাতনামা মুসলিম জুরী এবং চিন্তাবিদগণের মুসলিম বহিঃসম্পর্ক বিষয়াদি সম্পর্কিত অনেক রচনাবলী আছে। সেগুলোতে ইসলামী সভ্যতা অথবা আদর্শ খেলাফত যুগের অনেক আইনগত মতামত রয়েছে। এগুলো এ অধ্যায়ে আলোচিত সিয়ার এবং জিহাদের ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।

ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম তত্ত্বের প্রকৃতি

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিভাষা হিসাবে থিওরী (তত্ত্ব) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক বিষয়ক ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম তত্ত্বের যে কোন রূপ বিশ্লেষণের জন্য আমাদের দেখা উচিত ওটা কি ধরনের তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব নিয়মাত্মক। মূলত ঐশী উৎস সমূহের (কোরআন এবং সুন্নাহ) উপর এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ তত্ত্ব কতগুলো মূল্যবোধ ও মূল্যমান নির্ধারণ করে। এগুলো থেকে পাওয়া যায় কিভাবে রাজনীতিবিদগণ আচরণ করবেন। বস্তুত পক্ষে মতামতের বিভিন্নতা থাকলেও ফিকাহ রচনাবলী শত্রুমিত্র ও অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে মুসলমানদের মৌলিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি কি তা উপস্থাপন করে। এ দৃষ্টিভঙ্গি- ইসলামিক মিশনের আদর্শিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।[১] এর অর্থ এ নয় যে, মুসলিম শাসকবৃন্দ (খলিফা ও সুলতান) সকল ক্ষেত্রে অবিকল ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এতত্ত্ব স্বীকৃত প্রাধিকারের সুবাদে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি, নীতি এবং কর্মকান্ডের স্বরূপ বিকাশে সুদীর্ঘ কাল যাবত গুরুত্ব পেয়েছে।

ইসলামী রচনাবলীকে মুখ্য অথবা প্রামাণিক অথবা গৌণ তথ্য হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এটা নির্ভর করে কি ধরনের তথ্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে তার উপর। কারণ

---

[১] দেখুন Edward Shils, "The Concept and Foundation of Ideology," *International Encyclopedia of the Social Sciences,* ed. David L. Sills (New york, Free Press, 1968). খ.৭. পৃ: ৬৬-৬৭; and James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff Jr., *Contending Theories of International Relations* (Philadelphia, J.B. Lippincott, 1971), পৃ: ২৫-২৮.

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য ইবনে হিশাম, আল তাবারী এবং আল ওয়াকিদির ফিকাহ, সীরাহ এবং ইতিহাস সংক্রান্ত মৌলিক রচনাগুলো হলো মুখ্য উৎস এবং প্রামাণিক ভান্ডার। ইসলামী চিন্তা, বিশ্বাস এবং আদর্শের জন্য কুরআন এবং সুন্নাহর মৌলিক উপাদানগুলো উৎস এবং প্রামাণিক তথ্য হিসাবে কাজ করে অপরপক্ষে ফিকাহর রচনাবলী এবং অন্যান্য রচনাবলী কাজ করে গৌণ তথ্য হিসাবে। বহিঃসম্পর্কের ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের উপাদানের মূল্যায়নে ফিকাহর রচনাবলী মুখ্য উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হবে। অপর পক্ষে ইসলামী কাঠামোর আলোচনায় (চতুর্থ অধ্যায়) ফিকাহর তথ্যাবলী ব্যবহৃত হবে গৌণ উৎস হিসাবে এবং কোরআন ও সুন্নাহ বিবেচিত হবে মুখ্য উৎস হিসাবে।

মৌলিক সংজ্ঞা সমূহ

আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী জ্ঞানানুশীলন ধারণাগত বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। এর কারণ হলো আইনের উৎস হিসাবে ফিকাহর কার্যক্রমকে চিহ্নিত করার ব্যর্থতা। মুসলিম সামাজিক জীবনে মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণের চিন্তার স্পষ্ট প্রতিফলন ফিকাহ। এ হিসাবে এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য চিহ্নিত করার ব্যর্থতাও এ বিভ্রান্তির কারণ। এভাবে ফিকাহ মুসলিম রাষ্ট্রের সত্যিকার নীতি বিধানের প্রতিনিধিত্ব করেনি। পূর্বে আলোচিত অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের বিশ্লেষণে এটা দেখানো হয়েছে। সমকালীন কিছু লেখক ভুল উপসংহারে উপনীত হয়েছেন। কারণ তাঁরা জুরীগণের চিন্তা-ভাবনা এবং নবী করিম (সঃ) এর উপস্থাপিত সুনির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি।

এ বিষয়টি, জুরীগণ যে সমস্ত মতামত উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর সাধারণীকরণকে অত্যন্ত দুরূহ করে ফেলেছে। যদি কোন রূপ সাধারণীকরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে তা করতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। সুতরাং মহান খেলাফতের চিন্তা ধারার একটি স্বচ্ছ চিত্র লাভ করার এবং কতগুলো ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের সংশোধনের জন্য ঐ সময়কার মুসলিম জুরীগণের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে মৌলিক পরিভাষা এবং সংজ্ঞা সমূহের দিকে আমাদের অবশ্যই একনিষ্ঠ ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে।

জিহাদ; দারুল ইসলাম; দারুল আহাদ; দারুল হারব

এ চারটি হল পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পরিভাষা। এ পরিভাষাগুলো ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম সমাজের বহিঃসম্পর্ক বিষয়ক মুসলিম চিন্তাধারা এবং আইন বিজ্ঞান সম্পর্কীত।

জিহাদ

ইসলামী আদর্শের উন্নয়ন এবং তার আবেদনে পরিপূর্ণতা দানের জন্য মুসলমানদের উপর দায়িত্ব রয়েছে। মুসলমানদেরকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয় প্রচলিত সকল প্রকার

www.pathagar.com

মন্দ কাজ সংশোধনের জন্য, তাদেরকে এটা করতে হবে তাদের কাজ দ্বারা তা সম্ভব না হলে মন্দের বিরুদ্ধে মুখে বলতে হবে। এটা ও সম্ভব না হলে মনে মনে ঘৃণা পোষণ করতে হবে। *জিহাদ* কেবল একটি বাহ্যিক কার্যক্রম নয়। এটা একটা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ও বটে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি তার আত্মশুদ্ধি করে এবং নিজের ভুল সংশোধন করে। এ নীতি থেকে পরিস্কার রূপে বুঝা যায় যে, *জিহাদের* অর্থ কেবল যুদ্ধ-(আক্রমণমূলক বা আত্মরক্ষা মূলক) করা নয়। *জিহাদের* ব্যাখ্যা প্রসংগে জুরীগণ বিভিন্নরূপ অবস্থান গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী আলোচনায় এর উপর আলোকপাত করা হবে।

দারুল ইসলাম

দারুল ইসলাম ঐ সমস্ত এলাকাকে বলা হয় যেখানে মুসলিমগণ স্বাধীন এবং নিরাপদ।[২]

দারুল আহাদ

দারুল আহমদকে দারুল সুলহও বলা হয়। এ নামটি দিয়েছেন শাফী (রঃ)। ইহা দ্বারা তিনি ঐ সমস্ত অমুসলিম ভূ-খন্ডকে বুঝাতে চেয়েছেন যেগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়ে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন বজায় রেখেছে। এ সমস্ত চুক্তির মাধ্যমে ঐ এলাকাগুলোতে বৈধ মুসলিম কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হয়েছে। এর সাথে ঐ এলাকাগুলো করদ রাজ্য হিসাবে মুসলিম রাষ্ট্রকে *'খারাজ'* নামক ভূমিকর প্রদান করে। ঐ কর দ্বারা *জিযিয়া* চুক্তির শর্ত সমূহ পূরণ করা হয়। এ মত শাফী (রঃ) এর।[৩]

দারুল হারব

দারুল হরিব দারুল ইসলামের বিপরীত। এটা অমুসলিম ভূ-খন্ড। দারুল হারব মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন এবং তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য বিপদজনক।

মজিদ খাজুরীর মত কিছু লেখক কতগুলো বিভ্রান্তির জন্য দায়ী। এসব বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে কতিপয় জুরীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে বিশেষভাবে গ্রহণ এবং অন্যদেরগুলোকে অবহেলা করার প্রবণতা থেকে। খাজুরীর মতে *জিহাদের* আদেশ আল্লাহপাক সকল বিশ্বাসীর উপর দিয়েছেন। এ আদেশে মুশরিকদেরকে যেখানে পাওয়া যায় সেখানে হত্যা

---

[২] দেখুন M. Hamidullah, *Muslim Conduct of State*, পৃ: ৮৫, ১২৯-১৩১; এবং W. al Zubayli, *Athar al Harb*, পৃ: ১৯২-১৯৬.

[৩] Ibn al Qayyim, *Ahkam ahl al Dhimmah*, খ. ২. ৪৭৫-৪৯০; এবং al Shafi. *al Umm*, ৭. ৪. পৃ: ১০৩-১০৪.

www.pathagar.com

করার জন্য বলা হয়েছে।

এ বক্তব্য নবী করিম (সঃ) এর "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা"বুদ নাই মুশরিকরা একথা না বলা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকরতে হবেঃ-এ উক্তি থেকে বুঝা যায় বলে তিনি মনে করেন। খাজুরী দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, ইসলামী আইনতত্ত্ব মোতাবেক বিশ্বাসীদের উপর *জিহাদ* একটি স্থায়ী অবশ্য কর্তব্য। এ *জিহাদ* একটি সার্বক্ষণিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক যুদ্ধের মাধ্যমে যদিও চূড়ান্ত সামরিক প্রক্রিয়ায় সম্ভব না হয়। এ প্রক্রিয়া ঐ পর্যন্ত চালু রাখতে হবে যে পর্যন্ত না দারুল হারব এর উপর দারুল ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন ইসলামী আইন কেবল সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য চুক্তির মাধ্যমে শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। "এ সময়ের পরিমাণ দশ বছরের বেশী হবে না।"[৪]

খাজুরীর শেষের বিষয়টি প্রথমে দেখা যাক। এটি হলো শান্তি চুক্তির জন্য দশ বছর সময় কালের ধারণাটি। এতে দেখা যায় এ বিষয়ে তিনি শাফী (রঃ) এর শক্ত অবস্থানের উপর নির্ভর করেছেন।[৫] কিন্তু সমভাবে নির্ভরযোগ্য আবু হানিফা (রঃ) এর মতামতকে অবজ্ঞা করেছেন।

এ বিষয়ের উপর আবু হানিফা (রঃ) এর প্রদত্ত যুক্তিকে ইবনে কুদামাহ্ উদ্ধৃত করেছেন। যেহেতু শান্তি চুক্তি একটি দশ বছর মেয়াদী চুক্তি সুতরাং এটাকে একইভাবে একটি চুক্তি হিসাবে বর্ধিত করা অনুমোদনযোগ্য। এর জন্য কোন সময় সীমার বাধ্য বাধকতা নেই। মুসলিম জীবনের লক্ষ্য যুদ্ধের চেয়ে শান্তির মধ্যে বেশী অর্জিত হয়। সময়ের সীমারেখা দেয়ার অর্থ হচ্ছে এটা বেশী সময়ের জন্য ও প্রয়োগযোগ্য।[৬]

ইবনে কুদামাহ এবং ইবনে রুশ্‌দ ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং ইমাম ইবনে হাম্বল (রঃ) এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, মুসলিম রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রেক্ষিতে শান্তি চুক্তির মেয়াদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য হতে পারে।[৭] জুরীগণের মতামতের বিভিন্নতার ইহা এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ সমস্ত বিষয়ে কোনো একটি মতামতকে ইসলামী আইনের প্রতিনিধিত্বকারী মতামত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়নি।

---

৪ M. Khaddur's Introduction to al Shaybani, *The Islamic Law of Notions*, পৃ: ১৬-১৭.

৫ Al Shafii, উ: গ্রন্থ খ. ৪. পৃ: ১০৯.

৬ Ibn Qudamah, al Mughni, vol. ix, p. 286. এখানে অর্থ হল যে যেহেতু সন্ধি একটি চুক্তি এটা সময়সীমা ব্যতিত বা নবায়নযোগ্য সময়ের ভিত্তিতে করা যায়।

৭ প্রাগুক্ত Ibn Rushd, *Bidayat al Mujtahid*, খ. ১. পৃ: ৩১৩; এবং W. al Zuhayli, *Athar al Harb*, পৃ: ৬৭৫-৬৭৮.

www.pathagar.com

বহুদেববাদ, এ পরিভাষাটির পরিধি বহুদেববাদীদের অস্তিত্বের প্রশ্নে মুসলমানদের অসহনশীলতার প্রেক্ষিতে খাজুরী স্বীকার করেন যে, "বহুদেবত্ববাদ সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় যেন পৌত্তলিকতা এর মধ্যে সীমিত।" কোনো সর্বোচ্চ দেবত্বের ধারণা এর মধ্যে বিদ্যমান নেই।[৮] এ সংজ্ঞার উপর কদাচিত কোন ঐকমতের সন্ধান পাওয়া যায়। আবার ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কুরআন এবং সুন্নাহর মধ্যে উল্লেখিত পরিভাষাটি কেবলমাত্র আরব বহুদেববাদীদের বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করেন। আবার এ পরিভাষাটি কেবল কোরাইশ গোত্রের জন্য প্রযোজ্য বলে ইমাম মালিক মনে করেন বলে উল্লেখ আছে।[৯] আরো একটি মতানুসারে আল আওজাই, আল সাওরী এবং মালিক কুরআন এবং সুন্নাহতে উল্লেখিত এই পরিভাষাটিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেন।[১০] তাঁদের মতে এ পরিভাষাটি এখন আর আরব পৌত্তলিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ অবস্থান জুরীগণের সহনশীলতার মাত্রা কি পরিমাণ ছিল তার উপর আলোকপাত করে। জুরীগণের মতামত মুসলমানদের ঐক্যমত হতে যে অনেক দূরে অবস্থান করতে পারে তার উদাহরণ পাওয়া যায় এ অবস্থা থেকে।

খাজুরীর মতে ইসলামী আইন তত্ত্বে *জিহাদ* ছিল বিশ্বাসীদের উপর, সার্বক্ষণিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিতব্য একটি স্থায়ী অবশ্য করণীয়।[১১] *কুরআন* এবং *সুন্নাহ* হতে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি এ বিষয়টি সমর্থন করেন। কিন্তু প্রেক্ষিত বিবেচনা বর্জিত এরূপ উদ্ধৃতি সহজে পাঠককে ভ্রান্তিতে ফেলতে পারে, এরূপ পাঠককে যিনি এ ইসলামী উৎসগুলোর চূড়ান্ত এবং সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। এসব ভ্রান্তি পাঠকের মনে ঐরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে যে, মুসলিম আইন বিজ্ঞানে *জিহাদ* একটি অবিতর্কিত বিষয়।[১২] এভাবে পাঠককে এমন ধারণায় নিমগ্ন রাখা যায় যে, মুসলিম আইনবিদগণ *জিহাদ* সম্পর্কে ঐকমতে পৌঁছেছেন। আর ঐ ঐক্যমত অনুসারে *জিহাদ* হলো একটি সর্বাত্মক স্থায়ী যুদ্ধ। এ যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামকে মানবজাতির অধিকাংশের উপর চাপিয়ে দেয়া যায়। খাজুরী বলেন, এ বিষয়টিকে, অন্যভাবেও বলা যায়। তিনি মুহাম্মদ (সঃ) এর একটি হাদীসের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। হাদীসটি হলো এই, 'বহুদেববাহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না তারা বলে এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই।"

---

[৮] M. Khaddur, *War and Peace,* পৃ: ৭৪-৭৫.

[৯] Ibn Qudamah, উ: গ্রন্থ খ. ৯. পৃ: ১৯৫.

[১০] প্রাগুক্ত

[১১] M. Khadduri, "Introduction" to al Shaybani, *The Islamic Law of Nations*; পৃ: ১৬; এবং M. Khadduri, *War and peace,* পৃ: ৭৪-৭৫.

[১২] Ibn Rushd, উদ্ধৃগ্রন্থ পৃ: ৩১০-৩১১.

www.pathagar.com

বস্তুতপক্ষে এটা সকল মুসলিম আইনবিদগণের কোন সিদ্ধান্ত নয়। তাঁদের অনেকেই ঐ সমস্ত পৌত্তলিকদেরকে সহ্য করেছেন যারা তাদের বিশ্বাসে অবিচল ছিল। জিয্য়া প্রদানের মাধ্যমে তাদের কেবল নিজেদের জীবন দর্শনের লক্ষ্যাভিমুখী শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের ব্যবস্থাই করা হয়নি বরং মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের নিরাপত্তা বিধানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেমন আবু হানিফা (রঃ) এর মতানুসারে আরব পৌত্তলিক ব্যতীত সকল বহুদেববাদীর জিয্য়া গ্রহণ করা উচিত।[১৩] মালিক (রঃ) এর একটি কথিত মতানুসারে কোরাইশ ব্যতীত সকল বহুবাদীর নিকট থেকে জিয্য়া গ্রহণ করা হয়েছিল। তদুপরি আল আওজ্বাই, আল-সাওরী এবং মালিক এমতের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, জিয্য়া সকল বহুদেববাদীর নিকট হতে আদায়যোগ্য। এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম নেই।[১৪]

ইসলামে যুদ্ধবিরতির সময়কাল এবং বহুদেববাদ সম্পর্কিত খাজুরীর ধারণা এবং বর্ণনা *জিহাদ* এবং ইসলামে নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত তার ধারণা ও বর্ণনা হতে খুব বেশী আলাদা নয়। এটা তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ তিনি মূলত একটি আইনগত মতামত তথা ইমাম শাফী (রাঃ) এর মতামতের উপর নির্ভর করেছেন। আম্মার জিহাদ এবং নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে খাজুরীর উপসংহার যথার্থ হত যদি মুসলিম জুরীগণের মধ্যে মতামতের ঐক্য থাকত। যুদ্ধ বিরতির সময়কাল এবং বহুদেবাদীদের প্রতি সহনশীলতার ক্ষেত্রে যেমন কোন ঐক্যমত নেই, *জিহাদের* প্রকৃতি এবং নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও কোন ঐক্যমত নেই।

পশ্চিমাদের নিকট এভারোস নামে পরিচিত ইবনে রুশদ ইসলামে যুদ্ধ এবং শান্তি সংক্রান্ত বিষয়াবলীর উপর মুসলিম আইনবিধগণের বিভিন্ন মতামতের কিছু অংশের সারসংক্ষেপ করেছেন।

ইমাম যদি মনে করেন, শান্তি স্থাপিত হলে তা মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে যাবে এরূপ অবস্থায় যারা শান্তির পক্ষে অনুমোদন দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কতিপয় আইনবিধ হলেনঃ মালিক (রঃ), আল শাফী (রঃ) এবং আবু হানিফা (রাঃ)। কেবলমাত্র শাফী (রঃ) শান্তি চুক্তির সময়কাল রাসূল (সঃ) অবিশ্বাসীদের সাথে যা করেছেন তার চেয়ে বেশী অনুমোদন করেন না। প্রয়োজন ব্যতিরেকে শান্তির অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মত পার্থক্যের কারণ হল কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে আপাত

---

[১৩] ইমাম আবু হানিফা ছিলেন হানাফী মাজহাবর প্রতিষ্ঠাতা এবং ইমাম আল শাইরানীর শিক্ষক, যিনি সিয়ার বিষয়ক ক্লাসিক গ্রন্থ 'কিতাবুস সিয়ারুল কাবীর' এর রচয়িতা। এই গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রণেতা আল সারাখসী হানাফী মাজহাবের লোক ছিলেন।

[১৪] Ibn Qudamah, উদ্ধৃত গ্রন্থ খ. ৯. পৃ: ১৯৩: এবং W. al Zuhayli, Op. Cit., পৃ: ৭১২-৭১৫.

www.pathagar.com

দৃশ্যমান বৈপরীত্য। "অতপর যখন পবিত্র মাস সমূহ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তখন মূর্তি পূজারীদেরকে যেখানে পাও সেখানে হত্যা কর।" যারা আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।ঃ এবং "যদি তারা শান্তি স্থাপনে প্রবৃত্ত হয় তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।ঃ যাঁরা মনে করেছেন যে যুদ্ধের আয়াত শান্তির আয়াতের রহিতকরণ স্বরূপ, তাঁরা প্রয়োজন ব্যতিরেকে শান্তির অনুমোদন করেননি যদি না ইমাম এর পক্ষে ছিলেন। যাঁরা শান্তির আয়াতকে যুদ্ধের আয়াতের সীমিত করণ রূপে বিবেচনা করেছেন তাঁরা ইমামের অনুকূল মতামত সাপেক্ষে শান্তির স্থাপনের পক্ষে রায় দিয়েছেন।[১৫]

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, আইনবিদগণ অমুসলিমদের সাথে প্রয়োজন ব্যতিরেকেও শান্তি স্থাপনের অনুমোদন করেন। আর এটা অনির্দিষ্ট কালের জন্যও হতে পারে।

শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে আবু হানিফা (রঃ) এর অনুকূল অবস্থান ছাড়াও আল সারাখসি আল সাওরি সহ অপরাপর আইনবিদগণ, যেমন ইবনে উমর, আতা আসার ইবনে দীনার এবং ইবনে শিবরিমা-এর অবস্থান ও বর্ণনা করেন। "পৌত্তলিকরা নিজেদের তরফ হতে যুদ্ধের সূচনা না করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য নয়। সুতরাং আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে।" যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা তাদের কে হত্যা কর। এবং ঐসকল পৌত্তলিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেহেতু তারা তোমাদের সকলের সাথে যুদ্ধ করে।[১৬]

উপসংহারে বলা যায়, ইসলামে নিরপেক্ষতার ধারণা অনুপস্থিত বলে খাজুরীর যে ধারণা হয়েছে সেটা হয়েছে অনেকাংশে *জিহাদ* সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি থেকে।[১৭] যেহেতু *জিহাদ* সম্পর্কে তাঁর ধারণার সাথে সকল আইনবিদ সর্বজনীনভাবে একমত নন সেহেতু নিরপেক্ষতার বিষয় সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ যা *জিহাদের* সাথে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পৃক্ত সার্বজনীন ভাবে গ্রহনযোগ্য নয়।[১৮] তাছাড়া নিরপেক্ষতার পরিবর্তে নিরপেক্ষীকরণ হিসাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সমূহ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সঠিক নাও হতে পারে।

---

[১৫] Ibn Rushd, উ: গ্র: খ. ১. ৩১৩.

[১৬] Ibn Qudamah, উ: গ্র: খ. ৯. পৃ: ২৮৬-২৮৭; al Shaybani, *al Siyar,* খ. ১. পৃ: ১৯০-১৯১; and W. al Zuhayli, উ: গ্র: পৃ: ৮৬-৮৭.

[১৭] M. Khadduri, *War and peace*, পৃ: ২৫১-২৬৭; M. Khadduri's introduction to al Shaybani, *The Islamic Law of Nations*, পৃ: ১৮-১৯.

[১৮] সুফিয়ান সাওরি ও আবু হানিফা বনাম সারাখসী ও শাফীর বিরোধপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য উপরে দেখুন। আরও দ্রঃ M. al Tabari, Jami al Bayan, vol. II, খ. ২. পৃ: ১৮৯-১৯০.

www.pathagar.com

বস্তুতঃ হামদুল্লাহ এবং আল জুহেলী সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। *কুরআন* এবং *সুন্নাহর* গবেষণা হতে তাঁরা একই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ইসলামে নিরপেক্ষতার উদাহরণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।[১৯] উপরোক্ত বর্ণনা থেকে যে শিক্ষা নিতে হবে তাহল এই যে, *কুরআন* এবং *সুন্নাহর* মৌলিক উৎস হতে উদ্ধৃতি প্রদান করা কালীন এবং মুসলিম ক্ল্যাসিক্যাল চিন্তা ধারা সম্পর্কে সাধারণীকরণ করার ক্ষেত্রে যে কোন ব্যক্তিকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। এতে ভুল পরিহার করা সম্ভব হবে। মুসলিম মানসিকতা এবং এর সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে আধুনিক চিন্তাধারা এবং প্রতিষ্ঠানের যে সম্পর্ক বিদ্যমান সে বিষয়েও উন্নতর উপলব্ধি অর্জন করা যাবে।

সত্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দায়িত্ব হল *জিহাদে* অবতীর্ণ হওয়া। *জিহাদের* অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মানবাধিকার সংরক্ষণ। অধিকার হল জীবনের অধিকার বিশ্বাসের, অধিকার, সম্মানের অধিকার, পরিবারের এবং শিক্ষার অধিকার। *জিহাদের* সর্বোচ্চ লক্ষ্য ব্যক্তির নিজের জীবনের পরিবর্তন, যাতে ব্যক্তি এসব অধিকার আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে অর্জনের চেষ্টা করে। এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল অপরের অধিকার সংরক্ষণ করা। এ অর্থে *জিহাদ* হল সকলের জন্য সবসময় সর্বত্র ন্যায় বিচারের প্রচেষ্টা চালানো। আর ন্যায় বিচারের মূল কথা হল মানবাধিকার।

এ পর্যায়ে ধারণাগত দিক দিয়ে বলা যায় যে, আমাদের জন্য এটা উপলব্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ঐতিহাসিকভাবে প্রভাবশীল ছিল না, নিছক এ অজুহাতে সময়ের দাবী সত্ত্বেও ইসলামে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না। যে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উত্থান হয় একটি মতবাদ এবং তার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে। হতে পারে, কোন সময় একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের জন্মলাভের প্রয়োজন হয়নি বা এর বাস্তব রূপ লাভ করার সম্ভাবনাও ছিল না। তাই বলে এটাকে উদাহরণ হিসাবে টেনে এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয় যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলেও ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

আল আহদ এবং আল আমান

আরবী ভাষায় সাধারণভাবে কতিপয় শব্দ চুক্তি বা সন্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন *আহদ* (প্লেজ) *হুদনাহ* অথবা মুওয়াদাহে (ট্রুস, যুদ্ধ বিরতি) *মুআহাদাহ* (আনুষ্ঠানিক চুক্তি, ট্রিটি), মিসাক (চুক্তিপত্র, প্যাক্ট), *সুলহ্* (শান্তি চুক্তি, পীস ট্রিটি) এবং হিলফ (মৈত্রি বন্ধন, এলায়্যান্স) ইত্যাদি।[২০]

---

[১৯] M. Hamidullah, উ: গ্র: পৃ: ২৮৫-৩০০; এবং W. al zuhayli, উ: গ্র: পৃ: ১৯৭-২২০.

[২০] Ibn Qayyim al Jawziyah, *Ahkam ahl al Dhimmah,* খ. ২. পৃ: ৪৭৫; Ibn Qudamah, উ: গ্রন্থ খ. ৯. পৃ: ২৮৪-২৯২; al Shafi, *al Umm*, খ. ৪ পৃ: ১০৯-১১৪.

www.pathagar.com

আইনের দৃষ্টিকোণে থেকে বলতে গেলে *আহদ* হলো আইনানুগ বিষয়াবলীর প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক চুক্তির শর্তাবলী পুরো করার বাধ্যবাধকতা। জুরীগণ দুটি কারণে *আহদ* ভঙ্গ করার পরামর্শ প্রদান করেন। এক, যদি চুক্তি ভঙ্গ হয় এবং অপর পক্ষ কর্তৃক এককভাবে চুক্তি অস্বীকার করা হয় এবং oblique অথবা চুক্তির শর্তাবলী আল *শার*-(আইনানুগ ষ্টান্ডার্ড) লংঘিত হয়েছে বলে জানা যায়। চুক্তির বিষয়াবলী এবং সংশ্লিষ্ট জুরী মতবাদ আলোচ্য *আহদ* আইনানুগ কি বেআইনী তা নির্ণয় করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যদি কোন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ দশ বছরের অধিক সময়ের জন্য যুদ্ধ বিরতি চুক্তি অতিবাহিত করে তবে এর আইনানুগতা সম্পর্কে কোন স্বয়ংক্রিয় রায় কার্যকর হবে না। শাফী মতবাদ দশ বছরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য এটাকে অপ্রযোজ্য বলবে। পক্ষান্তরে অন্যেরা যেমন হানাফী জুরীগণ শাফী মতের সাথে এ বিষয়ে একমত হবেন না। মুসলিম পক্ষ হতে চুক্তির অস্বীকৃতি ঘোষণার কাজকে বলা হয় নাবদ (Nabdh)। অপর পক্ষ *আহদ* ভঙ্গ করবে নিছক এ সন্দেহবশে মুসলিম পক্ষ হতে একতরফাভাবে *আহদ* এর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকে মুসলিম জুরীগণ সমর্থন করেন না। এরূপ কাজ করতে হলে তা করতে হবে সত্যিকার অর্থে সুস্পষ্ট চুক্তি ভঙ্গের তথ্যের উপর ভিত্তি করে। হানাফী মাযহাব ব্যতীত অপরাপর মুসলিম জুরীগণ মুসলিম পক্ষ কর্তৃক কোন আইনানুগ চুক্তি ভঙ্গের পদক্ষেপ নেওয়াকে সমর্থন করেন না। যদি অপর পক্ষ চুক্তির ধারণা সম্পর্কে জেনে বা না জেনে চুক্তি ভঙ্গ করে তবে মুসলিম পক্ষ অবশ্যই অপর পক্ষকে মুসলিম পক্ষ কর্তৃক চুক্তি বাতিলের বিষয় অবহিত করতে হবে, ব্যতিক্রম হবে যদি অপর পক্ষ মুসলিম পক্ষকে প্রথমে আক্রমণ করে।[২১]

জিহাদকে ইসলাম প্রচারের একটি মাধ্যম মনে করার কারণে কোন কোন হানাফী রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে বিরাজমান পরিস্থিতি মুসলিম পক্ষের অনুকূলে আসলে একতরফা ভাবে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি বাতিল করার জন্য পরামর্শ দিবেন। যেহেতু তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ইসলামের স্বার্থ রক্ষিত হয় জিহাদের মাধ্যমে। ঈমানের দাবী হল যখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় তখন একতরফা ভাবে যুদ্ধ বিরতি (yanbudh ilayhim) বাতিল করা। অপরাপর জুরীগণ অবশ্য এর এ ব্যাখ্যার সাথে একমত পোষণ করেন না। কারণ এটা একটা চুক্তি ভঙ্গের নামান্তর। তাঁদের নিকট মুসলিম স্বার্থ বিবেচনা করতে হবে চুক্তি সম্পাদনের সময়, এর পরে নয়।[২২] *আহদ* একটা গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক মাধ্যম। বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক যেমন শান্তিচুক্তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য

---

[২১] দেখুন Fakhr al Din al Razi, *al Tafsu al Kabir* (Cairo: 'Abd al Rahman Muhammad, 1938), খ. ১৫. পৃ: ১৮২-১৮৩; al Shafi, উ: গ্র: ৪ পৃ: ১০৭-১০৯; al Shaybani, উ: গ্র: খ. পৃ: ১৯০-১৯১; M. al Tabari, *Jami al Bayan an Tawil Ay al Quran* (Cairo: Mustafa al Babi, 1945), খ. ১০. পৃ: ২৬-২৭.

[২২] al Shafi, উ: গ্র: খ ৪ পৃ: ১০৭; al Sarakhsi, *Sharh al Siyar*, পৃ: ১৮৭-১৯১; W. al Zuhayli, পৃ: ৩৫৮-৩৬২.

www.pathagar.com

জুরীগণ এটি ব্যবহার করেছেন এবং এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। *আমান* (নিরাপদ আচরণ অথবা নিরাপত্তা চুক্তি এবং *জিম্মাহ* (অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে শাসন আন্ত্রিক চুক্তি) সহ *আহদও* ব্যবহৃত হত অমুসলিম জনসাধারণ এবং অঞ্চলের সাথে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক যোগাযোগের সুবিধার্থে এবং ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে।

আল আমান

অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ বিরতি, শান্তি এবং শাসনতান্ত্রিক চুক্তির রাজনৈতিক বিষয়াদি ন্যাস্ত ছিল রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের উপর। অপর পক্ষে পেশা, অর্থনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি ব্যক্তিগতভাবে *আমান* এর মাধ্যমে মুসলিম নর নারীকে দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ জুরীর মতে এটা প্রত্যেক বয়স্ক মুসলিমের অধিকার।[২৩]

আর্থিক স্বার্থ, সামাজিক অনুশীলন এবং ফৌজদারী অপরাধর ক্ষেত্রে মুসলিম জনপদে বসবাসকারী অমুসলিমদেরকে আনুকুল্য প্রদর্শনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় জুরীগণের মধ্যে। হাম্বলী মাযহাব ছিল এর ব্যতিক্রম।[২৪] তারা চাইতেন যে আমান এর আওতাধীন চুক্তি অনুসারে যখন কোন অমুসলিম মুসলিম ভূ-খন্ডে প্রবেশ করে তখন মুসলিগণকে তাদের সাথে আচার আচরণে হতে হবে স্বচ্ছ এবং নৈতিক মান সম্পন্ন। 'আমান' এর মাধ্যমে মুসলিম এবং অমুসলিম ভূখন্ডের মধ্যে যোগাযোগ এবং বিনিময়কে অত্যন্ত সহজ করা হয়েছিল।

আল মুশরিকুন, আল জিম্মা এবং আল জিযয়া

মুশরিকুন শব্দটি এসেছে শিরক শব্দ থেকে। এর শাব্দিক অর্থ অংশীদার করা। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হল আল্লাহর সাথে অংশীদার করা। কোরআন এবং সুন্নাহর অনেক জায়গায় এ শব্দটিকে আল্লাহর ঐশী ক্ষমতার সাথে অন্যকে সহযোগী এবং অংশীদার করা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এ আলোচনায় মুশরিকগণের বিভিন্ন দল উপদলের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ সংক্রান্ত আয়াত এবং ঐতিহ্যসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুশরিক কারা এবং কে কোন শ্রেণীভুক্ত এই প্রকারের জটিল বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করার, উদ্যোগের ক্ষেত্রে জুরীগণ সুস্পষ্টরূপে বিভক্ত ছিলেন। তত্ত্বগত দিক দিয়ে তাঁদের পার্থক্য ছিল খুবই গভীর। ক্ল্যাসিক্যাল আইনবিজ্ঞানে তত্ত্বগত

---

[২৩] দেখুন Ibn Qudamah, উ: গ্র: খ. ৯. পৃ: ২২৬-২৩৩,২৮৪, ৩১২-৩১৩; Malik, bi riwayat) Sahnun, *al Mudawwanah al Kubra* (Cairo: Matba at al sa adah, 1965) খ. ২. পৃ: ৪১-৪২; M. Khadduri's introductionto *The Islamic Law of Nations,* খ. ৫৩; al Shafi i, উ: গ্র: পৃ: ১৪৫-১৪৬, ১৯৬-১৯৭; al Shaybani, উ: গ্র: খ. ১. পৃ: ৩০৬; W. al Zuhayli, উ: গ্র: পৃ: ২২০-৩৩৪.

[২৪] M. Khadduri, উ: গ্র: পৃ: ১৭০-১৭৪; Ibn Rushd. উ: গ্র: খ. ১. পৃ: ৩০৮-৩০৯; al Shafi, উ: গ্র: খ. ১. পৃ: ১৯৬-১৯৭, ২৯০-২৯১, ৩২৫-৩২৬.

www.pathagar.com

বিশ্লেষণে ঐটি ছিল। মুশরিকুন পরিভাষাটি দ্বারা সংক্ষেপে কি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে উপলব্ধির অভাব ছিল। ফলে এই পরিভাষাটির বিভিন্নরূপ সংজ্ঞা ধারণাগত ব্যাপারে মত পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে।

জুরীগণ মুশরিকদেরকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। আহ্‌লে কিতাব এবং পৌত্তলিক। বিভিন্ন জুরীর মতানুসারে প্রত্যেক শ্রেণীতেই কিছু অমুসলিম আছে অথবা নাই। সকল ক্ষেত্রেই আহ্‌লে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে ইহুদী এবং খৃষ্টান। কোন বিশেষ দল ইহুদী কি খৃষ্টান- এ নিয়ে কিছু সংখ্যক জুরী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[২৫]

ম্যাজিয়ানগণ (জোরোসট্রিয়ান) *আহ্‌লে কিতাব* হিসাবে বিবেচিত ছিল। এটা হয়েছে দুটি ধারণার যেকোন একটির ভিত্তিতে। ধারণা দুটির একটি হল এই যে, তাদের অবতীর্ণ কিতাব ছিল। অপরটি হল এটা নবী করিম (সঃ) এর সুন্নাত যে, আহ্‌লে কিতাবদের মত বিধায় তাদেরকে আহ্‌লে কিতাবদের মত বিবেচনা করতে হবে। আহ্‌লে কিতাবগণকে জিয্‌য়া প্রদানের বিনিময়ে বিশ্বাসের স্বাধীনতা মঞ্জুর করা হয়েছিল। ক্লাসিক্যাল আইন বিজ্ঞানের বিভিন্ন মতানুসারে মুশরিকুন পরিষাভাটি আহ্‌লে কিতাব ব্যতীত সকল অমুসলিমদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিস্তৃত করা যায়। অথবা আরব পৌত্তলিক অথবা কেবলমাত্র কোরাইশদের আরব গোত্রকে বুঝাবার মধ্যে সীমিত রাখা যায়। পৌত্তলিকদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে-এ বিষয়ে জুরীগণেরও মত পার্থক্য ছিল। কেউ কেউ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের বিকল্প কোন স্বাধীনতা না দেয়ার পক্ষপাতী। তাদের মতে এটা অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। অন্যদের মতে তাদেরকে আহ্‌লে কিতাব হিসাবে বিবেচনা করে তাদের নিকট হতে জিয্‌য়া গ্রহণ করা যায়।

মুশরিকদের কতিপয় দলকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার ব্যবস্থা ছিল এবং স্বধর্ম ত্যাগের কারণে ব্যবস্থা ছিল শাস্তি প্রয়োগের। বিষয়টি সঠিক ভাবে বোধগম্য না হলে তা অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কের অনিবার্য অবনতি ঘটাত। রহিত করণের পদ্ধতি বিজ্ঞান, মৌলিক ধারণার সাথে সম্পৃক্ত পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াতকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে কিছু সংখ্যক জুরীকে সক্ষম করেছিল। আধুনিক ব্যাখ্যা কারীগণ এই সমস্ত আয়াত এবং ধারণাকে অবশ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সক্রিয় করে তুলবার জন্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা স্বধর্ম ত্যাগ এবং শাস্তির বিষয়টি পুনঃপ্রবর্তন করেছেন। কিন্তু এতে সামঞ্জস্যতার অভাব ছিল। অভাব ছিল পদ্ধতিগত বিন্যাসকরণের। এজন্য পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত এ বিষয়গুলোর সমন্বিত ধারণাগত বিবেচনা উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন।

---

[২৫] Ibn Qudamah, উ: গ্র. খ. ১. পৃ: ১৯৪-১৯৫.

www.pathagar.com

ক্ল্যাসিক্যাল আইন বিজ্ঞানে এ শব্দটির দ্বারা বুঝায় মুসলিম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ এবং অমুসলিম প্রজাবৃন্দের মধ্যকার একটি স্থায়ী চুক্তি। এ চুক্তি মুসলিমদের নিরাপত্তা বিধান এবং অমুসলিম প্রজাবৃন্দের সাথে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক সংরক্ষণ করেছিল। শেষোক্ত পক্ষ ইসলামী শাসন গ্রহণ করে জিয়্যা প্রদান করেছিল সেনাবাহিনীতে যাওয়ার বিকল্প হিসেবে। মুসলিম জুরীগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন যে, মুসলিম রাষ্ট্র কেবল অমুসলিমদের বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং নিয়মকানুনের প্রতিই সহনশীল ছিলেন না বরং তাদের জীবন ও সম্পদের সংরক্ষণের জন্যও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্বশীল ছিলেনঃ তাদের রক্ত আমাদের রক্তের ন্যায়ই এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতই।"[২৬]

সাধারণভাবে বলা যায় ধর্মীয় ব্যাপারে যে কোন বাধ্য বাধকতা ছিল না, তা সুস্পষ্ট কিছু সংখ্যক জুরীর মতে *জিহাদ* মুসলিমদের জন্য একটি স্থায়ী কর্তব্য। তাঁরা মনে করেন *আল জিম্মাহ* অমুসলিমদের নিকট পৌছুতে মুসলিমদেরকে সক্ষম করেছে। ইসলামের সামাজিক ন্যায়বিচার এবং এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলে অমুসলিম সম্প্রদায় ইসলামকে বিচার করতে সক্ষম হবে। অবশ্য যারা তাদের বিশ্বাসে অবিচল থাকার জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিল তাঁদের পক্ষেই তা করা সম্ভব ছিল।

জিহাদ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক জুরীর ধারণাগত বিভ্রান্তি ছিল।-এ বিভ্রান্তি তাদেরকে আল জিম্মাহ এবং আল *জিয়য়ার* অর্থ ও তাৎপর্যের ব্যাপারেও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করে। ইবন কাইয়িম আল জাওযিয়াহ (১২৯১-১৩৫১ খৃঃ) একটি বিষয়ে অভিন্ন মত পোষণ করেন, তা হল এই যে, যেহেতু *আল জিম্মাহ* চুক্তি মোতাবেক অমুসলিমদেরকে জিয়্যা প্রদান করতে হয় সেহেতু এ চুক্তিগুলোর অর্থ ছিল অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দেয়া। এ মত মুসলিম এবং অন্যান্যদের মধ্যে বিদ্যমান তিক্ত সম্পর্কের প্রতিফলন করেছিল।

ইবন কাইয়িমের অবদান প্রথমত তিনটি বিষয়কে ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করা যায়। এক, মুসলিম ভূ-খন্ডের অভ্যন্তরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুঞ্জিভূত সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাজমান উত্তেজনার প্রভাব।[২৭] দুই, মঙ্গল এবং ধর্মযোদ্ধাদের আক্রমণের প্রভাব। তিন, ইসলামের তাত্ত্বিক ভিত্তিগুলো উপলব্ধির ক্ষেত্রে সাধারণ বিভ্রান্তি।

---

[২৬] Ibn Qudamah, উ: গ্র: খ. ৯. ২৭১-২৭২; Muhammad ibn Ismail Suhul al Salam; *Sharh Bulugh al Maram* (Cairo: al Matbah al Tijariyah al Kubra, n.d.) খ. ৪. পৃ: ৬৫.

[২৭] Subbi al Salih, editorial introduction to the work of Ibn al Qayyim, Ahkam Ahl *al Dhimmah,* খ. ১. পৃ: ৮-৯; ১৭; Ibn al Qayyim, উ: গ্র: খ. ১. পৃ: ২৩-২৫; M. Khadduri, *War and Peace,* পৃ: ১৭৬-১৭৭; Ibn Rushd, উ: গ্র: খ. ১. পৃ: ৩২৮; Ibn Qudamah, উ: গ্র. খ. ৯ পৃ: ২৮৫-২৮৯; al Shafi'i, উ: গ্র: খ. ৪. পৃ: ১১০-১১২.

www.pathagar.com

ইসলামের অপরাপর উপাদানের চেয়ে মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব এবং শত্রুতার দ্বারাই জুরীগণ মুসলিমদের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস উপলব্ধির ক্ষেত্রে বেশী প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়। সুতরাং ইসলামিক মিশনের তাৎপর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক উপাদানই তাঁরা বিবেচনা করেননি। যেমন মুসলিম এবং অমুসলিমদের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে জুরীগণ সাগীর (Saghir) শব্দটির উপর অবাঞ্ছিত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সাগীর শব্দের অর্থ হল পরাজিত বা পরাভূত করা। এ পরিভাষাটি পবিত্র কুরআনে মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে শত্রুতার প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হয়েছে। একই সময় জুরীগণ নবী করিম (সঃ) এবং নাজরানের খৃষ্টানদের মধ্যকার জিম্মাহ চুক্তির তাৎপর্যকে উপেক্ষা করেছেন। তাঁরা নবী করিম (সঃ) এবং মদিনায় ইহুদীগোত্রগুলোর মধ্যকার শাসনতান্ত্রিক চুক্তির (সহিফাতুল মদিনা) তাৎপর্য মদীনাসনদ বিবেচনায় আনয়ন করেননি। মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের সম্পর্কের বিষয়াদির চিত্রাংকনে কেবল সাগীরুন পরিভাষা নয় বরং এসব চুক্তিগুলোর প্রতিফলন হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।[২৮]

মুসলিম সমাজের রূপ সংক্রান্ত একটি সামগ্রিক তাত্ত্বিক ধারণা গঠনের এ শূন্যতাই ইবনুল কাইয়িম এর মতামতে দৃষ্টান্ত হিসাবে পাওয়া যায়। ক্ল্যাসিক্যাল জুরীগণ এ ভুলটি করেছিলেন। এর কারণ হল তাঁরা ইসলামকে সুন্নাহর মাধ্যমে আংশিক ও বর্ণনামূলকভাবে অধ্যয়ন করেছেন। এবং ফলশ্রুতিতে তাঁদের কল্পনা ইসলামের সামাজিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে-ম্যাক্রো এর পরিবর্তে মাইক্রো বৃত্তে ঘুরপাক খেয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়টির উপর আরও আলোকপাত করা হবে।

জিয্য়া

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল, জিয্য়া জিম্মাহ চুক্তির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ অর্থে জিম্মাহ অমুসলিমদের উপর আরোপিত এক প্রকার কর। এ কর রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়। অবশ্য জিয্য়া শব্দটি আহলে জিম্মাহদের উপর আরোপিত নিছক কর নয়। এর অর্থ কর এর চেয়ে আরও ব্যাপক। *মুওয়াদাআহ* (সাময়িক যুদ্ধবিরতি) যুদ্ধ থামানোর জন্য জিয্য়া প্রদান করা যেত। ইহা প্রদানের মাধ্যমে শত্রুপক্ষ যে দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করতে গভীর ভাবে আগ্রহী, তার ইঙ্গিত পাওয়া যেত। এই জন্য এক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধান বা মুসলিম আইন সম্প্রসারণের প্রয়োজন ছিল না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জিয্য়া হল শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এক প্রকার প্রদেয় অর্থ। *আহদ* এর ক্ষেত্রে যেখানে মুসলিম জুরীসপ্রুডেন্স এর সম্প্রসারণ প্রয়োজন কিন্তু নিরাপত্তা বিধানের তেমন প্রয়োজন নাই, সেক্ষেত্রে জিয্য়া হল ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট দেনা এবং একে বলা হয় *খারাজ*।[২৯]

---

২৮ দ্রঃ Ibn al Qayyim, উ: গ্র: খ. ২. পৃ: ২২-২৫; al Shafi, *al Umm*, খ. ৪. পৃ: ৯৭-৯৯.

২৯ al Farra; *al Ahkam al Sultan'yah*, ed. by M. H. al Fiqi (Catro: Mustafa al Babi, ১৯৬৬), পৃ: ১৫৩-২০৯; al Shafi i, উ: গ্র: খ. ৪. পৃ: ১০৩-১০৪.

www.pathagar.com

এ অধ্যায়ের প্রথম দিকে জিয্য়ার অনেক দিক আলোচিত হয়েছে। এখন জিয্য়ার পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। নবী করিম (সঃ) এর অনুসৃত কার্যক্রমকে দিক নির্দেশনা হিসাবে গ্রহণ করে কিছু সংখ্যক জুরী সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পরিমাণ কি হতে পারে তা নির্ধারণ করে দেয়ার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। কিছু সংখ্যক কেবলমাত্র সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। বাদ বাকী জুরীগণ পরিমাণের বিষয়টি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করেছেন।[৩০]

যারা সক্ষম, জিয্য়া কেবল তাদের নিকট হতেই আদায় করা হত। গরীব, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, দরবেশ, অন্ধ ইত্যাদি জিয্য়া প্রদানে বাধ্য ছিল না। যাকাত (যে টেকস গরীব ব্যতীত সকল মুসলিমের নিকট হতে আদায় করা হত) বিশেষ বিশেষ খাতে ব্যয় করা হত। কিন্তু জিয্য়ার ক্ষেত্রে তা করা হত না। এর ব্যয়ের বিষয়টি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল। তারা ঠিক করে দিতেন এটা কিভাবে ব্যয় করতে হবে।[৩১] কিছু শাসক ইসলাম গ্রহণ কারীদের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। তাঁদের অনেকের নিকট নতুন লোকের ইসলাম গ্রহণের অর্থ সরকারী তহবিলে আগত রাজস্বের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নয়, এক্ষেত্রে তাঁদের উদাসীনতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এ অবস্থায় কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। প্রশ্নগুলো হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের প্রকৃতি সম্পর্কে। মুসলিমদের বহিঃসম্পর্কে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাম্যের ধারণা আছে কিনা সেটিও এ প্রশ্নগুলোর অন্তর্গত। কতিপয় লেখক এ প্রশ্নগুলোর বিশ্লেষনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং তাড়াহুড়ার পরিচয় দিয়েছেন। এটা দাবী করা হয়, ইসলামী আইন ব্যক্তিগত, সীমানাগত নয়। এদিক থেকে এ আইন আধুনিক পাশ্চাত্য আইনের অনুরূপ নয়। এটাও বলা হয় যে, সার্বভৌম জাতিসমূহের মধ্যে সাম্যের ধারণা আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি প্রধান ভিত্তি ইসলামী তত্ত্ব এবং আন্তর্জাতিক আইনে এ ব্যবস্থা নেই। এবং মধ্য যুগীয় খৃষ্টাব্দে এ ধারণা বিদ্যমান নেই।

বিভিন্ন দিক থেকে এ ধারণা বিভ্রান্তিকর এবং নিয়ম বহির্ভূত। এটা আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিপূর্ণ হতে পারে যদি সত্যিকার অর্থে বিরাজিত ঐতিহাসিক সম্পর্ককে কিছু প্রাচীন বিচার বিভাগীয় মতামত অথবা পবিত্র কুরআন এবং হাদীস হতে কিছু সংখ্যক উদ্ধৃতিকে মিশিয়ে ফেলা যুক্তিপূর্ণ হয়। এ ধরনের একটি প্রক্রিয়া কোন লেখককে তিনি যা প্রমাণ করতে চান সেরূপ একটি কাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বে পৌঁছে দিতে পারতো। এ অবস্থা

---

৩০ Ibn Rushd, উ: গ্র: খ. ১. পৃ: ৩২৭.

৩১ প্রাগুক্ত খ. ১. পৃ: ৩২৬-৩২৭, ৩২৯.

www.pathagar.com

থেকে লেখকদের মধ্যে বিশেষ করে বিভিন্ন আদর্শ ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী লেখকদের মধ্যে বিরাজমান স্থায়ী অনৈক্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এভাবেই ইসলামকে কতগুলো সেকেলে এবং গোড়া ঐতিহ্যের সমাহার হিসাবে অবলোকন করতে সহজ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মুসলিম আইন প্রসংগে একটা বিষয় বুঝা যায়। তা হল, আদর্শ খিলাফত যুগের মুসলিম চিন্তানায়কগণ বহিঃসম্পর্ক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি জটিল পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। *জিম্মাহ, দারুল ইসলাম, দারুল হারব* এবং *দারুল আহাদ* সম্পর্কীত মুসলিম চিন্তাধারার গভীর বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই যে সীমানা সম্পর্কীত এবং ব্যক্তিগত আইনে মুসলিম ধারণা সমূহের পাশাপাশি সক্রিয় অবস্থানের ফলে ব্যবস্থাপনার এমন একটি তাত্ত্বিক পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে যেটি ছিল মূলতঃ সরকার কাঠামোতে বহুজাতিক শাসনের এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের একটি শাসনতান্ত্রিক বা আনুষ্ঠানিক চুক্তি নামা। সীমানা সংক্রান্ত এবং ব্যক্তিগত আইনের এসব মুসলিম ধারণা সমন্বিত হয়ে অমুসলিম সম্প্রদায়গুলোকে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রজা হিসাবে তাদের ধর্মীয় এবং ব্যক্তিগত বিষয়াদি পরিচালনায় স্বায়ত্ব শাসনের সুযোগ দিয়েছিল।

সরকারী আইন অথবা আইনের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে শরিয়াতের বিধান প্রয়োগযোগ্য ছিল। মুসলিম রাষ্ট্রের মদীনা সময়কালের প্রথমদিকে নবী করিম (সাঃ) এবং ইহুদী গোত্রসমুহের মধ্যকার সমঝতায় এব্যবস্থা ছিল। নাজরানের খৃষ্টানদের সাথে প্রচলিত সমঝতা (প্রায় ১০ হিজরী/৬৩১ খ্রীঃ) নবী করিম (সঃ) এর মৃত্য পর্যন্ত কার্যকর ছিল। জনগণকে এমনকি নিজস্ব সরকার এবং সীমানাগত স্বায়ত্ব শাসনেরও সুযোগ দিয়েছিল। এ নাজরানের অমুসলিম প্রশাসনে বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব বিষয়াদির পরিচালনায় শরিয়ার অনুসরণের জন্য মুসলিম জুরীগণ একইরূপ ধারণায় পরিচালিত হয়ে নির্দেশ দিতেন। জুরীগণ মুসলমানদেরকে একই সাথে এ নির্দেশও দিতেন যে, তারা যেন তাদের দেশের প্রচলিত আইন এবং অনুসরণীয় প্রথা পদ্ধতি ভঙ্গ না করেন। বস্তুতপক্ষে এ প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত মানবিক ও ব্যক্তিগত উপাদান সংশ্লিষ্ট সেগুলো সংরক্ষণের জন্য জুরীগণ ব্যবস্থা করে দিচ্ছিলেন। মুসলিম অঞ্চলে শূকর লালন-পালন এবং শূকরের মাংস খেলে মসলিম জুরীগণ কিছু মনে করতেন না। কিন্তু যে সমস্ত চুক্তি সামাজিক ন্যায় বিচারের পরিপন্থী, যেমন সুদের ব্যবসা সেগুলোর ব্যাপারে জুরীগণ বাধা দিতেন।

মুসলমানদেরকে যেমন অমুসলিম জন আইন ভঙ্গ করতে দেয়া হতো না তেমনি জোর করে মুসলিমদেরকে তাদের ইসলামী ব্যক্তিগত আইন ভঙ্গ করার জন্য জবরদস্তি

www.pathagar.com

করা হলে তাকেও কঠোর ভাবে বাধা দেয়া হতো। জন আইনের (Public law) ক্ষেত্রে শরিয়তের অনুমোদন নেই এমন কার্যকলাপে স্বেচ্ছায় নিয়োজিত অথবা জোর পূর্বক নিয়োজিত হলে মুসলমানদেরকে বাধা দেয়া হতো। যাই হোক বিদেশী কর্তৃপক্ষকে মনকষ্ট না দিয়ে যতদূর সম্ভব নিজেদের আইন পালন করার জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দিতেন। মূলতঃ এ ধরনের ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে বিষয়াদিকে ব্যক্তিগত এবং আঞ্চলিক- এ দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে না। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অনিবার্য প্রয়োজন হলো ব্যক্তিগত আইনের ধারণাকে তার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া যাতে করে প্রজা সাধারণের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনগুলো পূরণ হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত প্রজা সাধারণের জন্য এটা বেশী প্রয়োজন।

সমতা একটি আরো কঠিন সমস্যা। এক্ষেত্রে কিছু ভুল ধারণার নিরসন কল্পে আমরা ক্রমান্বয়ে যুক্তির অবতারণা করবো। আদর্শ খেলাফতকালের ইতিহাসটা অনুধাবন করলে বুঝা যায় ঐ সময়ে বিরাজিত সম্পর্ক কেবল এককভাবে মুসলমানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। কারণ, ঐ সময়ে সকল বহিঃসম্পর্কের বিষয়ে একাধিক স্বার্বভৌম রাষ্ট্র জড়িত ছিল। আর প্রায় রাষ্ট্রই ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। তথাপি মনে হয় জিহাদের "Hawkish" ব্যাখ্যা আদর্শযুগে বিরাজমান সম্পর্কের আনয়নে সামান্য ভূমিকা রেখেছিল।[৩২]

এর পাশাপাশি আদর্শ খেলাফত যুগে মুসলিম চিন্তাধারায় কিছু নমনীয় প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রবণতাগুলো জাতিসমূহের মধ্যে সমতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তনে একটি উপযুক্ত কাঠামো হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। আবু হানিফা (রঃ) এবং আল সাহ্‌রী (Jhauiri) এর মত আইনজ্ঞগণ প্রদত্ত জিহাদের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা এরূপ প্রবণতার দৃষ্টান্ত। এসব আইনাবিদগণ জিহাদকে যেভাবে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আইনের উন্নয়নের জন্য একটি সঠিক তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। এ ভিত্তি জাতিসমূহের মধ্যকার সম্পর্ককে শান্তি ও সমতার আলোকে ব্যাখ্যা করে। এ চিন্তাধারা একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম মতবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট। বৃহৎ

---

[৩২] জিহাদ বিষয়ে ফুরীগণের মতপার্থক্য নিম্নোক্ত উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্ট হয়

১ "অমুসলিমগণ যুদ্ধ শুরু না করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক নয়; (যদি তারা যুদ্ধ শুরু করে) তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক ..." আল শাইবানি, আল সিয়ার, য. ১, পৃ. ১৮৭; ২. "যদি মুসলিমদের যথেষ্ট শক্তি থাকে, তাহলে আমি উপদেশ দেবযেন এমন একটি বছর অতিবাহিত না হয় যাতে ইমাম অমুসলিম ভূ-খন্ডে কোনো সেনাদল প্রেরণ করেননি বা আক্রমণ করেননি, (অবশ্য) মুসলিমদের ক্ষতি না করে ... এবং সর্বনিম্ন অনুমোদিত সময় হল যে (অমুসলিম ভূ-খন্ডে) অভিযান চালানো ছাড়া যেন এক বছর অতিক্রম না করে, এটা এজন্য যে গুরুতর অজুহাত ছাড়া কোনো বছর যেন জিহাদ বন্ধ না থাকে।" আল শাফী, আল উম, খ. ৪, পৃ. ৯০; আরো দৃষ্টব্য, ইবন রুশদ, পূর্বোক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৩।

www.pathagar.com

শক্তিগুলোর সামাজিক সম্পর্কের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির জন্য দৃষ্টিভঙ্গি সফলতা লাভ করতে পারেনি। বৃহৎ শক্তিগুলো কখনও মুসলিম রাষ্ট্র বা তার আদর্শের আত্মপ্রকাশকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। তারা তাদের প্রজাদের জন্য স্বাধীনভাবে বিশ্বাস এবং ধর্মকে বেছে নেওয়ার ধারণাকে কখনও মেনে নিতে পারেনি। বরং তাদের প্রজা সাধারণের মধ্যে যে কেউই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে তাকে তারা শাস্তি দিয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি অন্ততঃ মুসলিম মতবাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে বিশ্বজুড়ে ইসলামের উত্থানের কালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতিসমূহের মধ্যে সমতার দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করেছে। এ সাদৃশ্যের ফলশ্রুতিতে আধুনিক কালে মুসলিমগণ সমতার দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণও ব্যাখ্যা করতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী কাঠামোকে যুগোপযোগী করতে মুসলমানগণ বর্তমানে উপায় উপাদানের অনুসন্ধান করছে।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের খৃষ্টান সামাজিক ব্যবস্থার পতন হয়। ইউরোপে শিল্প শক্তির উদ্ভব ঘটে এবং প্রায় সারা পৃথিবীর উপর এর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তনেরও সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়। নতুন ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশে। কারণ ঐ অংশে নবতর ইউরোপীয় উন্নত শক্তির মোকাবেলায় এ ব্যবস্থা প্রবর্তন না করে বিকল্প পছন্দ গ্রহণ করায় কোন সুযোগ ছিল না।

এ ব্যাপক এবং বাস্তব উপলব্ধির প্রেক্ষিতে ইসলামের পক্ষে বা বিপক্ষে দোষারোপ অথবা অতিরিক্ত কিছু দাবী করার সুযোগ নেই। অনুরূপভাবে নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিলে স্বকীয়তার বিলুপ্তি ঘটবে- মুসলিমদের এ আপত্তি ও সঠিক নয়।

খলিফা, আমীরুল মুমিনীন, ইমাম এবং সুলতান

মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রে এ চারটি পরিভাষা দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বুঝানো হয়। সুলতান শব্দটি ব্যতীত বাকী শব্দগুলো নিছক রাজনৈতিক অর্থে নয় বরং ব্যবহৃত হয়েছে আরো বৃহত্তর অর্থে।

খলিফা (Caliph)

কুরআনের সাধারণ অর্থে এ পরিভাষা একটি বিশেষ ধারণার প্রকাশ করে। এ ধারণা অনুসারে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহপ্রদত্ত বিশ্বাসের এক নির্ভরযোগ্য আমানতদার। আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য এ পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাকে প্রদান করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের নিরিখে সে উপযুক্ত প্রতিদান লাভ করবে এবং তার পরকালের অনন্ত জীবনের ভাগ্যও নির্ধারণ করা হবে। এ কথা মনে রেখে আমরা খলিফা আল মনসুরের ঘোষণাকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারি। তার ঘোষণা ছিল,

www.pathagar.com

তিনি আল্লাহর খলিফা এবং পৃথিবীতে তার ছায়া।[৩৩] খলিফা পোপের (খৃষ্টের প্রতিভূ) মত নন। তিনি শরীয়াতের (কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মতবাদের পরিবর্তন করার তাঁর কোন ক্ষমতা নেই। তাঁর ঘোষণা শরীয়াহ বিধৃত ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা বৈ কিছু নয়। প্রজা সাধারণের মধ্যে নিজ ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার কোন ক্ষমতা খলিফার নেই।[৩৪] মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারায় খলিফা বলতে মূলত প্রথম খলিফাকে ইঙ্গিত করা হয়। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)। তিনি রাসুলের খলিফা (মুসলিম জাতির প্রধান হিসাবে রাসুলের উত্তরসুরী)। এই অর্থে খলিফাকে মুসলিম সমাজের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য নবুয়তের ধারা মুহাম্মদ (সঃ) এর ওফাতের সাথে সাথে শেষ হয়েছে। সুতরাং এমন কোন কাজ খিলাফতের কর্তৃত্বের সাথে সংযুক্ত হতে পারবে না।

ইমাম এবং *আমীরুল মুমনীন*

এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। *আমীরুল মু'মিনীন* হলেন বিশ্বাসীগণের কমান্ডার বা খলিফা আর ইমাম হলেন নেতা। এরূপ নেতৃত্ব আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহের উপর অধিকতর গুরুত্বের নির্দেশক। এ হিসাবে জামাতের নামাজ যিনি পরিচালনা করেন তাঁকে ইমাম বলা হয়। আবার ইসলাম ধর্মীয় বুদ্ধিবৃত্তিক কর্তৃত্বকেও ইমাম হিসাবে অভিহিত করা হয়।[৩৫]

সুলতান

আরবী সুলতান শব্দের শাব্দিক অর্থ ক্ষমতা অথবা কর্তৃত্ব। রাজনৈতিক অর্থে এ শব্দের তাৎপর্য ক্ষমতা, এর অর্থ জাতির কোন ধর্মীয় নেতৃত্ব নয়।[৩৬]

---

[৩৩] Sir Thomas W. Arnold, *the Caliphate*, with a concluding chapter by Sulbia G. Haim (New York; Barnes & Noble, 1965), পৃ: ৫১: See also, al Farra, উ: গ্র:

[৩৪] 'Abbas Mahmud al 'Aqqad, *Haqaitq al Islam wa Abatil Khusumih* (Cairo: Dar al Qalam, 1966), পৃ: ২৩৬-২৫৩; Abu al Ala al Mawdudi, *Nazariat al Islam wa Hadyuhu*, trans. from Urdu by Jalil Hasan al Islahi (Beirut : Dar al Fikr, 1967) পৃ: ৩৮-৫২; Abu Yaqub al Ansari, *Muqaddimat Kitab al Kharaj*, in *Nusus al fukr al Siyasi al Islami, al Imamah inda Ahl al Sunnah*, ed. Yusuf Ibish (Beirut: Dar al Tali ah, 1966), পৃ: ১১-১৪; A. Hourani, *Arab Thought in the Liberal Age* (London: Oxford University Press, 1970), পৃ: ১৪-১৫; E.J. Rosenthal, *Political thought in Medieval Islam* (Cambridge University Press, 1958), পৃ: ২১-২৭; Muhammad Abu Zahrah, *al Mujtama al Insanifi Zill al Islam* (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), পৃ: ১৬৭-১৭০; al Qarafi, *al Ihkam*, পৃ: ৮৪-৯৭; Ibn Kathir, *Tafsir al Qur'an*, খ. ১. পৃ: ৭০-৭২; খ. ২. পৃ: ১৯৯-২০০; খ. ৩., ৫২২-৫২৪; T. W. Arnold, উ: গ্র: পৃ: ১০-২২, ৫২-৫৭, ১৭০, এবং ১৯৫-১৯৭.

[৩৫] দেখুন Ibn Kathir, *Tafsur al Qur'an*, খ. ৩. ৩৩০.

[৩৬] দেখুন E. J. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam, পৃ: ৮, ৩৮-৩৯, ৫৪, ২৪১-২৪২, এবং ২৪৪ আরও দ্র: an Arabic dictionary article on *sa-la-ta* in Muhammad ibn Abu Bakr al Razi, *Mukhtar al Sihah* (Cairo: Mustafa al Babi al Halabi, 1950), পৃ: ৩৩০.

www.pathagar.com

খলিফারূপ প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশের সামগ্রিক বর্ণনা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমাদের বিবেচ্য হল রাজনৈতিক ঐক্যের বিষয় এবং ইসলামী সমাজে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রসংগে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তা ধারার বিকাশের ব্যাপারে বিচারকগণের ভূমিকা আলোচনা করা। খলিফারূপ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মুসলিম বিচারকগণের মৌলিক রাজনৈতিক চিন্তা ধারা ছিল নানাদিক থেকে আদর্শ স্থানীয়। ইসলামের আদর্শিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খলিফারূপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁরা খুবই চিন্তিত ছিলেন।[৩৭] মুসলিম জাতি এবং রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও বিকাশের জন্য নবী করিম (সঃ) তাঁর নিয়ন্ত্রানাধীন সকল রাজনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। হুজুর পাক (সঃ) এর ওফাতের পরক্ষণেই অবশ্য অসংখ্য মরু আরবগোত্রের বিদ্রোহের কারণে মুসলিম সমাজের ভিত কেপে উঠেছিল। এ পর্যায়ে মদিনায় মুসলিম মনীষীবৃন্দ মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত রাখার জন্য অস্ত্র হিসাবে খিলাফতরূপ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করেছিলেন। এ মনীষীবৃন্দ ছিলেন মক্কা হতে মদিনায় গমণকারী মুহাজির। যাঁরা এ কাজে ব্রতী বা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁরা এ দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কোন ধন দৌলত বা শ্রেণীর মাপকাঠিতে নয়, বরং চরিত্র মাধুর্য, নেতৃত্বের অনন্য গুণাবলী, অভিজ্ঞতা এবং আত্মত্যাগের মাপকাঠিতে। তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে, রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কোরাইশ গোত্রের রাসুল (সঃ) এর গোত্রের একজন সদস্যকে নিযুক্ত করা হলে তিনি সমগ্র আরবের জনগণের আনুগত্য অর্জনে সক্ষম হবেন।[৩৮] আবু বকর (রাঃ) অবিলম্বে সকল প্রকার বিদ্রোহ মোকাবিলার লক্ষ্যে মুসলিম সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। তাঁদেরকে কড়া নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা কারো নিকট হতে ইসলাম এবং যাকাত প্রদান ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ না করেন। এভাবে উৎকৃষ্ট মুসলিমবৃন্দ মুসলিম রাষ্ট্রের ঐক্য সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় আবু বকর (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন।[৩৯]

প্রায় তিন যুগ পরে হযরত আলী (রাঃ) ও মোয়াবিয়ার মধ্যে যে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল তা মর্যাদা সম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব সমূহের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের পক্ষাবলম্বনের অপর দৃষ্টান্ত। মূলতঃ ইসলামী মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং জুরীগণ আলী (রাঃ) এবং তাঁর ইসলামী অনুভূতির প্রতি ছিলেন বিনয়াবণত। অবশ্য খারিজীদের ন্যায় কিছু উপদল, যারা প্রথম দিকে আলী (রাঃ) কে সমর্থন করেছিল, তারা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য

---

[৩৭] E. J. Rosenthal, উ: গ্র: পৃ: ২৭; H. A. R. Gibb, *The Civilization of Islam*, পৃ: ১৪৮-১৪৯; এবং T.W. Arnold, *The Caliphate*, পৃ: ১১, ২৫.

[৩৮] Ibn Hisham, *al Sirah*, পৃ: ৬৫৭-৬৬০; Ibn al Athir, *al Kamil fi al Tarikh* (Beirut: dar Beirut li al Tiba ah wa al Nashr, 1965) খ. ২. পৃ: ৩২৭.

[৩৯] Muhammad Hamidullah, *Majmu al Wathaiq al Siyasuah li al 'Ahd al Nabawi*, 3rd rev. ed. (Beirut: Dar al Irshad, 1959), পৃ: ২৯, ২৮৭-৩০৫.

www.pathagar.com

প্রদর্শন করে শৃঙ্খলায় ফিরে আসতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং উমাইয়ারা সুযোগ পেয়ে গেল। কারণ ইসলামী মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং জুরীগণ তাদেরকে সমর্থন করেন। সমর্থন করেন এই কারণে যে, মুসলিম রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব এবং ঐক্য বজায় রাখার প্রশ্নে উমাইয়ারাই ছিল ভাল অবস্থানে।[৪০] তাত্ত্বিক দিক থেকে মুসলিম জুরীগণ ছিলেন একটি কেন্দ্রীয় ইসলামী কর্তৃত্বের প্রবক্তা। অবশ্য স্বীয় বিবেচনায় কোন কোন সময় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আশানুরূপ না হলেও তাঁরা স্থিতাবস্থাকেই সমর্থন জানাতেন। ইতিহাসের শিক্ষায় অনেক জুরীর এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, কঠোর সংস্কার বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায়। আর বিপ্লব আনে রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধ। এগুলো হবে মুসলিম সমাজের পতনের উপাদান। সুতরাং সুন্নী মুসলিম জুরীগণ খলিফাদের আদর্শকেই সমর্থন করেন। কিন্তু কোন কোন সময় প্রয়োজনে হোক বা তড়ি-ঘড়ির কারণে হোক তারা এমন সব কর্তৃত্বের প্রতি ও সমর্থন দিয়েছেন যাদের মধ্যে কাঙ্খিত আদর্শের পুরো প্রতিফলন ছিল না। তথাপি তাদের পক্ষে এটুকু বলা যায়, তারা প্রায়ই অনুগত বিরুদ্ধোবাদী ভূমিকা পালন করেছেন।[৪১] সাধারণভাবে অবশ্য বলা যায় যে, শরীয়াহ-এর খাতিরে জুরীগণ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ঐক্য সংরক্ষণ করার সমর্থনে সকল প্রকার সম্ভাব্য যুক্তি ব্যবহার করেছেন।[৪২]

খিলাফতের দুর্বলতার সুযোগে তুর্কী এবং মামলুকগণ যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলেন, জুরীগণ তখন সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত ইসলামী পরিচয়ের চরিত্র সংরক্ষণের জন্য জনগণের প্রতি ঝুঁকে পড়তে লাগলেন। জুরীগণ জনগণের নিকট আবেদন রাখলেন, তাঁরা যেন ইসলামের জন্য সমর্থন দেন এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে যাতে সে লক্ষ্যে কাজ করতে প্রভাবিত করেন। অবশ্য কর্তৃপক্ষ দাবী করতেন যে তাঁরা শরীয়াতের প্রতি অনুগত আছেন। তাঁরা তা করতেন জনগণের আনুগত্য লাভের উদ্দেশ্যে।[৪৩]

মুসলিম জনসাধারণ ও ইসলামের সেবায় নিয়োজিত আদর্শস্থানীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ কি ধরনের সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার লেখা এবং ইজ্ব ইবন আবদুস সালাম এর ন্যায় জুরীগণ কর্তৃক

---

৪০ দেখুন H. A. R. Gibb, উ: গ্র: পৃ: ৭-১৪.

৪১ দেখুন T. W. Arnold, উ: গ্র: পৃ: ২৫.

৪২ E. J. Rosenthal, উ: গ্র: পৃ: ২৭-৪৭.

৪৩ দেখুন E.J. Rosenthal, উ: গ্র: পৃ: ২৭, ৩২-৩৫, ৫১; H.A.R. Gibb, উ: গ্র: পৃ: ৪-২২, ১৪১-১৪৯, ১৫১-১৬৪; Muhammad Diya *al Din, al Nazaryah al Siyasyah al Islamiyah*, 4th ed. (Cairo: Dar al Ma arif, 1967), পৃ: ৭১, ৯২-১১২.

www.pathagar.com

শরীয়াহ এর পক্ষাবলম্বনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপও অবস্থান থেকে।

এটাও প্রণিধানযোগ্য যে আদর্শ খেলাফতের যুগে মুসলিম চিন্তাধারা কেন্দ্র এবং বিকাশমান আঞ্চলিক ইউনিটগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিরসনে সচেষ্ট ছিল। মুসলিম জুরীগণ একাধিক আইনসম্মত স্বাধীন রাজনৈতিক ইউনিট এবং কর্তৃত্বের অস্তিত্বের প্রতি অনুমোদন দান করেছেন। কিছুসংখ্যক জুরী ঐসব ক্ষেত্রে এ অনুমোদন দিয়েছেন যখন ইউনিটগুলোর অবস্থান ভৌগোলিকভাবে অনেক দূরে হওয়ার কারণে একটিমাত্র প্রশাসনের আওতায় পরিচালনা করা ছিল কষ্টকর। খলিফার কর্তৃত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে গেলে পর জুরীগণ এ প্রশ্নের প্রতি আর তেমন মনযোগ প্রদান করেননি।[৪৪]

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম চিন্তাধারার ঐতিহাসিক মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি

মুসলিম ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন ঐরূপ আধুনিক লেখকদের অনেকের প্রবণতা হল ইতিহাস ব্যাখ্যার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান ভৌত পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। যেমন প্রাথমিক যুগে ইসলামী সাম্রাজ্যের পরিধি দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করেছে কেন? এর কারণ হিসাবে তারা গুরুত্ব দিবে অর্থনৈতিক এবং জনসংখ্যা বিষয়ক উপাদানের উপর। কিন্তু এত অতি সহজ দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি হবে ভুল প্রত্যক্ষণ এবং ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত।[৪৫] কেন বিভিন্ন দল এবং ব্যক্তি বিশেষ কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিল তা নিরূপনের জন্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে অথবা বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষিতে দুই পরিস্থিতির মধ্যকার সামঞ্জস্যই যথেষ্ট নয়। সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক উপাদান দ্বারা নির্ণিত হয় কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি একটি জাতির জীবনধারা ও ইতিহাসকে রূপদান করবে। মুসলিম চিন্তাধারায় দৃষ্টিভঙ্গি, পদ্ধতি এবং তাৎপর্য কি তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম চিন্তাধারা সম্পর্কিত জ্ঞানানুশীলন কালে আমাদেরকে অবশ্যই এদিকটি স্মরণ রাখতে হবে।

---

44 Imam al Haramayn al Juwayni, *fasl ft 'Aqd al Imamah il Shakhsayn,* in Yusuf Ibish, উ: গ্র: পৃ: ২৭৯ ২৭৯.

৪৫ Arnold Toynbee, *Civilization on Trial and The World and the West* (Cleveland: World Publishing Co., 1958), পৃ: ৩২৫; Francesco Gabrielli, Muhammad and the Conquests of Islam, translated from the Italian by V. Luling and R. Linnel (New york: McGraw Hill, 1968), পৃ: ১০৩-১১৫; J. Hell, *al Hadarah al 'Arabyah,* translated from Genrman by I. al 'Adawi and edited by H. Munts (Catro: Maktabat al Anjlu a Misryah, 1956), পৃ: ১২-১৪; John L. Lamonte, *al Harb al Salibyah,* in Drasat Islamyah, ed. Nicola Ziyadah (Beirut: Dar al Andalus, 1960), পৃ: ১০৩-১৪০: T. W. Arnold, পৃ: ২৩-২৪; Wilfred Cantwell Smith, *Islam in Modern History* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1957), পৃ: ৬-৩৫.

www.pathagar.com

আমরা এটা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, জুরীগণের গভীর ধর্মীয় চিন্তাভাবনা মুসলিম সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রের সংরক্ষণে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। খলিফাগণের শাসন কালের ইতিহাস পর্যালোচনার সময় জনকল্যাণে জুরীগণের ভূমিকা কি ছিল এবং সে লক্ষ্য অর্জনে তাঁদের সম্পৃক্ততা কিরূপ ছিল কেউ বিষয়টির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না দিয়ে পারেন না। ইমাম মালিক, ইমাম শাফী, ইমাম মাওয়ারদী এবং ইবনে তাইমিয়ার লিখিত গ্রন্থাবলী এবং ইতিহাস অধ্যয়ন কালে যে কেউ তাঁদের লেখার মধ্যে রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ের প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে অবলোকন করতে পারে। ঐ সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতা। কারণ তাঁদের নিকট এ কর্তৃত্ব বিবেচিত হত আন্তঃ উপদলীয় এবং জনগণের মধ্যকার কোন্দল নিরসনের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে। বস্তুতপক্ষে এরূপ আইন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে বাস্তবধর্মী এবং নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁদের আদর্শিক প্রত্যয় এবং তাঁদের চিন্তাধারার উপর সমকালীন সামাজিক এবং রাজনেতিক বিষয়ের প্রভাব সম্পর্কে এখানে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ এ বিষয়ের লেখকগণ এ দিকগুলোর উপর যথারীতি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টি দিয়েছেন।

অবশ্য আমরা যে বিষয়টি তুলে ধরতে চাই তা হল জুরীগণের উপর নবী করিম (সঃ) এর জীবন এবং তৎপরবর্তী ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে উপস্থাপিত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব। এ দিকটি সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে জ্ঞাত না হলে অমুসলিমনদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিমনদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা খুবই কঠিন হবে। যেমন এ বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে বাইজেন্টাইনীয়দের সম্পর্কে জুরীগণের যে ভীতি ছিল তা আমরা কদাচিৎ উপলব্ধি করার আশা করতে পারি। *'তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, যদি তোমরা যুদ্ধ না করতে তা হলে ইসলাম ধ্বংস হয়ে যেত?* বাইজেন্টাইনীয়গণ কি করত?"[৪৬] এখানে আলোচিত অনেক মুসলিম লেখকই প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদেরকে দুর্বল হিসাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং দুর্বল জনগণকে সন্ত্রস্ত করেছেন। অনেক প্রাচ্যবিদ এ পর্যবেক্ষণকে আত্মসমর্পণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে গণ্য করে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের পর্যক্ষণ ছিল নির্যাতন কমপ্লেক্স এর ফলশ্রুতি- এটি সঠিক নাও হতে পারে। এ সমস্ত মুসলিম লেখকদের আন্তরিকতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করার তেমন কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই। মুসলিমদের মনস্তাত্ত্বিক গঠন প্রকৃতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে আরও ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

---

[৪৬]আহমদ ইবন হাম্বলের উপর আরোপিত। এই উদ্ধৃতিটি ইবনে কুদামা আল মুগনী খ. ৯. পৃ: ১৮৩, ইমাম মালিক ও একইরূপ অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। দেখুন *Malik* (as related by Sahnun), *al Mudauwanah al Kubra* (Cairo: Matba at al Sa adah, 1905), খ. ৪. পৃ: ৫.

www.pathagar.com

মুসলমানদের স্মৃতিতে অংকিত প্রাথমিক যুগের মুসলিম ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বহিঃসম্পর্ক বিষয়ে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অমুসলিমদের প্রতি কম বন্ধু সুলভ দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়েছে পবিত্র কুরআনের আয়াতের এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সমূহের রহিতকরণ ধারণার মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে। ঐ একই উপাদান এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাছাড়া শত্রুতা ও বিপদের প্রতি এ মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রিকের (ম্যাক্রো) পরিবর্তে ক্ষুদ্র (মাইক্রো) বিশ্লেষণে মুসলিম পন্ডিতবর্গের ঝোঁক প্রবণতার ও একটা ব্যাখ্যা প্রদান করে। শেষ অধ্যায়ে আলোচনার জন্য এ বিষয়টি সংরক্ষিত রাখা হল। কারণ এটি চিন্তার উপাদানের চেয়ে পদ্ধতিগত দিকের সাথেই বেশী সংশ্লিষ্ট। এখানে যে বিষয়টির উপর জোর দিতে হবে তা হল এই যে রহিতকরণ ঐ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবকে জোরদার এবং বৈধকরণের জন্য কাজ করেছে।

পবিত্র কুরআন, হাদিস সমূহ এবং নবী করিম (সঃ) এর জীবনী হতে এ উপলব্ধি জন্মে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে দুটি শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। এর একটি শ্রেণী হল আত্মভোলা ন্যায় বিচার প্রত্যাশী মজলুম মুসলিম এবং অপর শ্রেণী হল আত্মকেন্দ্রিক দুর্নীতি পরায়ণ অত্যাচারী অমুসলিম কর্তৃপক্ষ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সংঘটিত ঘটনাসমূহের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের গভীরতা উপলব্ধি করা পশ্চিমা লেখকদের জন্য খুবই দুরূহ ব্যাপার।[৪৭] এ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ঐসমস্ত ঘটনার দ্বারা সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তারই যুক্ত প্রভাব পড়ে মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের উপর। এজন্য ঐ সব ঘটনার কিছুসংখ্যককে সম্পর্কযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এটা কেবল আমাদেরকে ঘটনা সমূহেরই উপলব্ধিতে সাহায্য করে না বরং মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া অমুসলমানদের প্রতি কিরূপ ছিল তা বুঝার ক্ষেত্রেও কাজে লাগে। মূলত এ প্রতিক্রিয়া ছিল একপ্রকার শত্রুতারই বহিঃপ্রকাশ। এ ঘটনাগুলোর কিছু এবং এগুলোর প্রভাব নিম্নে আলোচিত হলো।

একটি দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বয়কট, অপমান, অত্যাচার এবং হত্যাযজ্ঞের অসহনীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ সমুদ্র অতিক্রম করে আবিসিনিয়ায় চলে যেতে বাধ্য হন। মুহম্মদ (সঃ) এর মদিনায় হিজরতের অর্থ এই ছিল

---

৪৭ দেখুন Bernard Lewis, *The Arabs in History* (NY : Harper & Row, 1960), পৃ: ৪২-৪৮; Carl Brockelmann, *History of the Islamic peoples,* translated by J. Carmichael and M. Perlman (NY : Enpriarn Books edition, 1960), পৃ: ২২-২৫; Norman Daniel, *Islam and theWest* (Edinburgh, UK: Edinburgh University Press, 1960), পৃ: ২২৯-৩০৭; and Montgomery Watt, *What is Islam?* (NY : Frederick A. Preager, 1968). পৃ:

www.pathagar.com

না যে, মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান ঘটেছে। কুরাইশরা মুহম্মদ (সঃ) এর পশ্চাদধাবন করে। মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন।[৪৮] মদিনাতে কুরাইশদের চাপ এবং আক্রমণ অব্যাহত থাকে। মুহাম্মদ (সঃ) এর আদর্শকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য তারা সেখানকার ইহুদী এবং আরব গোত্রগুলোর সাথে যোগাযোগ করে এদের মধ্য হতে এ কাজের জন্য লোক নিয়োগ করে।

পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে; বল, 'উহাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং উহার বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। তাহারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যে পর্যন্ত তোমাদিগকে দ্বীন হইতে ফিরাইয়া না দেয়, যদি তাহারা সক্ষম হয়। (২ঃ২১৭)

প্রথম দিকের মুসলিমগণ এক নিরন্তর জুলুমের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এ ছিল তাঁদের জন্য এক উভয় সংকেটর অবস্থা। তাঁরা কি শত্রুদের আক্রমণের অপেক্ষায় থাকবেন, না তাঁদের বিরুদ্ধে নিজেরাই অভিযান শুরু করবেন। বদর যুদ্ধের ক্ষেত্রে যদিও তাঁরা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ছিলেন, তবু তারা শেষোক্ত পন্থায়ই বেচে নিলেন।

স্মরণ কর, তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল রূপে পরিগণিত হইতে। তোমরা আশংকা করিতে যে, লোকেরা তোমাদিগকে অকস্মাৎ ধরিয়া লইয়া যাইবে; অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদিগকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদিগকে উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকা রূপে দান করেন যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (৮ঃ২৬)

আর আল্লাহ্‌ চাহিতেছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁহার বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদিগকে নির্মূল করেন; ইহা এইজন্য যে, তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধিগণ ইহা পছন্দ করে না। (৮ঃ৭-৮)

স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমাদের সহিত আছি, সুতরাং মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ; যাহারা কুফরী করে আমি তাহাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিব; সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাহাদিগের স্কন্ধে ও

---

[৪৮] এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইবন হিশাম অথবা ইবন আসির প্রমুখ রচিত ঐতিহাসিক বিবরণ ছাড়াও কুরআন ও হাদিস (বিশেষত বিতদ্ধ বিবেচিত ছয় হাদিস গ্রন্থ যথা বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসায়ি এবং ইবন মাজাহ) ঐতিহাসিক উৎস হিসেবে বিশেষভাবে সহায়ক।

www.pathagar.com

আঘাত কর তাহাদের প্রত্যেক আংগুলের অগ্রভাগে। ইহা এই হেতু যে, তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করে এবং কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর। সুতরাং ইহার আস্বাদ গ্রহণ কর এবং কাফিরদের জন্য অগ্নি শাস্তি রহিয়াছে। (৮ঃ১২-১৪)

তোমরা তাহাদিগকে হত্যাকর নাই, আল্লাহই তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন, এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং ইহা মু'মিনগণকে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৮ঃ১৭)

অমুসলিমদের সাথে সহজ হওয়া মুসলমানদের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। কারণ এমন কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে এরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ **আল রাজী** এবং **মাউনা কূপের** ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে আরব বিধর্মী গোত্রগুলো নবী করিম (সঃ) এর নিকট গিয়ে আবেদন জানায় তিনি যেন তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য কিছু মুসলিম ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। এটাছিল একটা ষড়যন্ত্র, দুরভিসন্ধি। এ গোত্রগুলো তাদের ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করলেই তাদের জন্য নিযুক্ত নিরস্ত্র শিক্ষকদেরকে আক্রমণও হত্যা করে।[৪৯]

সূত্র মতে মুসলিম সমাজের উপর নির্যাতন চলতেই থাকে। এ সময় কোরাইশ এবং গাতফানদের সাথে মিলে বনু নাজির গোত্রগুলি মদিনায় মুসলিম সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা করে। এ সম্মিলিত জোটের মোকাবিলা করা মুসলিমদের জন্য খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। মদিনার প্রায় চতুর্দিকে তারা পরিখা খনন করলেন। উদ্দেশ্য ছিল এ শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করা। পরিস্থিতি ভয়াবহ করার জন্য মুহাম্মদ (সঃ) এর মিত্র বনু কুরাইজা মদিনা নগরীর অভ্যন্তরে থেকে শত্রু জোটের সাথে যোগ দেয়ার ষড়যন্ত্র করল যাতে ভিতর থেকে, নিকট থেকে, মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালানো যায়।[৫০]

যখন উহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল তোমাদের উপরের দিকও নীচের দিক হইতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছিল, তোমাদের প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে; তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল। আর স্মরণ

---

৪৯ Ibn Hisham, *al-Sirah*, খ. ২. পৃ: ১৬৯-১৮৫.

৫০ প্রাগুক্ত পৃ: ২১৪-২৩২.

www.pathagar.com

করু, মুনাফিকরা ও যাহাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, 'আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে।' আর উহাদের একদল বলিয়াছিল, 'হে য়াছ্‌রিববাসী! এখানে তোমাদের কোনো স্থান নাই, তোমরা ফিরিয়া চল', এবং উহাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিল, 'আমাদের বাড়ি-ঘর, অরক্ষিত'; অথচ ঐগুলি অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল উহাদের উদ্দেশ্য (৩৩ ঃ ১০-১৩)।

মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সহিত তাহাদের কৃত অংগীকার পূর্ণ করিয়াছে, উহাদের কেহ কেহ শাহাদাত বরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। উহারা তাহাদের অংগীকারে কোন পরিবর্তন করে নাই (৩৩ ঃ ২৩);

প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এ অবরোধের আকস্মিক সমাপ্তি ঘটে। শত্রুপক্ষের আক্রমণ পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হওয়াকে মুসলিমগণ আল্লাহর সাহায্যের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে অবলোকন করলেন।

আল্লাহ কাফিরদিগকে ক্রুদ্ধবস্থায় ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোন কল্যাণ লাভ করে নাই। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। কিতাবীদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি তাহাদের দুর্গ হইতে অবতরণ করাইলেনএবং তাহাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করিলেন; এখন তোমরা উহাদের কতককে হত্যা করিতেছ এবং কতেককে করিতেছ বন্দী (৩৩ঃ২৫-২৬)।

কোরাইশ এবং নবী করিম (সাঃ) এর মধ্যকার হোদাইবিয়ার শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পরও নির্যাতন চলতেই থাকে। *কোরাইশদের* বসবাসের এলাকা পবিত্র মক্কাতে তাদের মিত্র *বনুবকর* মুসলমানদের মিত্র খোজাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে।[৫১] ঐ সময়ের মুসলমানদের নিকট এটা প্রতীয়মান হয় যে অমুসলমানদের মূল লক্ষ্য হল সম্পাদিত শান্তি চুক্তির আড়ালে পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করা। এ প্রসংগে পবিত্র কালামের আয়াত নাজিল হয়। আয়াতে এ অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। অমুসলিমদের আক্রমণাত্মক আচরণ সত্ত্বেও মুসলিমগণ সংযম প্রদর্শন করেন। এ আয়াতকে মুসলমানদের ভূমিকার প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসাবে গণ্য করা যায়।

কেমন করিয়া থাকিবে ? তাহারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তাহারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অংগীকারের কোন মর্যাদা দিবে না; তাহারা মুখে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় উহা অস্বীকার করে, তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী। (৯ ঃ ৮)।

---

[৫১] প্রাগুক্ত পৃ: ৩৮৯-৩৯৮.

www.pathagar.com

তাহাদের চুক্তির পর তাহারা যদি তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করে ও তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে, তবে কাফিরদের প্রধানদের সহিত যুদ্ধ কর; ইহারা এমন লোক যাহাদের কোন প্রতিশ্রুতি রহিল না; যেন তাহারা নিবৃত্ত হয়। তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না, যাহারা নিজদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়াছে ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করিয়াছে? উহারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছে। তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর? আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন যদি তোমরা মু'মিন হও। তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। তোমাদের হস্তে আল্লাহ উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, উহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন ও মু'মিনদের চিত্ত প্রশান্ত করিবেন (৯ ঃ ১২-১৪)।

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হইলে মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে, তাহাদের বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাহাদের জন্য ওঁৎ পাতিয়া তাকিবে কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ ঃ ৫)।

"তোমাদের কী হইল যে, তোমরা যুদ্ধ করিবে না আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুগণের জন্য' যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ- যাহার অধিবাসী জালিম, উহা হইতে আমাদিগকে অন্যত্র লইয়া যাও; তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের সহায় কর' (৪-৭৫)।

এসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাব অনুধাবন না করলে প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ কর্তৃক অমুসলিমদের অবিশ্বাসের ব্যাপারটিকে মেনে নেয়া খুবই কঠিন হয়ে দাড়ায়। এরাই সেসব মুসলিম যাঁদের পরশে তদানিন্তন বিশ্বে মানবিকতার অবিস্মরণীয় বিকাশ ঘটেছিল।

মুসলমানগণ মানবিকতা বিকাশের যে অনিন্দ সুন্দর প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কোন যুদ্ধবাজ ও সংকীর্ণমনা মানবগোষ্ঠীর পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণকে কঠিন আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। মুসলমানদের আদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতি অমুসলমানদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির কখনও পরিবর্তন ঘটেনি। এটা অবশ্যম্ভাবীরূপে মুসলিম আইনবিদদের চিন্তাধারার উপর দাগ কেটে রেখেছে। সুতরাং যুদ্ধ এবং দ্বন্দ্বসংঘাত বস্তুতঃপক্ষে অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অবিচ্ছেদ্য ও স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছিল। কোন কোন জুরী মুসলমানদের প্রথমে আক্রমণের সূচনা করার পক্ষে

www.pathagar.com

ছিলেন না। আক্রান্ত হলে তারা প্রতিরোধের কথা বলেছেন।[৫২]

মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগ ছিল সংঘাতে ভরপুর। পাশবর্তী রাষ্ট্রশক্তি সমূহর বিশেষ করে বাইজেন্টাইনের সংগেও চলছিল অবিরাম সংগ্রাম। অনিবার্য রূপেই এসবের একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিদ্যমান আছে। এ অবস্থা আংশিকভাবে হলেও বিশেষ করে বহিঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন *নাস্‌খ* (রহিতকরন) এর ধারণা অতিমাত্রায় ব্যবহার করা হয় তা বিশ্লেষণ করে। প্রতিবেশী অমুসলিম বৈরী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের বৈধতা অর্জন এবং নৈতিক সমর্থন জোরদার করার লক্ষ্যে মুসলিম চিন্তাবিদগণের প্রচেষ্টায় *নস্‌ক* এর ধারণা যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অবশ্য সমকালীন অবস্থার গন্ডির বাইরে গিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করার ক্ষেত্রে *নস্‌খ* তাদেরকে কোন সাহায্য করেনি।

নাস্‌ক ঃ ভুল ব্যাখ্যা ও ভুল ধারণা

শরীয়াহ সংক্রান্ত গবেষণা, বিশেষ করে আইন শাস্ত্র এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে, 'নাস্‌খ' এর ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম জুরীগণের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা রহিতকরণের পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করে আসছে।

বহিঃসম্পর্কীয় বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে বহুল আলোচিত এবং বিতর্কিত বিষয় হল তরবারীর আয়াত।'[৫৩] ইসলামের প্রাথমিক যুগে অমুসলিমদের উপর আক্রোশের বশবর্তী হয়ে কিছু সংখ্যক জুরী এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে চরমপন্থা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা দাবী করেন এ আয়াত ধৈর্য্য *(সবর)*, উপদেশ *(হুসনা)*, ক্ষমা *(লাইক্‌রাহ)* এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার *(লাসতা আলাইহীম বি মুসাইতীর)* জাতীয় পূর্ববতী সকল আয়াতকে রহিত করেছে।[৫৪] উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। ইবন আল আরাবী এবং ইবন সালামাত এর মতে তরবারীর আয়াত সর্বমোট ১২৪টি আয়াতকে রহিত করেছে। মুসতফা আবু যায়েদ বলেন, একই আয়াত দ্বারা রহিতকৃত আয়াতের সংখ্যা ১৪০ অতিক্রম করেছে।[৫৫]

---

[৫২] দেখুন Ibn Rushd, উ: গ্র: খ. ১. পৃ: ৩১৩.

[৫৩] তরবারির আয়াতটি হল ঃ অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হইলে মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে, তাহাদিগকে বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাহাদের জন্য ওৎ পাতিয়া থাকিবে; কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিবে, আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ঃ৫)।

[৫৪] Muhammad 'Abd al 'Azim al Zarqani, *Manahil al 'Irfan fi 'Ulim al Quran* (Catro: Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyah, n.d.), vol. II, p. 156; Mustafa Abu Zayd, *al Nasikh wa al Mansukh; Dirasah Tashriyah, Tarikhiah, Naqdiyah* (Cairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1963), খ. ১. পৃ: ২৮৪-৫০১, খ. ২. পৃ: ৫০৩-৫৮৩.

55 দেখুন Badr al Din al zarakshi, *al Burhan fi 'Ulum al Quran*, ed. Muhammad Abu al Fadl Ibrahim (Cairo: Dar Ihya al Kutub al 'Arabiyah, 1957), খ. ২. পৃ: ৪০; উ: গ্র: খ. ২ পৃ: ৫০৮.

www.pathagar.com

দেখা গেছে জিহাদের স্বরূপ সম্পর্কে জুরীগণের মতামত ছিল বিচিত্রধর্মী।[৫৬] যাঁরা জিহাদের মধ্যে আক্রমণাত্মক ভাবধারা অবলোকন করেছেন তাঁরা তা করেছেন কেবল কুরআনের ব্যাপক সংখ্যক আয়াতের প্রতি রহিতকরণের ধারা প্রয়োগ করে। একটি মানবতাবাদী সাম্যবাদী মানব সমাজ গঠনের লক্ষ্যে মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রত করার পরিবর্তে এ দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের মিশনকে এক ধরনের আধ্যাত্মিক স্বৈরতান্ত্রিক সমগ্রতাবাদের নিকৃষ্ট পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। রহিতকরণের ধারণার এরূপ ব্যবহার বস্তুত পক্ষেই কুরআনের জ্ঞানালোককে সংকীর্ণতার গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে।

এই ভুল ধারণার অপনোদন হলে ভুল ব্যাখ্যা এবং রহিতকরণের প্রয়োগ প্রক্রিয়া সংশোধিত হবে। মুক্ত হওয়া যাবে এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে। ইসলামের তাৎপর্যকে হুজুরে পাক (সঃ) এর পরবর্তী স্বল্প সময়কালের বৈরী ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে সীমিত করা যায় না। মক্কী ও মাদানী যুগের প্রাথমিক সময়কালীন কুরআনও সুন্নাহর অবশিষ্ট বর্ণাঢ্য বিষয় ও অভিজ্ঞতার প্রতিও কোন অবজ্ঞা অবহেলা প্রদর্শন করা যায় না। এরূপ করা হলে ভবিষ্যতে মানবজাতির পক্ষে সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ করা এবং এমন কি টিকে থাকাও সম্ভবপর নয়। ইসলামকে অবশ্যই পবিত্র কালামের সেসব বহুমূখী শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে যেগুলো একে একটি কালজয়ী আদর্শের রূপ দিয়েছে। এ আদর্শ এবং তা হতে উৎসারিত মূল্যবোধই সমাজে মানুষকে পরিচালনা করবে। এ জন্য প্রয়োজন পবিত্র কুরআনের তাৎপর্য এবং অভিজ্ঞতার পুনর্মূল্যায়ন। প্রয়োজন তন্মধ্যে রহিতকরণের ধারণার সঠিক স্থান নিরূপণ। এ প্রক্রিয়া একটি মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করবে। ফলশ্রুতিতে রহিতকরণের ধারণা প্রয়োগের সুযোগ সীমিত পরিসরে সীমাবদ্ধ হবে এবং ইসলামী আইন শাস্ত্রে এর প্রচলিত অর্থেরও পরিবর্তন ঘটবে।[৫৭]

সহিষ্ণুতা এবং ঐক্য ঃ একটি কালোত্তীর্ণ উত্তরাধিকার

বহিঃসম্পর্ক বিষয়ে ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম চিন্তাধারার উপর অধিকতর আলোকপাত করার জন্য এর আরও দুটি উল্লেখযোগ্য দিকের একনিষ্ঠ মূল্যায়ন প্রয়োজন।

---

56 যেহাদের উপর প্রাথমিক যুগের জুরীগণের মতামতের পার্থক্যের আরও উদাহরণের জন্য দেখুন ইবনে কাসির এবং কুরআনের তফসীর উ: গ্র: খ. ১. পৃ: ৩১০-৩১১, খ. ২. পৃ: ৩২২, ৩৩৬-৩৩৭; এবং Ibn Jarur al Tabari, উ: গ্র: খ. ২. পৃ: ১৯৮-১৯৯, ৩৩২-৩৩৫, খ. ৩. পৃ: ১৪-২১, খ. ৯. পৃ: ১৫৩-১৫৫, খ. ১০. পৃ: ৩৩-৩৪.

৫৭ মুসলিম চিন্তা ও গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচনা প্রচেষ্টাকে যেন কোনো মুসলিম চিন্তাবিদ ভুলভাবে ব্যাখ্যা না করেন। এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য মুসলিম চিন্তাবিদদের সেসব কৌশলগত উপাদানগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যেগুলো মৌলিক ও বৃহদার্থে কুরআন অনুধাবন করতে বাধাগ্রস্ত করছে। আধুনিক বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। আজকের মুসলিম বিশ্ব যে আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ, অগভীর ও সংকীর্ণ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে আটকা পড়ে আছে তার বিকল্প হল বিস্তৃত ও বৃহদার্থে কুরআনকে বোঝা।

www.pathagar.com

এ অধ্যায়ের প্রথমদিকে আমরা ক্লাসিক্যাল মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিভাষার প্রবর্তন এবং সংজ্ঞা দিয়েছিলাম। কিন্তু নিছক সূচনা এবং সংজ্ঞাই যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে আমাদের আরও সামনে যেতে হবে। আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামোর সাথে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারার যোগসূত্র স্থাপন করতে হলে এর কাঠামোতে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সন্নিবেশিত করতে হবে। আমাদের পাঠকবর্গের অনেকের চিন্তাধারায় রয়েছে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার সাথে ঐকতান। মুসলিম রাজনৈতিক ক্ল্যাসিক্যাল চিন্তাধারায় সন্নিবেশিত এসব বিষয় অনুধ্যান না করলে তাঁরা কখনও আধুনিক মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সম্পর্কে মুসলিম দৃষ্টিকোণ সম্মকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন না।

ইসলামের কাঠামো মৌলিকভাবে আদর্শিক এবং ব্যক্তিগত। সহিষ্ণুণতা ইসলামী প্রত্যয়েরই অন্তর্নিহিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নৈতিক অঙ্গীকার। বহিঃসম্পর্কের ক্ষেত্রেও এটাই হল মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি। মুসলিম ক্লাসিক্যাল কাঠামোর আওতায় বহিঃসম্পর্ক বলতে বুঝায় মুসলিম-মুসলিম, মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক। এ সম্পর্ক যে কোন কাঠামো ও শর্তেরই আওতায় হতে পারে। হতে পারে এ সম্পর্ক গোত্রে গোত্রে, হতে পারে জাতিতে জাতিতে। এমনকি যখন কোন মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হিসাবে বসবাস করে, তখনও বিষয়টিতে কিছু আন্তর্জাতিক উপাদান সন্নিবেশিত থাকে। কারণ স্মরণযোগ্য যে, পৃথিবীটি মুসলমানদের জন্য দু'ভাগে বিভক্ত। একটি *দারুল ইসলাম* এবং অপরটি *দারুল হারব*। এতে মানবাধিকার ইস্যু এবং ভিন্ন রাষ্ট্রের এবং সংগঠনের রাজনৈতিক স্বার্থ সংক্রান্ত ইস্যু সংশ্লিষ্ট থাকে। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের বিষয়টিও এক্ষেত্রে এসে যায়। এসে যায় মুসলমান বিশ্বের মধ্যস্থিত বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যদার প্রশ্ন। আরও রয়েছে বহুবিদ আন্তঃআরব ও আন্তঃমুসলিম সম্পর্ক বিষয়ক বহু আন্তর্জাতিক সমস্যা। এসব বিষয় ভাল ভাবে বুঝতে হলে ক্লাসিক্যাল মুসলিম রাজনেতিক চিন্তাধারার গভীরে প্রবেশ করতে হবে। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিম সম্পর্ক বিষয়ক সাধারণ বিষয়াবলীর গভীর বিশ্লেষণও এক্ষেত্রে প্রয়োজন।

এ অধ্যায়ে আমরা দুটি ব্যাপক বিষয়ে আলোকপাত করব। এর একটি হল সহিষ্ণুতা এবং অপরটি ঐক্য। এ আলোচনার উদ্দেশ্য হল কিভাবে ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা এসব ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করছে তা খতিয়ে দেখা। তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সম্ভাব্য সমাধান এবং বিকল্প নিয়ে আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

সহিষ্ণুতা এবং ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রতি সম্মান

সনাতন মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সহিষ্ণুতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় কাদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানো হবে এবং যাদেরকে ক্ষমা করা হবে তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে সে বিষয়টির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। জুরীগণ এ ব্যাপারে একমত যে ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছিল আহল আলকিতাব। সাধারণত আহল আল কিতাব বলতে খৃষ্টান এবং ইহুদীদেরকে বুঝায়। তাছাড়া আরো কিছু গোষ্ঠী যারা তাদের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল তারাও এরমধ্যে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ "সাবিয়ানস'দের কথা উল্লেখ করা যায়। ম্যাগিয়ানসরও (জোরাষ্ট্রিয়ানস) এতে অন্তর্ভুক্ত। এদের বিষয়টি হাদিস দ্বারা সমর্থিত।[৫৮] কতিপয় জুরীর মতে আরব বিধর্মীদের ক্ষমার সুযোগ ছিল না। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ অথবা বিকল্প হিসাবে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হতো। এ বিষয়ে কুরআন এবং হাদিসের ভাষ্যের অন্তর্নিহিত অর্থ এটাই। যে সকল জুরী এ অবস্থানের পক্ষে তাদের যুক্তি হল আরব বিধর্মীদের কোন অবতীর্ণ গ্রন্থ নেই এবং যেহেতু তাঁরা নবী করিমের (সঃ) লোক তাঁদের আশ্রয় স্থল হবে ইসলামের ছায়াতলে। অন্যলোক বিশেষ করে যদি তাঁরা বিধর্মী হয় তাঁহলে তাঁদের প্রতি প্রদর্শিত আচরণের ধরণও হবে আরব বিধর্মীদেরই অনুরূপ। এ মত কিছু সংখ্যক জুরীর।[৫৯]

এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে অমুসলিমদের সম্পর্কে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অভিজ্ঞতার যে তাৎপর্য তা হতে এ সকল আইনবিদ কতদূর বিচ্যুত হয়েছিলেন। প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে তারা কুরআনের আয়াত সমূহকে গ্রহণ করেছেন। এরূপ করার ফলে ঐসব আয়াতের তাৎপর্য বিপর্যস্ত হয়েছে। কুরআন এবং সুন্নাহ বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে। ঐ সমস্ত বিধর্মীদেরকে সবসময় কুরআনে মুশরিক হিসাবে অভিহিত করেছে। এসব আরবদের সম্পর্কে কুরআন যখনই কথা বলেছে তখনই তাদের নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, মুনাফেকী, লোভ, বর্বরতা ইত্যাদির উপর জোর দিয়েছে। যে সব আরব এ আয়াতগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল, তারা ছিল প্রধাণত বেদুঈন। তারা ক্রমাগত ভাবে মুসলিমদের উপর আক্রমণ চালাত। চালাত তাদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার। সম্পাদিত চুক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা ছিল তাদের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই ইসলাম সাধারণত তাদেরকে অসভ্য বর্বর হিসাবেই দেখেছে। এসব বর্বর লোকের মধ্যে দায়িত্বশীল এবং সুশৃংখল মানবিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী ছিলনা। ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে কেন আহলে কিতাব বলা হয়েছে ঐসব আইনবিদ সে তাৎপর্য পর্যন্ত উপলব্ধি করতে ভুল করেছেন। কুরআনের

---

[৫৮] দেখুন Ibn Qudamah, উ: গ্র: খ. ৯. পৃ: ১৯৪-১৯৫; and al Shafi, *al Umm*, খ. ৪. পৃ: ৯৪-৯৭

[৫৯] প্রাগুক্ত, খ. ৯. পৃ: ৩২৩.

www.pathagar.com

আলোকে লেখা পড়া হল জ্ঞান এবং সভ্যতার প্রতীক। বেদুইনদের তুলনায় আহলে কিতাবগণ যে জ্ঞান এবং সভ্যতার দিক দিয়ে উন্নততর সে বিষয়টি কুরআনের পাঠকবৃন্দ ভুল করতে পারেন না।

মক্কী সময়কালের শুরু থেকে মাদানী সময়কালের শেষ পর্যন্ত কুরআনে যে সব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ক্ল্যাসিক্যাল জুরীবৃন্দ যেরূপ বলে মনে করেছেন তা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী ভারসাম্যপূর্ণ।[৬০] ইসলাম কেবলমাত্র 'আদনানী' বেদুইন এবং ইসলামের বিরোধিতায় তাদের কোরাইশী নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই সর্বাত্মক যুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে।[৬১] বর্বর আরবদের প্রতি এ দৃষ্টিভঙ্গি জন্মলাভের কারণ হল তারা যে সামাজিক বিবর্তনের ধারায় তখন অবস্থান করছিল তা ছিল মানবিক দায়িত্ব এবং সুশৃংখল পারস্পরিক যোগাযোগের অনুপযোগী। এ অসভ্য আররবা বিভিন্নভাবে বর্বর আচরণ ও জীবন যাপনের পন্থাই অনুসরণে আসক্ত ছিল। সেজন্য মানবসভ্যতা এবং সুশৃংখল সামাজিক এবং মানবিক যোগাযোগের উপযোগী কাঠামোতে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে যে সমস্ত পরিবর্তন অপরিহার্য্য সেগুলো গ্রহণে তাদেরকে বাধ্য করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ছিল না। ইসলাম প্রদান করলো মৌলিক মানবাধিকার। আরবদের জীবনে আসল অনন্য মৌলিক পরিবর্তন। ইসলামের পতাকাতলে আরবরা আত্মসমর্পন করল। সভ্যতার রাজপথে শুরু হল তাদের ঐতিহাসিক যাত্রা।

যে সমস্ত আইনবিদ বেদুইনদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তারাই মক্কা বিজয়ের পর নাজরানের খৃষ্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির তাৎপর্যের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে সক্ষম হননি। মদিনা চুক্তির প্রসংগে আসলে তাদের এ অবস্থাই দাড়ায়। ইহুদীদের সাথে মদিনা এবং খায়বরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এসব যুদ্ধে তাদের রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। এর পরেও তাদেরকে মদিনায় শান্তিতে বসবাস করতে দেয়া হয়। প্রদর্শন করা হয় তাদের প্রতি ক্ষমা। ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এমতাবস্থায় ও তাদেরকে কখনও বাধ্য করা হয়নি। তাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হয়। মনে করা হয় তখনও তাদের মধ্যে যথেষ্ট সামাজিক মূল্যবোধ এবং শৃংখলাবোধের সম্পদ ছিল। এবং তারা মানবিক দায়িত্ব পালন এবং সুশৃংখল মানবিক যোগাযোগের জন্য ছিল উপযোগী।

---

[৬০] A. M. al Saidi, *al Hurriyah al Diniyah*, পৃ: ১৯-১৭৩; Abu al Ala Mawdudi, *al Islam fi Muwajahat al Tahaddiyat al Muasirah*, trans. Khalil Ahmad al Hamidi (Kuwait: Dar al Qalam, 1971), পৃ: ৩৯-৬২ এবং ১৭১-১৮৯; Muhammad Fathi Uthman, **al Fikr al Islami wa al Tatawwur** (Kuwait: al Dar al Kuwaitiyah, 1969), পৃ: ২৫৪-২৭৯.

[৬১] দ্রঃ Ibn Hisham, উ: গ্র: খ. ১. পৃ: ২৬৪-৪৯০; এবং খ. ২. পৃ: ১৬৯-১৯০, ৩০৮-৩২৮, ৩৮৯-৪২৫, ৫৪৩-৫৬০.

www.pathagar.com

অমুসলিম সম্প্রদায়গুলোর সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ফলশ্রুতিতে ধৈর্য্য প্রদর্শনের প্রশ্নে ক্লাসিক্যাল আইনী দৃষ্টিভঙ্গির কতেক নমনীয়তা হ্রাস পায়। অথচ এ ব্যাপারে অনেক সৃষ্টিধর্মী নীতির বিকাশ ঘটানো সম্ভব ছিল। তা না করে এই নীতিগুলোকে আরো অনমনীয় করা হয় ঐতিহাসিক উদাহরণ টেনে বিভিন্ন ভাবে। এ অবস্থার উদ্ভব হয় প্রধানত কুরআনের ঐ সমস্ত আয়াতের রহিতকরণের মাধ্যমে যেগুলো সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের সমর্থক।

সহিষ্ণুতার ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় হলো জিয্য়া প্রদান। সনাতন আইনবিদগণ কুরআনের একটি বিশেষ আয়াতকে এর যথাযথ প্রাসঙ্গিকতা ব্যতীরেকে ব্যবহার করেছেন। আয়াতটি হলো-

যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহে ঈমান আনে না ও শেষ দিনেও নহে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিয্য়া দেয় (৯ঃ২৯)।

অধিকাংশ জুরীই সগর (Saghar) কিভাবে প্রয়োগ করা হবে এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু সগর আদৌ প্রয়োগ করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেননি। উল্লেখ্য যে, সগর হলো নীচে নামানোর কার্যক্রম (Act of bringing low)। সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কিছু সংখ্যক জিম্মির সগর সম্পাদিত হয়েছিল তাদের ইসলামী আহল পালনের মাধ্যমে এবং অন্যদের সগর হয়েছিল জিয্য়া প্রদানের মাধ্যমে।[৬২]

এই যুক্তির প্রথমাংশ পরিস্কাররূপে ইসলামী ভাবাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসলামের মূল লক্ষ্য হলো এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন যা সর্বদিক দিয়ে উন্নততর, পবিত্রতর এবং অধিকতর সাম্যের ভাবধারায় সিক্ত।

আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করিয়াছি (২১ঃ১০৭)।

জুরীগণ এ ক্ষেত্রে ইসলামকে এসব লোকদের জন্য দয়া এবং কল্যাণ ব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ইসলাম এ ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়েছে একটি অপমান ও অমর্যাদার ব্যবস্থা হিসাবে। কুরআনের এই আয়াতকে (৯ঃ২৯) প্রাসঙ্গিকতা থেকে

---

৬২ দেখুন Ibn al Qayyim, Ahkam ahl al Dhimmah, খ. ১, পৃ: ১৬-১৮; এবং al Shafi, উ: গ্র: খ. ৪. পৃ: ৯৯-১০১.

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্ন করে দেখা ব্যতীত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া খুবই দুরূহ। বস্তুতপক্ষে সংশ্লিষ্ট আয়াতের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতার আলোকে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করলে জুরীগণের এমতের সমর্থন পাওয়া যায় না। আক্রমণকারী মুশরিক এবং ঐসকল আহলে কিতাব ছিল গুণ বৈশিষ্ট্যে মুশরিকদেরই অনুরূপ এবং যারা ঐ সময়ে মুশরিকদের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিল তাদের সঙ্গে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের বিরোধের বিষয়কে কেন্দ্র করে আল্লাহর তরফ থেকে যে ভাষণ অবতীর্ণ হয়েছে এ আয়াতটি তারই অংশ বিশেষ।

তাহারা তাহাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র জ্যোতি নির্বাপিত করিতে চাহে। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ তাঁহার জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না। মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও অপর সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করিবার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ তাঁহার রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। হে মুমিনগণ! পন্ডিত এবং সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে (৯ঃ৩২-৩৪)।

পুরোভাষণটির সমাপ্তি টানা হয়েছে নিম্নোক্তোরূপে ঃ

তোমরা মুশরিকদের সহিত সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিবে, যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকে। এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌তো মুত্তাকীদিগের সঙ্গে আছেন (৯ঃ৩৬)।

কলহপ্রিয় অসৎশত্রুদের জন্য যে রূপ আচরণের ব্যবস্থা থাকে সম্মানিত জুরীগণের এ মতামত যেন সে রূপ ব্যবস্থারই নিছক একটি সম্প্রসারণ যার আওতায় মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষে সকল অমুসলমানকে সংযুক্ত করা হলো। অথচ ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শ ও মৌলিক উদ্দেশ্য হলো মানব জাতির সেবা ও পথ প্রদর্শন ক্ল্যাসিক্যাল জুরীগণের এমন একটি বড় ধরনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হলে আমাদেরকে মদিনা এবং নাজরানের শাসনতান্ত্রিক চুক্তিপত্রের তাৎপর্য ভুলে যেতে হয়। *সাগরের* প্রশ্ন থেকে জিয়য়া প্রদানের বিষয়টি পৃথক করা হয়েছিল। এগুলো সম্পূর্ণরূপে ছিল পৃথক বিষয় এবং অমুসলিমদের ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয় সম্পাদনে এগুলোর ভূমিকাও ছিল বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন। চূড়ান্ত বিবেচনায় এটা অত্যন্ত পরিস্কার যে *সগর* এর বিষয়টি অবলীলায় সকল মুসলমানের প্রতি প্রয়োগের জন্য ছিল না। সগর অন্যধর্মে বিশ্বাসের জন্য শাস্তি স্বরূপ কিছু নয়। এতে এরূপ কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেই। এটা ছিল মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা, বেরী দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায় নীতির বিরুদ্ধাচরণ, চিন্তার স্বাধীনতা, নিরাপত্তার স্বাধীনতা এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য ইসলামের যে অঙ্গীকার তার বিরুদ্ধাচারণের বিরুদ্ধেই একটি ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটা প্রতীয়মান হয় যে বহিঃসম্পর্ক বিষয়ে ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারার কাঠামো কতিপয় ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ছিল নেতিবাচক এবং অমুসলিমদের সাথে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের প্রশ্নে এ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃত উপলব্ধি ও আগ্রহের অভাব ছিল। এ বিশ্লেষণের ফলে এটা আংশিকভাবে বুঝা যায় যে প্রথম দুই মুসলিম প্রজন্মের পরবর্তী সময়ে আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন বণিক এবং সুফী শিক্ষকগণ কর্তৃক ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজটি সম্পাদিত হয়েছিল।

উম্মাহর ঐক্য

উম্মা শব্দটি পবিত্র কুরআনে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ উৎকর্ষ, পথ, সময়ের পরিসর, একটি দল, একটি মানবগোষ্ঠী।[৬৩] ক্লাসিক্যাল জুরীগণ ইসলামিক উম্মাহ বিষয়ক আলোচনা করেছেন তখন যখনই তাঁরা বিশ্বাসীদের পাশাপাশি অবিশ্বাসীদের প্রসংগ ও উল্লেখ করেছেন। আর এটা হল একটা দার্শনিক ও আদর্শিক ধারণা। অপরপক্ষে *দারুল ইসলামের* উল্লেখ কালে এর পাশাপাশি *দারুল হাব* এর প্রসংগও অবতারণা করেছেন। আর এটা হল মুসলিম শাসনের পরিধি এবং অমুসলিম জাতিসমূহের প্রেক্ষিতে মুসলমান খলিফাগণের প্রসংগ। এ বক্তব্যের প্রাসংগিকতা হল মুসলিম ভূমিতে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সাংগঠনিক এবং শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর সাথে।

প্রাথমিক যুগের মুসলিম মনীষী এবং ক্লাসিক্যাল জুরীবৃন্দ ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং বুদ্ধিদীপ্ত। এ প্রখর বুদ্ধিমত্তার সুবাদে তাঁরা কোন বিষয়ের একটি দিকের উপর প্রদত্ত গুরুত্ব পরিবর্তন করে অন্যদিকের উপর তা স্থানান্তরিত করে নিতে যথেষ্ট পারঙ্গম ছিলেন। এটা তাঁরা করতেন কোন সুনির্দিষ্ট সমস্যাবলীর সমাধান কল্পে এবং মুসলিম উম্মাহর বিকাশের চলমানতা এবং একটি জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের অনুকূলে যথাযথ ভূমিকা পালনার্থে। এতদসত্ত্বেও সৃষ্ট অস্পষ্টতা এবং দার্শনিক দিকগুলো পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সৃষ্টি করেছে নানারূপ ভ্রান্তির জোড়াজাল। এ অবস্থা মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক পতন এবং পশ্চাৎগামীতার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ ইসলামী উম্মাহর প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়িত্বের জন্য রাজনৈতিক কর্তৃত্বের গুরুত্ব সমকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। উম্মাহর সংরক্ষণের জন্য মদিনার কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উপজাতি গোত্রসমূহের বিদ্রোহ দমনের জন্য মহান নবীর (সঃ) ওফাতের পর প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রাঃ) এর প্রশাসন সিদ্ধান্ত গ্রহণ

---

[৬৩] কুরআনে 'উম্মাহ' শব্দটির বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দেখুনঃ (সংখ্যাগুলো বাংলা করে দিন) ১৬:১২০, ৪২:৮, ৪৩:২৩, ১৩:৪৫, ১১:৮, ৭:১৫৯, ৭:১৬৪, ২৮:২৩, ৩:১০৪, ১৬:৯২, ২৩:৩৪, ৩৫:২৪, ২:১৩৪, এবং ২৩:৫২.

www.pathagar.com

করেছিলেন। বিষয়টি সংগঠন এবং দর্শন সংশ্লিষ্ট বিধায় সিদ্ধান্তটি ছিল ঐতিহাসিক। এটি ছিল দুটি বিকল্পের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত। এ বিকল্পের একটি হল নৈরাজ্য এবং অপরটি হল রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং জাতির উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশ। মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান বহুমুখী উপাদানের লালন ও এগুলোকে সমন্বিত করার প্রয়াসে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের উপর গুরুত্বপ্রদান যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

মুসলিম সাম্রাজ্যের জনগোষ্ঠী এবং ভৌগোলিক অবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতির ফলশ্রুতিতে এর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল বিচিত্রধর্মী রক্ত, বর্ণ ও সংস্কৃতির গোত্রগোষ্ঠীর। এ জন্য একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল রাজনৈতিকপুনর্গঠনের। বস্তুতঃ এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যখন মুসলিম বিশ্ব কয়েকটি স্বাধীন এবং আধা স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। আবদুল কাদির আল বাগদাদী, আল মাওয়ারদী, আবু ইয়ালা এবং আল গাজ্জালীর মত স্বনামধন্য ক্ল্যাসিক্যাল জুরীবৃন্দ একটি একীভূত সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উপর সবিশেষে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এসব জুরীগণের লেখার সময়কাল হল একাদশ হতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী।[৬৪] যদিও মুসলিম বিশ্বে বহু সার্বভৌমত্ব সম্বলিত একটি পদ্ধতির অস্তিত্বের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন তথাপি পুনর্গঠন এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের একটি ক্রমবিকাশমান পদ্ধতির পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে তারা ছিলেন দ্বিধাগ্রস্থ বা সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ।[৬৫] মনে হয় জুরীগণ বন্দী হয়ে পড়েছিলেন দুটি বিষয়ের সংকটাবর্তে। এর একটি ছিল হুজুরে পাক (সঃ) এর সুনির্দিষ্ট সহজ ও একক প্রশাসনের আদর্শ মডেল অপরটি ছিল খুলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) ওসমান (রাঃ) আলী (রাঃ) মুয়াবিয়া (রাঃ) এর শাসনামলের নৈরাজ্য এবং গৃহযুদ্ধসমূহ এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের শাসন কালের আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান এবং আবদুল্লাহ ইবন আল জুবায়রের মধ্যে সংঘঠিত এবং আল মানসুর এবং মুহাম্মদ ইবন আল নফস আল জাকিয়ার মধ্যেকার যুদ্ধগুলোর বেদনাদায়ক তিক্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার স্মৃতি।

বিংশ শতাব্দীতে সকল দিক দিয়ে খেলাফতের বিলুপ্তি ঘটে। এসময় ইসলাম এবং মুসলিম উম্মার কল্যাণের লক্ষ্যে জুরীগণ রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক ঐক্যের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে চূড়ান্তভাবে মৌলিক দার্শনিক এবং আদর্শিক চিন্তা ধারার প্রতি ঝুঁকে পড়েন।[৬৬] মুসলিম বিশ্বের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন এবং পরিবর্তন সমূহের জন্য

---

[৬৪] দেখুন 'Abd al Qahir ibn Tahir, *Ahkam al Imamah wa Shurut al Za amah,* in Yusuf Iish, উ: গ্র: পৃ: ১২৬-২৬২ এবং দ্র: Abu Hamid al Ghazali, *Fi al Imamah,* in Yusuf Ibish, উ: গ্র: পৃ: ২৭৪.

[৬৫] দেখুন Imam al Haramayn al Juwayni, *Fasl fi 'Aqd al Imamah it Shakhsayn* (Regarding Appointment of Two Persons for Imamah), in Yusuf Ibish, উ: গ্র: পৃ: ২৭৯.

[৬৬] Ibn Taymiyah, *dl Siyasah al Sharyah* (Beirut: Dar al Kutuf al Arabiyah, n.d.), পৃ: ৫, ৪২, ১৩৬, ১৩৮, ১৪৩.

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে একাত্ম হতে এবং খাপ-খাইয়ে চলতে তারা ব্যর্থ হন। বস্তুতপক্ষে আজ পর্যন্ত মুসলিম লেখকবৃন্দ ক্ষমতা এবং জাতীয় উন্নয়নকে মুসলিম উম্মার কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত করে অবলোকন করেছেন। তাঁদের চিন্তা ধারায় বিশ্ব রাজনীতিতে ক্ষমতার জটিল বিষয় এবং হুজুর পাক (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং দ্বন্দ্ব সংঘাত ও যুদ্ধ বিগ্রহ সংক্রান্ত নীতি পদ্ধতির সম্যক উপলব্ধির দৈন্যতা পরিলক্ষিত হয়।[৬৭] আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে আধুনিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে ও এ ত্রুটিগুলি একটি উপাদান হিসাবে বিরাজমান আছে। প্রাচ্যতত্ত্বের অনুসারী অনেক লেখকও নৈরাজ্য এবং কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মধ্যবর্তী একটি অবস্থানের কথা তাঁদের চিন্তা চেতনায় ধারণ করতে অক্ষম বলে প্রতীয়মান হয়। মুসলিম সাম্রাজ্য যখন আরব ভূ-খন্ডের সীমা ছেড়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল তখন যে সমস্ত পরিবর্তন অনিবার্যরূপেই এসেছিল সেগুলো উপলব্ধি করতে ও তারা ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাদের চিন্তা চেতনায় আদর্শের চেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছিল অলীক কল্পনা। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে তাঁরা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই বেশী গ্রহণ করেছিলেন। সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যে কোন একটি বাস্তবমুখী এবং গঠনমূলক বিকল্প গ্রহণ বা বিবেচনা করতে সক্ষম হননি। এর ফলশ্রুতিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কোন অবসান হয়নি। উপলব্ধিতে দর্শন এবং সংগঠনের আন্ত সম্পর্কিত এ বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণাগত বিভ্রান্তি দূর না হলে এবং মুসলিম উম্মাহর চিন্তাধারা ও শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ে অধিকতর গবেষণায় আত্ম নিয়োগ না করলে মুসলিম দেশগুলোতে বিদ্যমান সম্পর্ক এবং তাদের মধ্যকার ঐক্য জোরদারের ক্ষেত্রে যে দুষ্ট ক্ষত কাজ করছে তা দূর করা যাবে না।

ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য দিক

বিভিন্ন অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত খুটিনাটি এবং আইনী যুক্তিতর্ক আছে। এগুলো সামগ্রিক দৃশ্যপট অনুধাবনে আমাদের মনোযোগকে সরিয়ে নেয়া। এরূপ না হিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আটলান্টিক থেকে সুদূর চীনের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি মুসলিম সাম্রাজ্যে ইসলামের উত্থান এবং ইসলামী চিন্তাধারার প্রভাব এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রার অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিল।

গোত্র, বর্ণ এবং সম্পদের ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল বৈষম্যের ধারণা। এগুলো অনেকাংশেই ইসলামী জীবনাদর্শের সাম্যের প্রেরণার স্পর্শে অন্তর্হিত

---

৬৭ দেখুন al Farra; *Fasl Shurut al Taah li al Imam* (The Relinquishment of Loyalty to the Imam), in Yusuf Ibish, উ: গ্র: পৃ: ২১৬-২১৮.

www.pathagar.com

হয়। তাছাড়া এ আদর্শের সামগ্রিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া হুমকীর সম্মুখীন হয়েছিল ঐ সমস্ত অনৈসলামিক সাংস্কৃতিক রীতিনীতির প্রভাবে যেগুলো পরবর্তী মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোর শাসনামলে আংশিকভাবে অস্তিত্বশীল ছিল। ক্ল্যাসিক্যাল জুরীগণের অনুসৃত আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি ও এ লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল।[৬৮] প্রাথমিক যুগের মুসলিম সম্প্রদায় অমুসলমিদের সাম্প্রদায়িক এবং আইনগত স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রতি মুসলিম দৃষ্টি ভঙ্গি ছিল নমনীয়, তারা পেয়েছিল সুস্পষ্ট আহনী বিধান এবং বিজয়ী শক্তির সংযত ও মার্জিত ব্যবহার। মুসলিম অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম ব্যক্তিত্বগণ যে উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন তা বিদ্যমান সম্পর্কের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটায়। এক্ষেত্রেও অবশ্য অমুসলিমদের প্রতি ইসলামী সাম্যের চেতনার উপলব্ধি প্রাথমিক যুগের প্রতিষ্ঠিত উদাহরণের গন্ডি ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। একারণেই ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনেও সাফল্য আসেনি।

মানুষের একটি প্রকৃতি (ফিতরাত) আছে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসের এবং সত্যের প্রতি এর অনুরাগ আহ্বানে সাড়া দেয়ার আছে। এর একটি ইতিবাচক দিক। আছে সাম্যের ক্লাসিক্যাল ইসলামী চেতনার সীমিত সাফল্য আছে এটাকে মানবতার চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে কুফরের নেতিবাচক দিকের পরিবর্তে ফিতরাতের ইতিবাচক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত করা যেত। তা করা উচিত ছিল। এ অবস্থার আজও তেমন ব্যত্যয় ঘটেনি। অবশ্য, মুসলিম বিশ্ব এবং ইসলামিক দাওয়া এ ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে বর্তমানে সক্ষম। এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য একথা বলা নয় যে ক্লাসিক্যাল সময়কালের মুসলিমগণ কুরআনের দায়িত্ববোধের সাথে সম্পর্ক হারিয়েছিলেন।

উমাইয়া শাসনামলে আংশিক ভাবে গোত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গোত্রবাদ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তাঁরা নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা উদ্ধারে লিপ্ত হয়। তাঁরা যোগাযোগের অনেক মাধ্যম ধ্বংশ করে। আইন বিদ্যার ক্লাসিক্যাল গবেষণা কর্মের পাঠকগণ আশ্চর্য না হয়ে পারেন না এই ভেবে যে, ঐ সময় ইসলামী দায়িত্ববোধকে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের সাথে তালগোল পাকানো হয়নি। সামাজিক ন্যায় বিচার, মানবিক সাম্য এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি আত্ম সমর্পণের ইসলামী আহ্বানকে রাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন গভীর এবং তীক্ষ্ণ দায়িত্ববোধ, চাই আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানবিক ঔদ্ধত্বপনা এবং অহমবোধের পুরোপুরি অনুপস্থিতি।

---

৬৮ দেখুন পরিশিষ্ঠ নোট ৪.

www.pathagar.com

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ এতদাঞ্চলে তাদের থাবা বিস্তার করে। এ সময় এতদাঞ্চলে বিরাজমান অমুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের প্রতি ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি নবাগত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য ভাবনার একটি নতুন উপাদন হিসাবে যুক্ত হয়। এ উছিলায় তারা মুসলিম দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অনুপ্রাণিত হয়। বিশেষ করে ওসমানীয় শাসনামলে বিরাজমান আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁরা এ সুযোগটি বেশী কাজে লাগায়।[৬৯] এখানে উল্লেখ্য যে ঐ সময়ে মুসলমানদের অবস্থাও অমুসলিমদের চেয়ে কোন অংশে উন্নততর ছিল না।

ক্ল্যাসিক্যাল চিন্তাধারা উম্মাহর ঐক্য চেতনার উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। কতিপয় গৃহযুদ্ধ এবং বৈদেশিক আক্রমণের মুখে এ দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম জনসাধারণের জন্য উপকার বয়ে এনেছিল সত্য, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের সর্বাত্মক আগ্রাসনের মুখে তা তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এর কারণ ছিল এ চিন্তাধারায় স্বচ্ছতার অভাব এবং উম্মাহর জন্য প্রয়োজনীয় ঐক্যের ধারণাকে বিশ্লেষনে ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে উস্কে দেয়। ফলে মুসলিমদের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতার বিষয়টি বাস্তবরূপ লাভ করেনি এবং এ জন্য কোন কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও গড়ে উঠেনি।

মুসলিম আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারায় গবেষণা হতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এ চিন্তাধারার উন্নয়ন ও প্রয়োগের লক্ষ্যে আরও অনেক কিছু করার আছে। মুসলিম জনগণের উন্নয়ন ও ব্যাপকতর অংশ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তাবলীর প্রতিষ্ঠাকল্পে অবিশ্বম্ভাবীরূপে প্রয়োজন আরও আন্তরিক এবং সুসংবদ্ধ প্রয়াস।

ক্ল্যাসিক্যাল চিন্তাধারার অবক্ষয়

মুসলিম ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে লেখকগণ কুরআন এবং হাদিসের কথা খুব কমই উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রায়শই মুসলিম সভ্যতার সোনালী যুগের বিচার বিভাগীয় মন্তব্য সমূহের প্রতি বেশী অঙ্গুলী নির্দেশ করেন। বিশেষ করে উল্লেখ করা হয় আব্বাসীয় শাসনামলের (৭৫০-১১০০ খৃঃ) কথা। এ সময়কাল হল বিশেষ বিশেষ জুরীগণের। এসময়েই প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধান চারটি সুন্নী মতবাদ। শায়বানী এবং আল মাওয়ারদী-সহ বহু খ্যাতনামা জুরীবৃন্দ এসময়েরই। পরবর্তীতে মুসলিম ক্লাসিক্যাল

[৬৯] দেখুন পরিশিষ্ট নোট ৫.

www.pathagar.com

চিন্তাধারায় *ইবনে তাইমিয়াহ* এবং *আল সুয়ুতির* মত প্রধান প্রধান জুরীবৃন্দ ও অন্তর্ভুক্ত হয়।[৭০]

আধুনিক কালের সমালোচকবৃন্দ এবং এসব মতবাদের অনুসারীগণ সাধারণত তাঁদের গবেষণা এবং বিশ্লেষণ ক্ল্যাসিক্যাল জুরীগণের সিদ্ধান্তের মধ্যে রাখে কেন্দ্রীভূত। কিরূপে এবং কি অবস্থার প্রেক্ষিতে জুরীগণ ঐ সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন সে বিষয়টির প্রতি তাদের চিন্তাভাবনা খুব কমই সম্প্রসারিত করেন।[৭১]

সমকালীন লেখকবৃন্দ ঐ বিষয়টির প্রতি খুব কমই মনোযোগী হয়েছেন যে, সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার জন্য ক্লাসিক্যাল জুরীগণ কিরূপ পদ্ধতি বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং বিরাজমান কিরূপ অবস্থার মধ্যেই বা তারা কাজ করেছিলেন। সমালোচকগণ ক্লাসিক্যাল মুসলিম চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করেছেন একটি আধুনিক পাশ্চাত্য মানদন্ডে। তাঁদের সমালোচনার শুরু হয়েছে মিথ্যা অনুমানের উপর ভিত্তি করে এবং এর ফলশ্রুতিতে তাঁরা উপনীতও হয়েছেন ভুল সিদ্ধান্তে। মাযহাব অনুসারীগণ যদিও আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে চেয়েছেন পুরাতন মানদন্ডে তাঁদের চিন্তাধারাকে সমুন্নত রেখে তবুও তাঁরা নতুন এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থাকে সম্পকভাবে উপলব্ধি করতে সফল হতে পারেননি। সুতরাং দেখা যায় যে, মুসলমানদের আবেগ অনুভূতিকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁরা (অনুসারীগণ) মুসলিম সামাজিক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে উদ্যোগী হলেও সে প্রচেষ্টা বাস্তব ও যুক্তি নির্ভর ছিল না বলে মুসলিম জাহানের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি।[৭১]

নিজেদের দুর্বলতা এবং সমস্যার ব্যাখ্যায় প্রভাব বিস্তারকারী বাহ্যিক উপাদানের উপরই বেশী গুরুত্ব দিতে মুসলিম লেখকদেরকে দেখা যায়। এটা সত্য যে মুসলিম দেশগুলোর বিষয় পাশ্চাত্যের আগ্রাসন ও নিয়ন্ত্রণ ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার জন্য এক দুর্নিবার চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থিত হয়। কিন্তু একই ভাবে এটাই এক বাস্তব সত্য যে, পাশ্চাতের আগ্রাসন মুসলিম চিন্তাধারার অবক্ষয়ের অনুঘটকের চেয়ে এর অন্তর্নিহিত

---

[৭০] দেখুন N. J. Coulson, *A History of Islamic Law*, পৃ: ৭৫-৮৫; M. Khadduri, "From Religious to National Law," in *Modernization of the Arab World*, ed. J. H. Thompson and R. D. Reischauer (New York: Van Nostrand, 1966), পৃ: ৪০-৪১; M. Y. Musa, *al Fiqh al Islami* পৃ: ২৭-৬১; এবং S. Ramadan, Islamic Law, পৃ: ২৭-৩০.

[৭১] দ্র: Fayez A. Sayegh, "Islam and Neutralism," in *Islam and International Relations*, ed. J.H. Procter, পৃ: ৯০-৯৩; M. Khadduri, *War and Peace*, পৃ: ২৬৮-২৯৬; Said Ramadan, *Islamic Law; Its Scope and Equity* (London: P.R. Macumillan Ltd., 1961); and W. al Zuhayli, *Athar al Harb fi al Islam*.

www.pathagar.com

দুর্বলতাগুলোকে উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রেই বেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। ক্লাসিক্যাল মুসলিম চিন্তাধারার অবসান হওয়ার বিষয়টি ছিল সময়ের ব্যপার মাত্র। মুসলিমদের জন্য অপেক্ষা করছিল এমন একটি সময় যখন তাঁরা কেবল কুরআন ও হাদিসের সম্পদ এবং মুসলিম জাতির গৌরবোজ্জল অতীত স্মৃতিকে বুকে জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে আগ্রাসন ভয়ঙ্কর হয়েছিল এ জন্য যে মুসলিম চিন্তাধরার অন্তর্নিহিত অবস্থা ছিল অতীব করুণ ও শোচনীয়।[৭২]

সনাতন মুসলিম মডেলের সীমারেখার গন্ডিতে লালিত ও অনুসৃত পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভরশীল স্থবিরতা এবং অনমনীয়তার খাচায় আবদ্ধ মুসলিম মন মানসের মুখোমুখি এসে দাড়িয়েছিল বিজ্ঞান ভিত্তিক যৌক্তিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত গতিশীল ধ্যান ধারণা এবং সুনিপুন পদ্ধতির অস্ত্রে সজ্জিত। বাস্তবতার সাথে মুসলিম চিন্তাধারার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। যুগের চাহিদা এবং নবতর পরিবর্তনের আলোকে পুনর্জাগরিত ও পুনরুদ্দীপিত হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। বিতর্ক প্রবণতা এ চিন্তা ধারাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। প্রতিরোধমূলক বনাম আক্রমণাত্মক যুদ্ধ, ব্যক্তিগত বনাম সীমান্ত আইন, নিরপেক্ষতা বনাম নিরপেক্ষকরণ- এসব বিষয়ই ছিল তর্কের বিষয় বস্তু। নতুন সংকট উত্তরনের দাবী ছিল নতুন নতুন পদ্ধতি এবং উপায় উপাদান আয়ত্বে আনা ও প্রয়োগ করা।

আধুনিক পরিবর্তন ঃ পদ্ধতি বিজ্ঞানের অভাব

মুসলিম চিন্তাধারার পটভূমি, কারণ এবং আগ্রহ উৎঘাটনের প্রচেষ্টা আমাদের বিশ্লেষণের পথ ধরে অগ্রসর হলে যে কেউ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম চিন্তাধারার আধুনিক পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণের কাজকে কম সমস্যা সংকুল হিসাবে পাবে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে বিপরীত দৃষ্টিকোণের উন্মেষ ঘটেছে। এসেছে সুস্পষ্ট মোড় পরিবর্তন। কি কারণে কি পটভূমিতে এবং কি অবস্থায় এসব দৃষ্টিভঙ্গির উত্থান ঘটেছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে এ মোড় পরিবর্তন এবং বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিগুলো অনুধাবন করা খুবই কষ্টকর হবে।

বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম চিন্তাধারায় কতিপয় পরিবর্তন আসে অমুসলিম ইউরোপীয়দের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবস্থায়। কিছু পরিবর্তন সংঘঠিত হয় নিয়ন্ত্রণের হুমকিতে। এ পরিবর্তন সমূহের কতিপয় আত্ম সমর্পনের রূপ পরিগ্রহ করে শক্তিশালী

---

৭২. দেখুন Hisham Sharabi, "Islam and Modernization in the Arab World," inThompson and Reishaurer, উ: গ্র: পৃ: ৩২-৩৪; T. Naff, "The Setting and Rationale of Ottoman Diplomacy in the Reign of Selim III (1789-1807), পৃ: ২৮; and W. M. Watt, উ: গ্র: পৃ: ২২৫.

www.pathagar.com

এবং নিয়ন্ত্রণকারী বৈরী শক্তির বেদীমূলে।

আর কতিপয় পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে মুসলিম ভূমিতে অবস্থানকারী বৈরী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিদ্রোহরূপে। এসব দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ছিল উদারনীতিবাদ, শান্তি, স্বাধীনতা এবং সহনশীলতার প্রতি ক্ষমা সুন্দর আবেদনে অলংকৃত। এসব বৈশিষ্ট্য উন্নয়নে অবদান রেখেছেন অভিজাত মুসলিম শাসক শ্রেণী এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এ দুইটি শ্রেণীই ছিল ইউরোপীয় চিন্তাধারা এবং কর্তৃপক্ষের প্রভাবাধীন। তারা একই সাথে লজ্জিত ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতায়।[৭৩] অভিজাত ওসমানীয় শাসক শ্রেণী এবং এর উনবিংশ শতাব্দীর *তানজিমাত* এবং *তাহজাবী* (১৮০-১৮৭৩) এর সময়ের যে সব বুদ্ধিজীবী ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রেই এ বৈশিষ্ট্য আদর্শরূপ গ্রহণ করে।

এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে অভিজাত এবং বুদ্ধিজীবীগণ ইসলামিক ছিলেন কি অনৈসলামিক ছিলেন- বিষয়টি এখানে তা নয়। আসল ব্যাপারটি ছিল প্রকৃতপক্ষে জিহাদের আক্রমনাত্মক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলিম জাতির উপর পাশ্চাত্যের যে নিয়ন্ত্রণ তার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া তাঁদের জন্য সহজ হয়েছিল। কিন্তু নিরংকুশ ইউরোপীয় প্রভাবই ছিল উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে আশু প্রেরণার উৎস। শান্তি, সহযোগিতা এবং সহনশীলতার উপর মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণের গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি ছিল প্রাথমিক ভাবে একটি মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র। এ অস্ত্রের মাধ্যমে তারা বিদেশী যালেমদের উপর নৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী ছিলেন। এর অপর উদ্দেশ্য ছিল স্বয়ং মুসলিম জাতিসমূহের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন।

এ উদার দৃষ্টিভঙ্গির আরও লক্ষ্য ছিল একই দেশের ভূ-খন্ডে বসবাসরত মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠীকে একটি ঐকবদ্ধ জাতীয় ফ্রন্টের পতাকাতলে সমবেত করা যাতে ধর্ম ও সাম্প্রদায়ের শ্রেণীভেদের ধূয়া তুলে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীকে বৈরীশক্তি কর্তৃক ব্যবহারের সুযোগ সীমিত হয়। মুসলমানদের উপর অমুসলিমদের শাসনের সময়টি ছিল চরম সংকটের এবং বেদনা মিশ্রিত। উদার দৃষ্টিভঙ্গি এ সংকটের ধাক্কা শামালমলে উঠার জন্য ছিল অনুকূল। এ দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে অবিবেচনাপ্রসূত সংঘাতের পথ পরিহার করে চলার ক্ষেত্রেও সাহায্য করে। ইউরোপীয়দের মোকাবেলা করার জন্য এবং কিছু মৌলিক সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য এতে মুসলিমগণ প্রয়োজনীয় অবকাশ প্রায়। এ আলোকে আমরা লোকজনের চিন্তাধারা এবং অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারি। এ প্রসংগে মিশরের ইমাম মুহাম্মদ আবদুহ্ এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে, শরীয়তের আইনের ক্ষেত্রে এবং ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অনুরূপ

---

[৭৩] দ্র: পরিশিষ্ট নোট- ৬.

www.pathagar.com

চিন্তা চেতনার ছাপ রেখেছেন। তাছাড়া বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সাথেও তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। অবশ্য এ যুক্তিরও অবতারণা করা যায় যে আবদূহ যে অবস্থান নিয়েছিলেন তা বৃটিশদের জন্য মিশরে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থাকে অনেক সহজতর করে দেয়।[৭৪]

এ অমুসলিম সম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণের প্রতি আর এক প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্য ছিল মুসলিম ভূ-খন্ডকে স্বাধীন করা। জনগণ এ আন্দোলনের সাংগঠনিক রূপ দান করে এবং তা পরিচালিত হয় সনাতন মুসলিম নেতৃত্বে। উদাহরণ স্বরূপ সুদানের মাহদী আন্দোলনের কথা উল্লেখকরা যায়। আরও উল্লেখ করা যায় সৈয়দ আহমদ বেরলভী এর জিহাদ আন্দোলন এবং ভারতবর্ষে ইসমাইল শহীদ (রাঃ) পরিচালিত আন্দোলনের কথা। এ সমস্ত আন্দোলন সম্পূর্ণ বৈরী অবস্থান গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এ সমস্ত আন্দোলন বেরী শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দেয়। এ ক্ষেত্রে মোটামুটি জিহাদকে তাঁরা ক্ল্যাসিক্যাল ধারায় গৃহীতঅর্থে ব্যবহার করে। জিহাদের সে অর্থে মুসলিমদের উপর আক্রমণকারী অমুসলিম অপ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু বিশ্বকে ঠিক করার জন্য জিহাদের এ যুদ্ধ হুংকার ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেয়ার অনুরূপ। এরূপ অভিযানের আহ্বান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া ছিল অনিবার্য। কারণ সাফল্যের জন্য যেসব শর্তাবলী আবশ্যক তার খুব নগণ্য সংখ্যকই তখন বর্তমান ছিল। প্রয়োজনীয় এসব শর্তবলীর মধ্যে সমকালীন ধারায় মুসলিম চিন্তা ধারার বিকাশও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৭৫] ভারতবর্ষের সৈয়দ আহমদ বেরীলভী আলজোবিয়ার আবদুল কাদের আল জাজাইরী এবং সুদানের মুহাম্মদ আলমাহদী এর ন্যায় ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পরিচালিত সনাতন ধাঁচের নেতৃত্বে সামরিক জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জনগণের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম চিন্তাধারা এবং নেতৃত্বের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ দুর্বলতা ধরা পড়ে তখন, যখন সংগ্রামে অবতীর্ন মুসলিম নেতৃত্ব তাদের প্রতিপক্ষ শক্তি আধুনিক ইউরোপের প্রযুক্তি এবং ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোর মুখোমুখি এসে দাড়ায়।

সরকারের আভ্যন্তরীণ সংস্কার, স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং

---

৭৪ দেখুন A. Hourani, উ: গ্র. পৃ: ১৫৭-১৬০; Muhammad Husayn, *al Islam wa al Hadarah al Gharbiyah* (Beirut: Dar al Irshad, 1963), পৃ: ৯১-১০৪; and W. C. Smith, *Islam in Modern History* (Princetion University Press, 1957), পৃ: ৫৫-৭৩.

৭৫ দেখুন Mas ud al Nadwi, *Tarikh al Dawah al Islamyah fi al Hind* (The History of the Call to Islam in India) (Beirut: Dar al 'Arabiyah, n.d.) পৃ: ১৬৭-১৭৭, ২৬৫-২৮০; Shakib Arsalan, *Li Madha Taakhkhara al Muslimun wa Li Madha Taqaddama Ghayruhum?* (Why are Muslims Declining while Others Are progressing?) Beirut: Dar Maktabat al Hayah, 1965), পৃ: ৪৩-৫৫, ১৪৯-১৬১; এবং W. C. Smith, উ: গ্র: পৃ: ৮৯-৯২.

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য শক্তির সাথে সহযোগিতাও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে উদারপন্থী উদ্যোগও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৭৬] বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে শুরু হয় চরমপন্থী পূর্বোক্ত আন্দোলন। তখন আরবরা তাদের তুর্কী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে তারা মিত্রশক্তির সাথে হাত মিলায়। কিন্তু প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হয়নি। তারা ম্যানডেট সিস্টেম এর নামে ইউরোপীয় দখলদারদের কবলে চলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। অবশ্য কতিপয় মুসলিম দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্য উদারনীতিবাদ, পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান এবং পাশ্চাত্যের সাথে সহযোগিতার বিষয়ে মোহমুক্তি ঘটায়। ইউরোপের কবল হতে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতি অর্জনের জন্য উদারনীতিবাদকে মনে করা হত এক জাদু কবচ। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যগুলো অর্জনে এ কবচও ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে মুসলিম দেশগুলোতে পররাষ্ট্র বিষয়ে নতুন প্রবণতা বিকশিত হতে দেখা যায়। এ প্রবণতা পাশ্চাত্যের সাথে শান্তি লাভের স্বপ্ন ত্যাগ করে সরাসরি সংঘাতের পথে অগ্রসর হয়। আরবদেশগুলো ফিলিস্তিন প্রশ্নে জড়িত হয়। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম আরবগণ ইউরোপীয় দখলদারীত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নেদারল্যান্ডের বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীন মুসলিম দেশগুলো জাতিসংঘে যোগদান করে। তারা তাদের সদস্যপদকে পাশ্চাত্য আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের অনুকূলে ব্যবহার করে। এ শিক্ষা এবং আফ্রিকার উপর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণের অবসান কল্পে ও তারা এ সুযোগ ব্যবহার করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি লগ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি বিশ্বশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম দেশগুলো বিশেষ করে আরবগণ তাদের লক্ষ্য অর্জনে সোভিয়েত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরী সাহায্যের সুযোগ গ্রহণের প্রচেষ্টা চালায়। এসব নতুন অগ্রগতি উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অবসানকে তরান্বিত করার সূচনা করে। এ সময়ে মুসলিম চিন্তাধারায় মার্কসীয় তত্ত্বের কিছু উপাদন সংযুক্ত হতে থাকে।

---

[৭৬] দেখুন A. Hurani, উ: গ্র: পৃ: ৩৪১-৩৭৩; Bernard Lewis, *The Emergence of Modern Turkey*, ২য় সংস্করণ (London: Oxford University Press, 1968) পৃ: ১২৪-১২৮; H. A. R. Gibb,"The Reaction in the Middle East Against Western Culture," in *the Contemporary Middle East*, ed. B. Rivlin and J.S. Szyliowicz, পৃ: ১৩২-১৪০; Abu al Ala al Mawdudi, Hasan al Banna, and Sayyid Qutub, *al Jihad fi Sabil allah* (Beirut: Ittihad al Munazzamat al Tullabiyah, 1970), পৃ: ১০৩-১৩৪; M. Khadduri, উ: গ্র: পৃ: ২৯৪-২৯৬; M. al Mubarak, *al Fikr al Islami al Hadith*, পৃ: ৫০-১৩১; Nadav Safran, *Egypt in Search of Political community* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1961), পৃ: ১৮১-২৫৮; T. Naff, *Th Setting and Ratonale of Ottoman Diplomacy*, পৃ: ২৭-২৮; W. C. Smith, উ: গ্র: পৃ: ৫৮-৮৯; W. M. Watt, *Islamic Political Thought*, পৃ: ১১৮-১১৯.

www.pathagar.com

এসব উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের ধারণা (জিহাদের একটি আধুনিক রূপ)। কিন্তু মার্কসীয় আদর্শের পরিভাষাগুলোর উৎপত্তি হল এমন এক দর্শন থেকে যা সনাতন ইসলামী আদর্শের বিপরীত।[৭৭]

মুসলমানদের বিশ্বাস হল এক আল্লাহতে যিনি ন্যায়পরায়ন ও সার্বভৌম। ইসলামী আদর্শের ভিত্তি এ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপরপক্ষে মার্কসের দর্শন প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী সংগ্রামের ধারণার উপর। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক মুসলিম চিন্তা ধারায় মার্কসের দর্শনের প্রভাব ছিল খুবই সামান্য। এ মতবাদের পরিভাষাগুলো ছিল সাধারণত ক্রমবর্ধমান বিভ্রান্তির একটি উৎস। এটা মুসলমানদের নিকট কখনই পরিষ্কার ছিল না যে কাকে স্বাধীন হতে হবে এবং কেন। আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে এবং ইয়ামেনের গৃহযুদ্ধে মার্কসীয় পরিভাষা জিহাদের একটি অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। মার্কসীয় দর্শনের প্রভাবে সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্যে উদগ্রীব অনুভূতিকে জোরদার করে। কিন্তু এ দর্শন আভ্যন্তরীণ সংহতিকে দুর্বল করতে সাহায্য করে। এটা করা সম্ভব হয়, পুরাতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবের জন্য একটি কার্যকর যৌক্তিকতার প্রবর্তন করে। সমকালীন মুসলিম জুরী এবং চিন্তাবিদগণ মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাহলে আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হত। সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে মুসলমানদের কার্যকর অংশ গ্রহণের বিষয়টিও অগ্রগতি লাভ করতো। মুসলিম জুরী এবং চিন্তাবিদগণের উপর বৈরী পাশ্চাত্য উদারপন্থী এবং মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রভাব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রকৃত বিকাশে কোন অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি।

এ পর্যায়ে এটা উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণভাবে মুসলিম চিন্তাধারার স্থবির অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে মুসলমানদের প্রকৃত ক্ষমতা ও প্রভাবের অভাবে সমকালীন ইসলামী গবেষণা কর্মে একটি বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এর গুরুত্ব খুবই কম।[৭৮] আমাদের আলোচনায় এ পর্যায়ে এটা অনুধাবন করা জরুরী যে, শান্তি, সহনশীলতা, প্রতিরোধমূলক জিহাদ, আক্রমণাত্মক জেহাদ, স্বাধীনতার জন্য জিহাদ- এর কোনটিই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সম্পৃক্ত করার জন্য এবং এ বিষয়ে

---

[৭৭] দেখুন 'Abd al Hamid Siddiqi, *Tafsir al Tarikh, kazim Jawwad* (trans.), (Kuwait: al Dar al Kuwaitiyah, n.d.) পৃ: ৮৭-১৬২; A. K. Brohi, Islam in *the Modern World,* (Karachi: Chiragh-i-Rah Publications, ১৯৬৮) পৃ: ৬৯-৯১: H. A. R. Gibb, ঊ: প্র: পৃ: ১৩২-১৪৯; Jihad Qalaji, *al Islam Aqwa* (Kuwait, Dar al Kitab al 'Araabi, n.d.), পৃ: ৯৭-১৬৭; Khalifa Abdul Hakim, *Islam and Communism,* 3rd ed. (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1962), পৃ: ৪৩-৬৭; M. Rafluddin, Ideology of the Future, 3rd ed. (Lahore: Ashraf, 1970), পৃ: ৩৫৫-৪০০, ৪১১-৪৮১; and Muhammad al Ghazaili, *al Islam ft Wath-al Zahf al Ahmar* 9Kuwait : Maktabat al Amal, n.d.), পৃ: ২০-৫৮.

৭৮ দ্র: পরিশিষ্ট নোট ৭ এবং ৮.

www.pathagar.com

অবদান রাখার লক্ষ্যে কোন সফল অথবা সন্তোষজনক ভিত্তি প্রদান করেনি। মুসলিম জনগণ এবং তাদের সরকারগুলোর বাস্তব আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কার্যক্রম পরিচালিত হয় বহির্বিশ্বে প্রচলিত আধুনিক পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও অনুসৃত পদ্ধতির সঠিক উপলব্ধির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরিলক্ষিত হয় অনুসৃত পদ্ধতিতে সক্রিয় এবং কার্যকর অংশ গ্রহণের অভাব। ফলশ্রুতিতে মুসলমানগণ নিরপেক্ষতা এবং উত্তেজনা প্রশমনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আলোচনার দ্বারা আধুনিক পদ্ধতি হতে তেমন কিছু অর্জন করতে পারেনি। কারণ সমস্যাটি পরিসরে খুবই ব্যাপক। এটা হল আধুনিক মুসলিম চিন্তাধারার সংকট।

মুসলিম চিন্তাধারায় বিকশিত এসব নতুন মাত্রার মাধ্যমে যেসব সমস্যা পরিদৃষ্ট হয় সেগুলোকে মুসলমানদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। প্রশ্ন হল, নতুন পরিস্থিতির সাথে তারা কিভাবে খাপ খাওয়াতে পারে এবং কিভাবে নতুন ধ্যান ধারণা, প্রতিপক্ষের চিন্তাভাবনা এবং সনাতন চিন্তাধারার সর্বোত্তম ব্যবহার করা যায়।

ক্লাসিক্যাল যুগের মুসলিম সমাজে জিহাদের মহান আবেদন ছিল একটি শক্তিশালী গতি সঞ্চারক উপাদান হিসাবে। কিন্তু সে কাঠামোর আবেদন বর্তমানে আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের জন্য তেমন ফলপ্রসূ হবে না। উদারতাবাদী অথবা মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক আবেদন হল মূলত বিপরীত দর্শন ও ইতিহাস যা সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং পাশ্চাত্য মানদন্ডের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর যে কোন একটি হতে সৃষ্ট কোন ধারণা ইসলামী উম্মাহর আভ্যন্তরীণ বিবেক বোধ ও ব্যক্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হলে এগুলো আরো আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের জন্ম দিবে নিঃসন্দেহে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ অবস্থা মুসলিম উম্মার জন্য আরও বেশী ক্ষতিকর হবে। এ ক্ষতি বর্তমানের প্রয়োজন ও অবস্থার পুনর্গঠনের মুসলিম উম্মাহর যে রূপ অবদান রাখা ও প্রতিক্রিয়া করা দরকার সেরূপ করার ক্ষমতাকে আরও হ্রাস করবে।

মুসলিম চিন্তানায়কগণের এটা ভাল করে উপলব্ধি করা উচিৎ যে আধুনিককালে ক্লাসিক্যাল অথবা সনাতন চিন্তাধারার সমস্যা কোন বিশেষ অথবা বিস্তারিত মতের প্রেক্ষিতে বুঝা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন আধুনিক বিশ্বকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা। এ বিশ্বকে সনাতন মনমানসিকতা ও ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এভাবে সমস্যাটি একটি পদ্ধতি বিজ্ঞানের স্তরে এসে যায়। এ পদ্ধতি বিজ্ঞান হতেই পাওয়া যাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং সমাধান। পাওয়া যাবে সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ক্লাসিক্যাল মুসলিম চিন্তাধারার কলাকৌশল। উসুল পদ্ধতি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এটা অত্যন্ত পরিস্কার যে মুসলমানগণ এ পদ্ধতি বিজ্ঞানের কোন রূপ সমালোচনামূলক পুনর্মূল্যায়ন করেনি। আধুনিক বিশ্বকে অনুধাবন করার লক্ষ্যে এবং মুসলমানদের এর উপযোগী করার জন্য প্রয়োজন ছিল উসূলের যথাযথ পুনর্মূল্যায়ন। ইসলামী চিন্তাধারার মৌল অভিগমন আইনী ধারায় চলতে থাকে। বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন তালফিক (খন্ড খন্ড

www.pathagar.com

অংশজুড়ে একত্রি করা) এর সাথে ইহা খাপ খাইয়ে নেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতিপক্ষের মানদন্ডে নিজেদের উন্নীত করা এবং ঐতিহাসিক কাজ ও অনুসৃত নীতি পদ্ধতিকে আধুনিক কালের নিরিখে যৌক্তিক ভাবে উপস্থাপন করা।[৭৯] মুসলিম জুরী ও চিন্তানায়কগণ নিজেদের কাজ কর্মে স্থবিরতা প্রদর্শন করেন। কারণ তাঁরা মুসলিম চিন্তা ভাবনার উৎসমূলে ফিরে যেতে ব্যর্থ হন। তারা তাঁদের পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের পুনঃপরীক্ষণ এবং সংস্কারের আত্মনিয়োগ করতে ও ব্যর্থ হন।[৮০] এমতাবস্থায় কোন সমন্বয় শৃংখলায়ন, ঐকমত্য, মৌলিকতা অথবা উৎপাদনশীলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ অবস্থার অনিবার্য দাবী হল মুসলিম চিন্তাধারায় পদ্ধতি বিজ্ঞানের সমস্যাটি পরীক্ষা করে দেখা। দৃষ্টিকোণ এবং পদ্ধতি বিজ্ঞানের সমস্যাগুলো সন্তোষজনকভাবে বিশ্লেষণ করা হলে মুসলিম বহিঃসম্পর্কের নতুন ভিত এবং দিক নির্দেশনা লাভ করা যাবে।

---

[৭৯] আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সমসাময়িক মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তা কেবলমাত্র সরাসরি এ সংক্রান্ত লিখিত রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নবী জীবনীও এ ক্ষেত্রে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ উৎস। উল্লেখ্য যে বর্তমানে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সুনির্দিষ্ট রেফারেন্স দেয়া শুরু হয়েছে, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা খুবই নগণ্য। See, দ্র: উদাহরণ স্বরূপ, Muhammad Hafiz Ghanim, *Mabadi al Qanun al Dawli al 'Ammah,* ৩য় সং (Cairo: Matba at al Nahdah, 1964), পৃ: ৫০-৫৫, দ্র: আরও 'Ali Mansur, *Muqaranah Bayn al Shariah al Ilamiyah wa al Qauanin al Wadiyah,* (Betrut: Dar al Fath, 1968), খ. ১১. পৃ: ১৪০-২৩৫; Muhammad Ahmad Ba Shumayl, *Banu Qurayzah,* পৃ: ২৩৬-২৮৩: M. Hamidullah, *The Muslim Conduct of State,* পৃ: ৭-৮; W. Zuhayli, উ: গ্র: পৃ: ১৪-২৭.

[৮০] 'উসূল' এর উপর সমসাময়িক অধিকাংশ লেখাই বর্ণনামূলক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্লেষণ ও সমালোচনা সীমাবদ্ধ থাকে সুন্নাহর যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন এবং নতুন ইজতিহাদের আহ্বান জানিয়ে। সুতরাং উসূলের উপর সমকালীন অনেক লেখাই বর্ণনা মূলক বিশ্লেষন এবং সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর যোগ্যতার প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং নতুন জিহাদের একটি স্বাধীন আহ্বানের মধ্যে দ্র:

A. Khallaf, *'Ilm Usul al figh* (Kuwait: al Dar al Kuwaytiyah, 1968), পৃ: ৮-১০; A. Khallaf, *Khulasat Tarkh al Tashri,* পৃ: ১০৩-১০৪; A.Khallaf, *Masadir al Tashir, al Islami,* ৩য় স. (Kuwait: Dar al Qalam, 1972), পৃ: ৫-১৮; Anwar Ahmad Qadri, Islamic Jurisprudence in the Modern World; *A Reflection on Comparative Study of the Law* (Bormbay: N. M. Tripathi Pvt. Ltd, 1963), পৃ: ৫৫-৮১, ৩০৫-৩২৪; Fazlur Rahman, *Islamic Methodology,* পৃ: ৫-৮. ১-৮৪, এবং 175-191; M. al Mubarak, al Fukr *al Islami al Hadith,* পৃ: ৭-২৬, ১৫০-১৫১, এবং ১৮৬৭-১৯১; M. Y. Musa, al Fiqh al Islami, পৃ: ১৭৫-২০৬; and N.J. Coulson, *A Histong of Islamic Law,* পৃ: ১৮২-২১৮.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

পদ্ধতি বিজ্ঞানের সংস্কার

মুসলিম পদ্ধতি বিজ্ঞান বলতে 'উসূল'কেই বুঝায়। উসূলই হল মুসলিম আইন বিজ্ঞানের ক্ল্যাসিক্যাল পদ্ধতি বিজ্ঞান। উসূল পাশ্চাত্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য হতে উৎসারিত আইনের অনুরূপ নয়। মানুষের সামগ্রিক আচরণই উসূলের আলোচনার ক্ষেত্র। মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃসম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ক্লাসিক্যাল মুসলিম পদ্ধতি বিজ্ঞান হতে কেবল মুসলিম চিন্তাধারার গবেষণা পদ্ধতিই পাওয়া যায় না বরং এর তথ্য উৎসেরও সন্ধান লাভ করা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্ব ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিকশিত হয়। আর এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় *তাকলীদ* এবং *তালফীক* এর কৌশল।

এ প্রসংগে এইচ. এ. শারাবী বলেন, *ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইসলামী পুনর্জাগরণের সংস্কার আন্দোলন কোন বুদ্ধিবৃত্তিক পুণর্জাগরণ ঘটায়নি। এ আন্দোলন ছিল ইউরোপের সামরিক এবং রাজনৈতিক হুমকির প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিক্রিয়া। এমনকি ইউরোপীয় প্রভাব একটি সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জে রূপান্তরিত হওয়ার পরও এর প্রতি প্রদর্শিত প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ছিল নেতিবাচক এবং আত্মরক্ষামুলক।* এইচ. এ. আর গীব বলেন, *ইহা (জ্ঞান) এখনও কর্তৃপক্ষের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত; এবং যদি পশ্চিমা কর্তৃপক্ষকে এখন মুসলিম কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি স্বীকার করে নেয়া হয় এর ফলাফলও হবে চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।*

মালিক বেন্নাবী নিম্নোক্ত বর্ননার মাধ্যমে এ বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন"

আধুনিক (মুসলিম সাংস্কৃতিক) আন্দোলনের লক্ষ্য অথবা উপায় উপাদান কি এ সম্পর্কে বস্তুত পক্ষে এ আন্দোলনেই কোন বুঝ উপলব্ধি নেই। সমগ্র বিষয়টি নতুন জিনিষের জন্য নিছক একটি অনুরাগ বৈ কিছু নয়। এর সংস্কার আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল মুসলিম অনুকরণকারী এবং বিদেশী সভ্যতার মৌলিকত্ব বিহীন অনুসারী তৈরী করা।

ম্যালকম এইচ. কের (Malcom H. Kerr) বলেনঃ *বর্তমান কালের জাতীয়তাবাদী চেতনায় ঐ রূপ কোন নৈতিক দিক নির্দেশনা অথবা পরিচালনা নীতি*

www.pathagar.com

নেই। একজন লেখক (আলবার্ট হোরানী) বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করেন, বর্তমানে নিকট প্রাচ্যে সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য যে বিস্ফোরণ উন্মুখ উদ্বেগ বিরাজ করছে তাতেও এরূপ কোন নীতির বালাই নেই। যে পর্যন্ত এ আন্দোলন প্রাথমিকভাবে জাতীয়তাবাদের একটি শাখা এবং বক্তব্য হিসাবে প্রকাশ পাবে সে পর্যন্ত ইহা হতে কোন নীতি আদর্শ আশা করা যায় না।[১]

মুসলিম চিন্তাধারার সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনায় ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম পদ্ধতি বিজ্ঞানকে একটি জেনারেটর এবং ফিলটার হিসাবে বিবেচনা করে একে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। চিন্তাধারায় গতি ও প্রাণের সঞ্চার করার জন্য পদ্ধতি বিজ্ঞানের সঠিক উপলব্ধি একটি পূর্বশর্ত।[২]

বর্তমান যুগের মুসলিম নীতি নির্ধারণগণের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম একটি নতুন মুসলিম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন একটি মৌলিক এবং প্রয়োগযোগ্য রাজনৈতিক চিন্তা পদ্ধিত। এ প্রসংগে এখানে এইচ, এ, আর, গীব এর মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়, কুরআন এবং সুন্নাহ ইসলামী আইন ভাবনার ভিত্তি নয়, বরং এগুলো হল আইনী অনুমানের উৎস। প্রকৃত ভিত্তির অনুসন্ধান করতে হবে ঐ মনোভাবের মধ্যে যা এ উৎসগুলোর প্রয়োগ পদ্ধত নির্ধারণ করেছে। তিনি আর একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন; প্রকল্প (Hypothesis) পরিবর্তন করা না হলে অথবা নতুন কৌশল উদ্ভাবন না হলে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে একই ধারা অনুসরণ করতে হবে এবং উপনীত হতে হবে একই সিদ্ধান্তে।[৩]

মুসলিম পদ্ধতি বিজ্ঞান ঃ একটি স্থানকাল সমস্যা

মুসলিম চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে স্থান-কাল প্রসংগ একটি সমস্যা। এ প্রেক্ষিতে সমস্যাটি বিবেচনার পূর্বে সমস্যাটির প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন। স্থান কালের যেকোন স্তরে একটি সমাজের প্রয়োজন এবং যৌক্তিকতা প্রতিফলিত হয় সে সমাজের সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলোর সারবত্তা এবং কাঠামোর মাধ্যমে। স্থান-কালের পরিবর্তনের তালে তালে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তাৎপর্য ও গঠন প্রকৃতিরও পরিবর্তন হওয়া উচিৎ। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো যুগের দাবীর প্রতি সাড়া দিতে যে মাত্রায় ব্যর্থ হয় সে মাত্রাতেই স্থান-কালের সমস্যাও প্রভাবিত হয়। এ প্রেক্ষাপট

---

[১] দেখুন পরিশিষ্ট নোট- ৮.

[২] দেখুন পরিশিষ্ট নোট- ৯.

[৩] H. A. R. Gibb, *Muhammadanism: a Historical Survey*, ২য় সং (New York: Oxford University Press, 1962), পৃ: ৯১.

www.pathagar.com

সামনে রেখেই আমরা মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং পদ্ধতি বিজ্ঞানের বিচার বিবেচনা করবো। আমরা আরো আলোচনা করবো সমকালীন বিশ্বে মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে এ চিন্তাধারা এবং পদ্ধতি বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিষয়ক যে সুস্পষ্ট সমস্যা বিদ্যমান, সে সম্পর্কে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়নে ব্যবহৃত যেসব মৌলিক গ্রন্থ এবং পদ্ধতি রয়েছে, মুসলিম ক্ল্যাসিক্যাল পদ্ধতি বিজ্ঞান (উসূল) বলতে সেগুলোকেই নির্দেশ করা হয়। এ উৎসগুলো হল পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং *ইজতিহাদ* (শরীয়াহ এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মানবীয় যুক্তি অথবা জ্ঞানের ব্যবহার)। *ইজতিহাদের* অন্তর্ভুক্ত হল *কিয়াস* যা মুসলিম চিন্তাধারার চতুর্থ প্রধান উৎস। *ইজতিহাদের* অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সম্পূরক পদ্ধতিগুলো হল *ইসতিহসান* বা (আইনী অগ্রাধিকার)। *মাসলাহা* অথবা *মাসালিহ্ মুরসালাহ* (জনস্বার্থ) এবং *উরফ্* (কোন বিশেষ সমাজের রীতিনীতি)।[৪]

আমরা দেখতে পাই যে, *উসূলে* ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন হয়েছে।[৫] অবশ্য *কুরআনের* প্রসংগটি এ ক্ষেত্রে ভিন্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই *কুরআন* নিজকে প্রকাশ করেছে দার্শনিক নির্দেশনামূলক সার্বজনীন বক্তব্যের মাধ্যমে। ঐসব বক্তব্যে সে বিষয়গুলোও স্থান পেয়েছে যেগুলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট। স্থান কালের উপাদানটি সাধারণভাবে মুসলিম চিন্তাধারা এবং বিশেষভাবে *সুন্নাহর* গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এর অস্তিত্ব স্বয়ং *উসূলের* মধ্যে এবং যে পদ্ধতিতে এর প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ ঘটেছে তারমধ্যে। একদিকে *উসূলের* সমকালীন সংকীর্ণ সনাতনী পরীক্ষা নিরীক্ষা, অপরদিকে *হাদিসের* নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্নে আধুনিক প্রাচ্য বিশারদদের মাত্রারিক্ত গুরুত্বারোপ আমাদের দৃষ্টিকে আধুনিক মুসলিম চিন্তাধারার মৌলিক সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে নিবে অনিবার্যভাবে।[৬] ক্ল্যাসিক্যাল পদ্ধতি বিজ্ঞানের স্থান কাল

---

৪ A. Khallaf, 'Ilm *Usul al Flqh*, দ্র: 149; A. Khallaf, *Masadir al Tashri*, পৃ: ১৯-১০৩; Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* 9Oxford, UK: University Press, 1950), পৃ: ১২০-১৩০; Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hanbal: Hyatuhu wa 'Asruhu wa Fiqhuh* (Cairo: Dar al Fikr al 'Arabi), পৃ: ২৮৭-৩৩২; M. Abu Zahrah, Malik, পৃ: ৩২৪-৩৫৮; M. Abu Zahrah, *Tarikh al Madhahib*, পৃ: ৭৩-৩৫৯; al Shafi, *al Risalah*, পৃ: ২৮৮-২৯০; S. Mahmasani, *al Awda al Tashriyah*, পৃ: ১৫০-১৬০; এবং S. Ramadan, *Islamic Law*, পৃ: ২৩.

৫ কুরআনের ৬,০০০ আয়াতের মধ্যে ৮০ থেকে ৫০০ আয়াত আছে যেগুলো পারিভাষিকভাবে (সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে) 'আইনগত বিধি (Legal Rule) হওয়ার মানদন্ড পূরণ করে। বাকী আয়াতগুলোতে রয়েছে সাধারণ বিষয়ে বিপুল সংখ্যক নৈতিক উপদেশ ও অনুশাসন। যেমন, মানব ঐক্য, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অনাক্রমণ, আত্মরক্ষার অধিকার, সম্পদ বন্টন, বাণিজ্যিক লেনদেনে ন্যায্যতা দেখুন J.N. D. Anderson and N.J. Coulson, *Islamic Law in Contemporary Cultural Change*, পৃ: ১৪.

৬ H. Gibb, *Modern Trends in Islam*, পৃ: ১২৪.

www.pathagar.com

সমস্যাটি সঠিকভাবে বিবেচিত এবং নিরূপিত না হলে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সৃজনশীল এবং মৌলিক উপাদান ও পদ্ধতি বিজ্ঞানের শূন্যতা বিরাজ করবে এবং তা *তাকলীদ* এবং *তালফিকের* খাঁচায় আবদ্ধ হয়েই ঘুরপাক খেতে থাকবে।

মুসলিম চিন্তাধারায় প্রধান উসূলের ছাপ

মুসলিম আইন বিজ্ঞানের *উসূল* এবং এর ভ্রান্তিগুলো আলোচনার পূর্বে আমরা মুসলিম চিন্তাধারার রূপায়নে এবং মুসলিম আইন বিজ্ঞান (ফিক্‌হ) বিনির্মাণ এবং গঠনে মূল উসূলের ক্রিয়া, কৌশল এবং মৌলিক অবস্থানগুলো অনুসন্ধান করে দেখব।

ইসলামী আইন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র মানব জীবনের সামগ্রিক আচরণ।[৭] পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ আইন এবং পাশ্চাত্য আইন পদ্ধতি সেরূপ নয়। ইসলামী আইন কেবল বিশ্বাসের শাস্ত্রসিদ্ধ অনুশীলনকে বিস্তারিতভাবে যত্নের সাথে নিয়ন্ত্রণ করে না, এ আইনের অনেক নীতি-আদর্শের লক্ষ্যও হল ব্যক্তির বিবেকের নিকট আবেদন সৃষ্টি করা। কতিপয় কাজ আছে যেগুলো শ্রেণীভুক্ত অনুমোদিত হিসাবে এবং আরও কিছু কাজ আছে যেগুলো শ্রেণীভুক্ত তিরস্কার যোগ্য হিসাবে। এগুলো সম্পাদন করা এবং সম্পাদন না করার বিষয়টি নির্ভরশীল ঐশী অনুমোদন বা অননুমোদনের উপর। সে মতে এগুলোর ক্ষেত্রে আইনের কোন বিধান চাপানো হয়নি। জনপ্রিয় আন্দোলনগুলো এটা সুস্পর্কভাবে তুলে ধরেছে যে, শরীয়াহর আবেদন সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবী প্রতিষ্ঠায় শক্তি সঞ্চার করার জন্য এখনও একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।[৮]

এই সনাতন পদ্ধতি বিজ্ঞানের *(উসূল)* পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতীরেকে কোন চিন্তাধারা অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠান সুন্নী মুসলিম পন্ডিত বর্গের সমর্থন বা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। এ পরীক্ষায় অনোত্তীর্ণ সকল ধারণা এবং প্রতিষ্ঠান মুসলিম চিন্তাধারার জগতে বাহ্যিক বস্তু হিসাবেই পরিগণিত হবে। এর ফলশ্রুতিতে কেবল অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। এসব চিন্তাধারা এবং প্রতিষ্ঠান মুসলিম ব্যক্তি সত্ত্বা ও প্রেষণার অন্তস্থলে কার্যকর সম্পর্কহীন। মনস্তাত্ত্বিক সংকট তুলে ধরার জন্য আমি দুটি বিষয়কে তুলে ধরব। এ দুটি বিষয় বিবেচনা করেছেন একজন উপযুক্ত এবং স্বনাম ধন্য মুসলিম ব্যক্তিত্ব। তিনি রশীদ রিদা। এ ইস্যুগুলো হল স্বধর্মত্যাগ *(রিদ্দা)* এবং সুদ *(রিবা)*।[৯]

---

7 J. N. D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (New York: New york University Press, ১৯৫৯), পৃ: ৪.

৮ H. Gibb, *Muhammadanism,* পৃ: ১৯১-১৯২; সং J.N.D. Anderson and N.J. Coulson, উ: গ্র: পৃ: ১৪.

৯ দেখুন A. Hourani, *Arabic Thought*, পৃ: ২৩৭-২৩৮, A al Saidi, *al Hurryah al Dinyah,* পৃ: ৩০-৩৩, ১৬০-১৬১.

www.pathagar.com

স্বধর্ম ত্যাগের ক্ষেত্রে রিদা মুসলিম তথ্য উৎস *'উসূল'* প্রয়োগ করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে *ইজমা'* প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যান করেন এ জন্য যে, এটি *কুরআনের* কোন পরিষ্কার আয়াত বা বক্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বিপরীত পক্ষে, তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেনঃ *একটি বক্তব্য আছে যেটি ধর্মের ব্যাপারে যাবতীয় জবরদস্তি নিষিদ্ধ করে*। তিনি ইজমা প্রত্যাখ্যান করেন এই জন্য যে এটি একটি উচ্চতরের (উৎস বা পদ্ধতি) এর সাথে সংঘর্ষশীল। ব্যাংক সুদের ক্ষেত্রে ইউজারী (Usury) ইস্যু এর ব্যাপারে তাঁর পর্যবেক্ষণ হল মুসলমানগণ পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক বিদীর্ণতা এবং দলনের ভয়াবহতার মোকাবেলায় আছে। এই জন্য তিনি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুদ অনুমোদনের জন্য *দারূরাহ* (প্রয়োজনীয়তা) নীতিকে জাগ্রত করেন। রিদা অথবা জামাল উদ্দিন আফগানী এবং আল আজহারের গ্রান্ড ইমাম মাহমুদ শালতুত এর প্রামাণ্য রচনাবলীর কোনাটাই *দারুরাহ* এর ভিত্তিতে সূদের বিষয়টি স্থায়ীভাবে মিমাংসা করতে পারেনি। এ ইস্যুটি এখনও উত্তেজনা এবং বিতর্কের উৎস হয়ে আছে। এ অবস্থায় ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং সার্বিকভাবে সামগ্রিক অর্থব্যবস্থা দুর্বল ভিত্তির উপর পড়ে রয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়ে মুসলমানগণ আকাংঙ্ক্ষার দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে আছে।[১০]

অবশ্য এ রূপ একটি সংকটের সমাধান কোন নিয়ম মাফিক আইনানুগ *ফতোয়ার* 'হা বা না হালাল অথবা হারাম- এরূপ জবাব দ্বারা পাওয়া যাবে না। এর জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। নির্ধারিত সুদের হারের বিষয়টির উপর অন্যান্য সম্ভাব্য নিয়মমাফিক আইনানুগ অবস্থান ও অনুসন্ধান করা হয়েছে। এর পরও সকলক্ষেত্রে বাস্তবতায়ন এবং বিরাজমান বাস্তব অবস্থা হল এই যে, এর জন্য চাই কার্যপোযোগী বিকল্প। নিছক সেকেলে নীতির পুনরাবৃত্তিতে কাংঙ্ক্ষিত আচরণ সৃষ্টি সম্ভব নয় এবং সম্ভব নয় এ অস্থিরতা ও উত্তেজনার প্রশমন।[১১]

সুদ এবং স্বধর্মত্যাগের উপর রিদা এর উপসংহার তুলনামূলক আলোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, স্বধর্ম ত্যাগের উপর তার মতামত যথেষ্ট শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং সমর্থিতও হয়েছে ব্যাপকভাবে। সুদের ক্ষেত্রে অবশ্য সমস্যাটি সমস্যাই রয়ে গেছে। বরং এক্ষেত্রে আরও যুক্তি এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

---

[১০] দেখুন J. N. Anderson, উ: গ্র: পৃ: ৩.

[১১] কিছু উদাহরণের জন্য দেখুন : 'Abd al Hadi Ghanamah, "The Interestless Economy," inThe Contemporary Aspects of Economic and Social Thinking in Islam, the Muslim Students Association of the United States and Canada (Gary, In: The Muslim Students Association of the United States and Canada, 1970), পৃ: ৮৫-১০০; আরও দ্র: 'Abdul Hamid AbuSulayman, "The Theory of Economics in Islam: the Theory of Tawhid," in *The cContemporary Aspects of Economics and Social Thinking in Islam*, the M. S. A., পৃ: ২৬-৭৯.

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয় দুটির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য একান্তভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ পার্থক্যটি হল পূর্বোক্ত বিষয়টি সনাতন *উসূল* এর একটি নিয়ম মাফিক পরীক্ষা অতিক্রম করেছে। কিন্তু শেষোক্তটি তা করতে পারেনি।

প্রাথমিক ভাবে এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম ব্যক্তিত্ব এবং আধুনিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরাজমান জটিলতাসহ অবস্থানের তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আধুনিক ধারণা এবং প্রতিষ্ঠানগুলো *উসূল* পরীক্ষার ছাঁকুনী অতিক্রম করতে পারেনি। এগুলো বিজাতীয় মাধ্যম হিসাবেই রয়ে গেছে। এগুলো অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে *দারুরাহ* এর অসিলায়। একটি কার্যপযোগী সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্য নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে *তালফিকের* (ক্ষুদ্রাংশ একত্র করন)। এর ফলশ্রুতিতে সমকালীন মুসলিম চিন্তাধারার মৌলিকত্বের অস্তিত্বের প্রমাণ করা যায়নি। বরং এর মৌলিকত্বের অনুপস্থিতি নিয়ে অবস্থা চলতে থাকে।

এটা যদিও মনে হয় যে, মুসলিম চিন্তনের বিষয়বস্তুর লক্ষ্যে অনেক প্রয়াস নিবেদিত হয়েছে। কিন্তু পদ্ধতি বিজ্ঞানের সমস্যাটি সমাধানের জন্য সে তুলনায় তেমন কিছু করা হয়নি। এ অবস্থা নিয়ে গেছে বিদেশী ধারণা, আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠান ঋণ করার দিকে। এসব ধারণা, আদর্শ বা প্রতিষ্ঠানের কোনটাই দৃশ্যত মুসলিম চিন্তায় জীবনীশক্তির সঞ্চার করতে পারেনি। মুসলিম জন জীবনকে রূপান্তরিত করা হয়েছে এক ধরনের নাট্যমঞ্চে। মনে হয় এ নাট্যমঞ্চে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ডঃ জেকিল (Jekyll) এবং মিঃ হাইড (Hyde) এর ভূমিকায় অভিনয় করছে। কোন সময় তারা আবেদন জানায় ইসলামের প্রতি, কোন সময় নতি স্বীকার করে বিদেশী চাপের নিকট। এসব করে তারা আগ্রহী হয়ে পড়ে নৈরাজ্যের ভিতর দিয়ে বৈদেশিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োগ করার জন্য। এরূপ অভিনয় দেখে প্রথম সারির বোদ্ধা দর্শকবৃন্দ সানন্দ করতালির মাধ্যমে অভিনয় নৈপুন্যকে অভিনন্দন জানায়, অপরপক্ষে বিশাল জনতা পড়ে থাকে নিজ বাহুতে ভর দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায়।[১২]

পদ্ধতি বিজ্ঞানের আবশ্যকীয় সংস্কারের কাজটি আরও দুরূহ হয়ে পড়ে এই কারণে যে, সনাতনপন্থী এবং আধুনিক, উভয় শ্রেণীর সুধীবৃন্দই নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখেন ধর্মতত্ত্ব এবং হাদিসের বিশুদ্ধতার প্রশ্নের মধ্যে।

বুদ্ধিজীবী মহলের মধ্যে এই সুবিধাবাদী বিভ্রান্তিজনক পরিবেশের জন্ম হয় মূলত পাশ্চাত্যের সামরিক এবং রাজনৈতিক হুমকিতে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া হিসাবে। এ প্রতিক্রিয়ায়

---

12 দেখুন Malik Bennabi, *Wijhat al A 'lam al Islam*, p. 57; M. al Bahi, al *Fikn al Islami*, pp. 490-491; মিশরে ইস্যুকৃত জেহাদ বন্ড থেকে বুঝা যায় ইসলামিক এবং আধুনিকতার মধ্যে কি কি পার্থক্য পরিদৃষ্ট। Se al Ahram, April 17, 1971 পৃ: ৩. No. 30798 yr. 97.

www.pathagar.com

ফলশ্রুতিতে জন্ম হয় এমন এক ধরনের নব্য শিক্ষা ব্যবস্থার যা ছিল সুস্পষ্টরূপে সনাতন ধর্মীয় শিক্ষা থেকে ভিন্নতর। এ দুটি শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে দুই ধরনের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় *ওলামা* এবং *মুসাক্কাফুন* (ধর্ম নিরপেক্ষ এবং পেশাদার বুদ্ধিজীবী) উভয়ের গতিপথ, কাজকর্ম এবং দৃষ্টিভঙ্গি চলে দুটি স্বতন্ত্র ধারায়। এ দুটি গ্রুপের মধ্যে বিরাজমান দূরত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকে। ঐদিকে ধর্মনিরপেক্ষ দল অনুকরণ অনুসরণ করতে থাকে বিদেশী ধ্যান ধারণা, আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠানের। এমতাবস্থায় মুসলিম চিন্তাধারায় যে কোন সঠিক ও সম্ভাব্য সংস্কার উদ্যোগই প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অসম্ভব হয়ে পড়ে বিদ্যমান নতুন ধ্যান ধারণা অথবা প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত সংস্কারের সাথে সামঞ্জস্যতা বিধান।[১৩] *ইজতিহাদের* দরজা ব্যাপকভাবেই খোলা আছে বলে ঘোষণা করা হলেও এমন কি এ ঘোষণা আরও আগে থেকেই দেয়া আছে বলা হলেও- আমাদের ব্যর্থতা যে, আমরা এমন কোন কার্যকর আন্দোলন খুজে বের করতে পারিনি যার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার অথবা চিন্তাধারার ক্ষেত্রে আমরা পুনর্জাগরনের দিকে যেতে পারি।[১৪]

উপরে আলোচিত বিষয় থেকে এটা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় যে, সনাতন মুসলিম চিন্তাধারায় মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স (ফিক্‌হ) এর ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি কিরূপ ছিল। *উসূলের* কৌশলগত অবস্থান তখন কিরূপ ছিল-এ আলোচনা হতে তাও উপলব্ধি করা যায়। উসূলের ভূমিকা এবং এর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা কত গুরুত্বপূর্ণ তা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ার মধ্যেই যে মুসলিম জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সংকট নিহিত তাও এ আলোচনা থেকে বুঝা যায়।

পরবর্তী পদেক্ষপ হল *উসূলের* অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে দেখা। *উসূলের* প্রকৃতি, কাজ, কিভাবে আজও এগুলো প্রয়োজনীয় এবং কোন পদ্ধতিতে সমকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রয়োজনে এগুলো কাজে আসতে পারে সে সম্পর্কে এ আলোচনা থেকে সম্যক ধারণা লাভ করাই এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

উসূল ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি

উসূল ইন্‌সতিনবাত আল ফিক্‌হ-এ (তথ্য সূত্র, নীতি এবং পদ্ধতি আইন বিজ্ঞানের অবরোহের জন্য) চারটি মৌলিক *উসূল* আছে। *কুরআন* এবং *সুন্নাহকে আল আসলাইন*

---

13 H. Gibb, Modern trends in Islam, পৃ: ২২, ৭৩, ৮৪, ১০৪, ১০৭; W. M. Watt, Islamic Polttcal Thought: The Basic Concepts (Edinburgh, UK: Edinburgh University Press, 1968), পৃ: ১২৮-১২৯

14 দেখুন Fazlur Rahman, *Islamic Methodolgy in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), পৃ: ১৪৯; H. Gibb, উ: গ্র: পৃ: ২২, ৬০, ৭৩, ৮৪, ১০৪-১০৫; J. Anderson and N. Coulson, *Islamic Law in Contemporary Cultural Change,* পৃ: ৪৯, ৫৪; Malik Bennabi, উ: গ্র: পৃ: ৮৩-১৮৫,

www.pathagar.com

(দুটি উৎস) বলা হয়। কারণ এগুলো আইন বিজ্ঞানের টেক্সট বিষয়। *কুরআন সুন্নাহ* এবং *ইজমা* (ঐকমত্য) কে বলা হয় আল সালাআল উসূল (তিনটি উৎস)। এগুলো চতুর্থ উৎস *কিয়াস* (অনুরূপ) হতে স্বতন্ত্র। এটিও অথবা আইনী মতামতে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি হিসাবে স্বতন্ত্র। কারণ *কিয়াস* 'আকল' (যুক্তিযুক্ত করা) এর অন্তর্ভুক্ত। এটি মূল টেক্সট *কুরআন* এবং *হাদিসের* প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

কুরআন

ইসলামী চিন্তা এবং আইন বিজ্ঞানের প্রথম উৎস হল সরাসরি অবতীর্ণ আল্লাহর বাণী। এ অবতীর্ণ বাণীর ভাষা আরবী। *কুরআন* বিভক্ত ১১৪টি সূরায় (অধ্যায়)। এতে রয়েছে ছয় হাজারেরও বেশী সংখ্যক আয়াত। নবী করিম (সাঃ) এর জীবনের শেষ তেইশ বছরে (৬৩২ খৃঃ পর্যন্ত) তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয় আয়াতাকারে এই *কুরআন* স্বর্গীয়ভাবে। পশ্চিম আরবের মক্কা ও মদিনা নামক দুটি শহরে যখন তিনি বসবাস করছিলেন, তখনই নাজিল হয় এ *কুরআন*। পবিত্র *কুরআনের* লিখিত ভাষার বিশুদ্ধতা সকল বিতর্কের উর্দ্ধে।

ওয়াটের পর্যবেক্ষণ হল এটা পরিষ্কার যে, আশারীয়দের যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত মতবাদগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে স্বয়ং কুরআনের তাৎপর্যপূর্ণ ভাষার চেয়ে ছিল কম শক্তিশালী। অনেক মুসলমান প্রত্যাবর্তন করে কুরআনের প্রতি এবং হাম্বলী ধরনের মতবাদীয় বিন্যাসের প্রতি।

শরীয়াহ এর ভিত্তি *কুরআনের* মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। সরাসরি যোগাযোগ, ধর্মীয় শিক্ষা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে *কুরআন* মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিবেকের রূপদান করে।[১৫]

সুন্নাহ

মুসলিম জুরীগণের সংজ্ঞানুসারে নবীর (সঃ) *সুন্নাহ* হল ঐসব বিষয় যেগুলো নবী করিম (সঃ) এর বাণী এবং কাজ অথবা তাঁহার দ্বারা প্রকাশ্যে অনুমোদিত অন্যের কাজ

---

১৫ H. Gibb, উ: গ্র: পৃ: ৪৯-৫০; Ismail al Faruqi, "Islam," in *The Great Asian Religions: An Anthology,* compiled by Wing-tset Chan, et al. (London: Collier Macmillan Ltd., 1969), পৃ: ৩৩৬,; Muhammad ibn Idris al Shafi, *Islamic Jurisprudence: Shafiis Risalah,* translated with an intoroduction, notes and appendices by Majid Khadduri (Baltimore, MD; Johns Hopkins University Press, 1961), পৃ: ৬৬-৮০; Muhammad Izzat Darwazah, *Al Dustur al Quranift Shuiun al Hayah* (Cairo: Dar Ihya alKutub al 'Arabiyah, n.d.), পৃ: ২-৮০.

www.pathagar.com

বলে নির্ভরযোগ্য বিবরণে প্রকাশ। *সুন্নাহর* বিষয়বস্তু হল রাসূল (সঃ) এবং তাঁর দলের সদস্যদের জীবন এবং কর্ম। *হাদিসের* নির্ভরযোগ্য বিবরণের মাধ্যমে প্রকাশিত রাসূলের *সুন্নাহ* হল দ্বিতীয় *আসল* (উসূলের একবচন)। মুসলমানদের বিশ্বাস হল *সুন্নাহ* আক্ষরিক দিক দিয়ে না হলেও তাৎপর্যের দিক দিয়ে ঐশী প্রেরণায় স্নাত। আর *কুরআনের* ব্যাপারে বিশ্বাস হল অর্থ এবং ভাষা উভয় দিক দিয়েই তা স্বর্গীয়ভাবে অবতীর্ণ। কুরআনের ব্যাখ্যার সহায়তা এবং পরিপূর্ণতাদানই হল মূলত *সুন্নাহর* কাজ। ইমাম শাফীর অনবদ্য গ্রন্থ আল *রিসালা* (দি ম্যাসেজ) হতে রাসূলের সুন্নাহ বিষয়ে এই অবস্থানটি গ্রহণ করা হয়েছে।[১৬]

সুন্নাহর (হাদিস) সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং বিখ্যাত সংগ্রহ হল ছয়টি *সিহাহ* (প্রামাণ্য গ্রন্থ)। আল বোখারী (১৯৪-২৫০ হিঃ) এবং মুসলিম (২০২-২৬১হিঃ) এর দুটি প্রামাণ্য সংগ্রহ হল *সহিহান*। এগুলো সুন্নী জুরী এবং ওলামাবৃন্দ কর্তৃক ব্যাপকভাবে গৃহীত। এ দু'টি সংগ্রহ সংক্ষিপ্ত এবং খুবই প্রামাণ্য। অন্য চারটি *'সিহাহ্* হল ইবনে মাযাহ, আবু দাউদ, আল তিরমিজি এবং আল নাসাই এর চারটি 'সুনান'। ইমাম মালিকের *মুয়াত্তা* এর সুন্নাহ অংশ ও নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্নে-ঐ ছয়টি হাদিস গ্রন্থের মতই প্রায় একই মানদন্ডের নিরিখে উত্তীর্ণ। কিন্তু এটিকে ঐগুলোর ন্যায় *সুন্নাহর* সংগ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়না। কারণ এটি সংকলিত হয়েছিল প্রধানত আইন বিজ্ঞানের রচনার অংশ হিসাবে। কিন্তু এগুলোই *সুন্নাহর* একমাত্র সংগ্রহ নয়। হাদিসের আরও অনেক গ্রন্থ আছে। কিন্তু ঐগুলোকে এ ৭টি গ্রন্থের ন্যায় তত বিশুদ্ধ হিসাবে গণ্য করা হয় না। উপরোক্ত তথ্য হতে আমরা এ ব্যাখ্যায় উপনীত হতে পারি যে, মুসলিম চিন্তাধারায় সুন্নাহকে ঐশী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এর মধ্যে রয়েছে তথ্য উৎসের সমৃদ্ধ ভান্ডার।

সুন্নাহর বিষয়টি সুদীর্ঘ, বিশাল, জটিল এবং বিতর্কমূলক। বস্তুতপক্ষে *সুন্নাহ* পরিভাষাটি হতেই বিতর্কের শুরু। এর তাৎপর্য কি? এটা কি জাতির সুন্নাহকে (জীবন্ত সুন্নাহ) নির্দেশ করছে নাকি নবী করিম (সঃ) এর সুন্নাহকে ? নবী করিম (সঃ) এর সুন্নাহ কি ভাবে *কুরআন* এবং মুসলিম জাতির জীবন্ত *সুন্নাহর* সাথে সম্পর্কযুক্ত ? *সুন্নাহ* কিরূপ বিশুদ্ধ এবং সংক্ষিপ্ত ? *সুন্নাহকে* কখন দলিল আকারে লিপিবদ্ধ করা হয় এর কতখানি সংরক্ষিত হয়েছে ? রাজনৈতিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক উত্তেজনা ও সংগ্রাম কিরূপে এর বিশুদ্ধতাকে প্রভাবিত করেছে? *সুন্নাহর* প্রয়োগের সঠিক মানদন্ড কি? সমালোচনার

১৬ J. Anderson and N. Coulson, পৃ: ২৩-২৪; S. Mahmasani, *al Awda al Tashriyah*, পৃ: ২-৮০.

www.pathagar.com

আওতায় কি এর গঠন প্রকৃতি অথবা বিষয়বস্তু অথবা উভয়টি আসবে? ঐশী বাণীর মূল্যায়ন বা পরিমাপের জন্য মানুষ কতদূর যুক্তি প্রয়োগ করতে পারে?[১৭] এগুলো হল ঐ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কিছু কিছু যেগুলো তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর শাহাদাত (৬৫৬ খৃঃ) এর পর সৃষ্ট *ফিতনার* (গৃহযুদ্ধ) পরবর্তী সময় থেকে উত্থাপিত হয়। দৃশ্যত সুন্নাহ প্রশ্নটি ক্লাসিক্যাল ইসলাম কর্তৃক মিমাংসিত হয়েছিল।

রাসুল (সঃ) *সুন্নাহর* পক্ষে শাফী (রঃ) *এর রিসালাহ* গ্রন্থে তাঁর যুক্তির ফলশ্রুতি ছিল এইটি।[১৮] তাছাড়া মুসলিম পন্ডিত বর্গ সুন্নাহর পুংখানুপুংখ পরীক্ষা নিরীক্ষায় সে অসাধারণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন যে কারণে এরূপ হয়েছিল।[১৯] এর আরও একটি প্রধান কারণ ছিল। যে কারণে আল শাফীর পর সুন্নাহর বিষয়টি অগুরুত্বপূর্ণ এবং অবির্তকিত সমস্যা হিসাবে পটভূমিতে চলে যায়। এর কারণ শাফী (রঃ) এর সময় ইসলামী আইন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিতই হয়ে গিয়েছিল। এর মৌলিক বিষয়গুলো তখন মিমাংসিত। আইন বিজ্ঞানের কাঠামো স্থির হয়ে গিয়েছিল। এজন্য সুন্নাহ সম্পর্কীত বিতর্কের তখন তেমন কোন প্রভাব ছিল না। এটা হতে আমরা বুঝতে পারি যে, বিশুদ্ধতা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলী কেবল একাডেমী এবং ধর্মীয় ব্যাপারেই প্রতিফলন করেনি এবং বাস্তব রাজনৈতিক এবং মানবীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোরও এর মাধ্যমে প্রকাশ ঘটেছে।

সুন্নাহর সমস্যা সমাধানে দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভরশীল ছিল প্রয়োগকৃত পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পন্ডিতবর্গের যোগ্যতার উপর।[২০] সুন্নাহর বিশুদ্ধতার বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হয়েছিল এবং সুন্নী মুসলমানদের মানসিক কাঠামোর নির্দেশক সূত্রের অংশ বিশেষ

---

১৭ দেখুন D. S. Margoliouth, *The Early Development of Muhammadanism* (London, UK: Williams and Norgate, 1950), পৃ: ১-৫, ১১-১৩, ৩২৬, 329; Muhammad Abu Azhrah, *Tarukh al Madhanib al Islamyah* (Cairo: Dar al Fikr, n.d.), খ, ১১:৬৬-৬৯

১৮ দেখুন J. Anderson and N. Coulson, উ: গ্র: পৃ: ২২-২৪; এবং S. al Mahmasani, উ: গ্র: পৃ: ১৪৬

১৯ দেখুন H. Gibb, Muhammadanism, পৃ: ৮৫; Muhammad Habiballah, The Earliest Extensive Work onthe Hadith: Sahifat Hammam tbn Munabbih, trans. Muhammad Rahimuddin, ৫ম সং. ed. (Paris: Centre Cultural Islamique, 1961),পৃ: ১-৬৯; Muhammad Mustafa Azami, Studies in Early hadith Literature with a Ciritical Edition of Some Early Texts (Beirut: al Maktab al Islami, 1968), পৃ: ১-৬৯; Muhammad Mustafa Azami, Studies in Early Hadith Literature with a Critical Edition of Some Early Texts (Beirut: al Maktab al Islami, 1968), পৃ: ২৪৬-২৪৭, ১৬০, ২৬৮, ২৮৯-২৯২; S. Mahmasani, Op. Cit., উ: গ্র: পৃ: ১৪৭-১৪৯;

২০ Abu Bakr ibn Musa ibn Hazm al Hamadani, Kitab al Ibar fi al Nasikh wa al Mansukh min al Athar, ed. Ratib al Hakimi, (Hums, Syria: Matba at al Andalus, 1966), পৃ: ২৯, ২০০-২১০, ২১৮-২১৯ আরও দ্র: Salah al Din al Munajjid and Y. Q. Khuri, Fatawa al Iman Muhammad Rashid Rida (Beirut: Dar al Kitab al Jadid, 1970).

www.pathagar.com

হিসাবে এর তাৎপর্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যান্য মতবাদগুলো যেমন বিখ্যাত ইব্ন হাজম আল আন্দালুসীর *জহিরিয়া*-দৃশ্যপট হতে চলে যায় অথবা দূরবর্তী অঞ্চলে অদৃশ্য হয়ে যায়। অথবা শিয়া মতবাদের মত ক্ষুদ্র দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

বিগত কয়েক শতাব্দী যাবত মুসলিম বিশ্ব যে সমস্ত পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে সে সম্পর্কে যখন আমরা ধারণা লাভ করতে পারব তখন আমরা বুঝতে পারব কেন *হাদিসের* বিশুদ্ধতার প্রশ্নটি পুনরায় উত্থাপিত হয়েছে। আধুনিক এবং কতিপয় সংস্কারপন্থীর জন্য প্রথমত এটা ছিল সেকেলে সনাতন আইনী মতামত পরিহার করে চলার একটা উপায়। মুসলিম চিন্তাধারার সৃজনশীলতা অথবা উৎপাদনশীলতার পুনর্জাগরণে হাদিসের বিশুদ্ধতা, এর প্রত্যাখান, গ্রহণ অথবা যাচাই বাছাই এর বিষয়ের উপর সকল সম্ভাব্য অবস্থান বাস্তবক্ষেত্রে কেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে সেটি আমরা দেখাব। এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সুন্নাহর বিশুদ্ধতার পুনরুত্থিত বিষয়ের নামে সংশ্লিষ্ট মৌলিক ধারণাকে আমাদের সুস্পষ্ট করতে হবে।

বস্তুতপক্ষে সুন্নাহর বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে অবশ্যই বিপুল বিষয়ের পর্যালোচনা করতে হবে। কিন্তু হাদিসের বিশুদ্ধতার বিষয়টি কিরূপ অন্তসার শূন্য তা উপলব্ধি করার জন্য একই বিষয়ের উপর রচিত দুইটি বিপরীত ধর্মী রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করাই যথেষ্ট। এই দুইটি বিষয়ের একটি হল পরলোকগত স্ক্যাট এর প্রখ্যাত গ্রন্থ *"অরিজিন অব মোহাম্মডান জুরিসপ্রুডেন্সঃ* এবং অপরটি হল এম. এম আজমী এর *"স্টাডিজ ইন্ আরলী হাদিস লিটারেচারঃ-* যা মরহুম এ. জে. আরবেরীর তত্ত্বাবধান করা হয়েছে। আজমীর গ্রন্থের মুখবন্ধে আরবেরী লিখেন *সুন্নাহর বিষয়ে ডঃ আজমীর গ্রন্থ অতি উচ্চমান এবং পান্ডিত্যের সঠিক মানসম্পন্ন।* উপরে উল্লেখিত গ্রন্থগুলোর প্রত্যেকটি হতে দুটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি চিত্রটি পরিস্কার করবে। এ গ্রন্থ থেকে এটা একটা অন্তসারশূন্য প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। এবং পরিবর্তে আমরা নতুন উত্তর এবং দিকনির্দেশনার জন্য সামনে তাকাতে পারি।

গ্রন্থের শেষাংশে স্ক্যাট (Schactt) বলেন,[২১] *আমরা গঠন সময় কালের যে ধারণা লাভ করেছি তা সম্পূর্ণরূপে ঐ কল্প কাহিনী হতে ভিন্নতর যা হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম হতে পরবর্তী কালে দৃঢ়ভাবে দানা বেঁধেছে।* আজমী[২২] যেটাকে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে অভিহিত করেছেন, সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, স্কট *যে সমস্ত উদাহরণের অবতারণা করেছেন সেগুলো তাঁর নিজের তত্ত্বকেই নাকচ করে দেয়।*

---

২১ J. Schacht, উ: গ্র: পৃ: ৩২৯.

২২ M. Azami, উ: গ্র: পৃ: ২৪৭.

www.pathagar.com

"ইসনাদঃ এর ঘটনা, জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের তালিকায় লিপিবদ্ধ তথ্য প্রদানকারীদের সংখ্যা, পশ্চাৎ দিকে প্রতিফলনের তত্ত্বকে কৃত্রিম সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত করে এবং অনুরূপ বক্তব্যকে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে। ঐতিহ্যবাদীগণ আন্তরিকতার সাথে ভ্রান্তি এবং অমিল প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট সতর্কাবস্থা গ্রহণ করেছেন। [২৩]

কিয়াস ঃ (সদৃশ্য বর্ণনা)

ইসলামের ক্লাসিক্যাল সময়কালের অন্তর্নিহিত ধারণাগুলোর সঠিক উপলব্ধি ব্যতীত *কিয়াসের* ব্যাপক বিস্তৃত প্রয়োগ পদ্ধতি এবং যে সমস্ত বহুমাত্রিক অনুপূরক উসূল এর উদ্ভব ঘটেছে সেগুলোর প্রকাশ বিকাশ সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মহান খেলাফত জগতের বিখ্যাত শক্তি ছিল আব্বাসীয় শাসনামল। এ আমলের চিন্তা ধারা মূলত মহানবী (সঃ) কর্তৃক প্রণীত মডেলের সামাজিক পদ্ধতি এবং অর্জিত সাফল্য নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। সুতরাং মুসলিম চিন্তা ধারা এবং মুসলিম পদ্ধতি বিজ্ঞানের উপর ভূমিকা ছিল মূল মডেলের সংরক্ষণ।[২৪] এমতাবস্থায় কিয়াসের তাৎপর্য ছিল অতীতে অনুসৃত বিষয়ের সাথে বিশেষ করে নবী (সাঃ) এর সাথে নতুন উদ্ভূত বিষয়ের সাযুজ্য খুজে বের করা। ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম চিন্তাধারার সাফল্যের আরও একটি দিক হল কতিপয় অনুপূরক পদ্ধতির উদ্ভাবন। এক্ষেত্রে বিশেষ করে *মাসালাহ* এর কথা উল্লেখ করা যায়। সরাসরি *কুরআন* এবং *হাদিসে* বর্ণিত তথ্য অথবা ঐগুলোর সাথে তুলনা করে সব ক্রমবর্ধমান নব উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করা খুবই দূরূহ ছিল। সে বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি কল্পে ব্যবহৃত হত নতুন সম্পূরক পদ্ধতি *মাসলাহা*। *মাসলাহার* ব্যবহার সম্পর্কে *আল-মুজতাফা* গ্রন্থে একটি উদাহরণ আছে। উদাহরণটি দিয়েছেন এর লেখক আবদুল হামিদ আল গাজ্জালী। তিনি দেখিয়েছেন, যে সমস্ত ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য মূল (নাস) পাওয়া যায়নি, *মাসলাহা* এর ব্যবহার কেবল ঐ সমস্ত নব উদ্ভূত পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং ঐক্যমতের টেক্সটকে (ইজমা) অগ্রাহ্য করার একটি নীতি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে *মাসলাহা*। এরূপ ব্যবহার অসুবিধা জনক ও

---

২৩ 'Abd al Wahhab Khallaf, Ilm Usul al Figh (Kuwait: al Dar al Kuwaitiyah, 1968), p. 45; M. Abu Zahrah, Malik, উ: গ্র: পৃ: ১৫০; S. Mahmasani, উ: গ্র: পৃ: ১৫০.

[২৪] ইমাম ইবন কাছির (৭৭৪/১৩৭২) প্রাচীন ফিক্‌হে সুন্নাহ্‌র ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "যদি কেউ বলে কুরআন ব্যাখ্যার সর্বোত্তম পন্থা কি? তাহলে উত্তর হল যে কুরআন ব্যাখ্যার সবচেয় সহি (শুদ্ধ) উপায় হল কুরআনকে কুরআন দ্বারা ব্যাখ্যা করা। এক স্থানে যা সাধারণ তা অন্য স্থানে প্রায়শ ব্যাখ্যা করা হয়। যদি এভাবে ব্যাখ্যা সম্ভব না হয় তাহলে সুন্নাহ্‌র শরণাপন্ন হন। ইহা (সুন্নাহ) কুরআনকে ব্যাখ্যা করে এবং স্পষ্ট করে দেয়। শুধু তাই নয়, ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আল শাফী বলেন যে আল্লাহ্‌র রাসূলের সকল সিদ্ধান্তগুলো ছিল তিনি কুরআন থেকে যা বুঝেছেন তার (সমষ্টি) এবং যদি আমরা কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআন বা সুন্নাহ্‌তে না পাই, তাহলে রাসূলের সাহাবীদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করব কারণ তারা ভাল জানেন।" দেখুন ইবন কাছির, তাফসীরুল কুরআন খ. ১. পৃ. ৭।

www.pathagar.com

অনুপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে। একটি মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অমুসলিম শত্রুদের রক্ষা করার জন্য বন্দী অবস্থায় যে মুসলমানদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাদের হত্যা করা ন্যায় সংগত বলে তিনি রায় প্রদান করেন। জনস্বার্থ মাসলাহা মুসলমানদের হত্যা নিষিদ্ধকারী *'নাস'* এবং *'ইজমা'* এর বিপরীত একটি রায় প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল।[২৫] হুজুর পাক (সঃ) এর সময়কাল হতে ক্লাসিক্যাল মুসলিম জুরীবৃন্দ যতই দূরে আসতে থাকেন ততই বেশী তারা মাসালাহর ব্যবহার ও পদ্ধতিতে সাফল্যের সাথে বিস্তৃত করতে থাকেন। এক্ষেত্রে হাম্বলী জুরীগণের *সিয়াসাহ শারইয়াহ* ইসলামী পাবলিক পলিসি সংক্রান্ত মতবাদের কথা উল্লেখ করা যায়।[২৬]

এখন অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। বহু আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। এ অবস্থায় মুসলমানগণ আর ঐ ক্ল্যাসিক্যাল মডেলের কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে পারেন না। কারণ ঐ মডেল ছিল কেবল বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয়। আধুনিক চ্যালেঞ্জ মুসলিম পদ্ধতি বিজ্ঞানের নিকট আরো বেশী কিছু আশা করে।

এখনকার মৌলিক প্রয়োজন হল এমন চিন্তাভাবনার বিকাশ সাধন যা আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ বিষয়ক ব্যাপারগুলির প্রয়োজন পুরনে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু নতুন চিন্তাধারা কোনক্রমেই ইসলামী মূল্যবোধ ও দৃষ্টি ভঙ্গির বিপরীত হবে না।

সুন্নাহ এবং স্থান-কাল মাত্রা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমকালীন সনাতন মুসলিম চিন্তাধারার ব্যাপারে সমালোচনা এবং অসন্তুষ্টি সাধারণত সুন্নাহকে ঘিরে কেন্দ্রিভূত।[২৭] যে সমস্ত *হাদিস* অমুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং সেকেলে আচরণ ধাঁচের বলে মনে হয়, সেগুলোই সাধারণত ঐরূপ অগ্রহণযোগ্যতার দলিল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ সমস্ত সমালোচনা যেসব মানদন্ডের নিরিখে পরিমাপ করা হয়, সেগুলোর বেশীর ভাগই অবাস্তব এবং ধারণা-গত ও আদর্শগত দিক দিয়ে পশ্চিমী ধাচের। অনুরূপ ভাবে এসব সমালোচনার সমর্থনে যে সব উদাহরণের অবতারণা করা হয় সেগুলো চিরাচরিতভাবে নেয়া হয়েছে জিয়্যা, বহিঃসম্পর্ক কৌশল এবং অমুসলিমদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধ বিগ্রহের মত বিষয় হতে। সনাতন পন্থী এবং আত্মপক্ষ সমর্থনকারীগণ মুসলিম আইন বিজ্ঞানকে রক্ষা করার

২৫ দেখুন A. Khallaf, উ: গ্র: পৃ: ১০১-১০২ এবং al Farra; দেখুন উ: গ্র: পৃ: ৩৭, ৪৩, ৪৯; Ibn Qudamah, al Mughni, পৃ: ২০৪-২০৫; W. al Zuhayli, Nazaryat al Darurah, পৃ:১৬৩, ১৬৮, ২৪৩.

২৬ দেখুন M. Abu Zahrah, Ibn Hanbal, পৃ: ২১৮-৩৩১.

২৭ J. N. D. Anderson andN. J. Coulson, উ: গ্র: পৃ: ২৩-২৪; S. Mahmasani, পৃ: ১৬৪-১২৮.

www.pathagar.com

প্রয়াস পেয়েছেন পাশ্চাত্যের অনুসৃত বর্ণ বৈষম্যবাদ এবং আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের ন্যায় প্রতিকুল উদাহরণের অবতারণা করে। এরূপ একটি পরিস্থিতি ছিল হতাশা ব্যাঞ্জক। ঐ সব সমালোচনাকারী এমন যে, নিজেরাই তারা অনেক সময় পশ্চিমাদেরই সত বা আত্মপক্ষ সমর্থনকারীদেরই মত-

সনাতন চিন্তাধারার প্রতি সমকালীন মুসলমানদের অসন্তুষ্টি রয়েছে। এ অসন্তুষ্টির কারণ হল আধুনিক কালে তাদের পাশ্চাত্য চিন্তধারার অনুপ্রবেশ রোধে ব্যর্থতা। তারা ব্যর্থ হচ্ছে পাশ্চাত্যের বস্তুগত অর্জনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে। এ অবস্থা থেকে একটি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাহল এই যে, আধুনিকতাবাদীরা এ কারণেই সুন্নাহর ভুল প্রমাণে সচেষ্ট। এবং এর দ্বারা তারা সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে নির্মিত সনাতন চিন্তাধারার কাঠামোকে টেক্কা দিতে চায়। অপরদিকে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে সময়ের প্রয়োজনের প্রতি আরও সক্রিয় করার প্রশ্নে আধুনিক পন্থীদেরও ব্যর্থতা রয়েছে। ফল দাড়ালো এই যে, সুন্নাহকে এরূপ প্রচেষ্টা আরও বিস্তারিত প্রশ্নের সম্মুখীন করে ফেলল। প্রশ্ন উঠল মুসলিম সংকটের প্রেক্ষিতে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর প্রাসংগিকতা নিয়ে। হাদিসের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত মাথাঘামানোর ফলে কেবল এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করা হয় যে, আধুনিক মুসলিম চিন্তাধারার প্রয়োজন। প্রয়োজন সহস্রাব্দ পূর্বের স্থান-কালের উপাদান সম্বলিত সনাতন মুসলিম সামাজিক পদ্ধতির নেতিবাচক এবং ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে মুসলিম চিন্তাধারাকে মুক্ত করার। এটা প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে হাদিসে স্থানকালের এই উপাদান গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারার উৎসগুলোর অন্যতম।

সিয়ার (জাতিপুঞ্জের মধ্যাস্থিত সম্পর্ক) এর ক্ষেত্র হতে হাদিসের কয়েকটি উদাহরণ এবং আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি, স্থান-কালের উপাদানগুলোকে প্রতিফলিত করেঃ

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী বলেন, আল্লাহর নামে যাও, আল্লহতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর নবীর ধর্মকে আঁকড়ে ধরে, জরাজীর্ণ বৃদ্ধলোককে অথবা যুবক শিশুকে অথবা স্ত্রীলোককে হত্যা করো না। গণিমতের ব্যপারে অসৎ হবে না। কিন্তু অধিকার বলে প্রাপ্ত সুবিধাদি সংগ্রহ করে নিবে। ন্যায় কাজ কর ভাল আচরণ কর। কারণ আল্লাহ সদাচারীকে ভালবাসেন। আবু দাউদ বর্ণিত [২৮]

'আলী বর্ণনা করেন, আল্লাহর নবীর হাতে একটি আরবীয় ধনুক ছিল এবং অন্য এক জনকে তার হাতে একটি পারসিক ধনুক সহ দেখে বললেন, এটি কি? এটি ফেলে দাও।

---

২৮ Waliy al Din al Tabrizi, Mishkat al Masabih, translated with explanatory notes by James Robson (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1963), খ: ৩, পৃ: ৮৩৮.

www.pathagar.com

এগুলো এবং এগুলোর মত সংগে রাখ। তীর ধনুক সংগে রাখ, কারণ এগুলোর মাধ্যমে ধর্মকে রক্ষা করতে এবং তোমাকে জমিনে প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন। ইবনে মাজাহ বর্ণিত।[২৯]

আবু উসাইদ বর্ণনা করেন, *বদর যুদ্ধে যখন কুরাইশদের মোকাবেলা করার জন্য সারীবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান হয়* তখন নবী (সঃ) *তাদেরকে বলেন যে, "যখন তারা তোমাদের নিকটে আসে, তখন তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ কর।"* অন্য একটি বক্তব্যে বর্ণিত, *"যখন তারা তোমাদের নিকটে আসে তাদের দিকে নিক্ষেপ কর; কিন্তু তোমাদের সব তীর ব্যবহার করোনা।* বোখারী বর্ণিত-[৩০]

এই হাদিসগুলোর (সমগ্র ক্ল্যাসিক্যাল এবং সনাতন রাজনৈতিক চিন্তা ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এগুলোর উপর) প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা পরিস্কার দেখতে পাই যে, মধ্যযুগীয় সামাজিক পদ্ধতির প্রেক্ষাপটে একটি মধ্যযুগীয় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এইগুলো হলো কতিপয় নির্দেশাবলী বিশেষ। স্থান-কালের প্রেক্ষিত বিবেচনা না করে এগুলোর যে কোন প্রকারের উল্লেখ হবে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়ার নামান্তর। এই ধরনের বিষয়গুলোর কোন অর্থবহ ব্যবহারের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে, এ ধরনের উক্তির কোন অন্তর্নিহিত মূল্য আছে কিনা। বিচার করে দেখতে হবে সুস্পষ্ট ভৌত এবং সাংস্কৃতিক দিকের সাথে। এ সমস্ত হাদিসের অনুসরনে ক্লাসিক্যাল জুরীগণ তাঁদের যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে হাদিসগুলোর শাব্দিক অর্থ, বিষয়ের তুলনা এবং দৃষ্টান্ত ও সাহিত্যিক বিশ্লেষণের কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন, এটা বোধগম্য। কিন্তু যখন সমকালীন জুরীগণ একই পদ্ধতিতে কাজ করবেন এবং এমনকি পুরাতন নির্দেশাবলী হুবহু শাব্দিকভাবে পুনরাবৃত্তি করবেন, তখন বর্তমানে যে পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি হল তার কোন সুষ্ঠু মূল্যায়নের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকছে না।[৩১] বর্তমানে ঐসমস্ত হাদিসের যেগুলোতে যুদ্ধে মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা নিষিদ্ধ হয়েছে, স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, আধুনিক জুরীগণ, আধুনিক যুদ্ধ বিগ্রহ এবং আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন বা ওয়াকেফহাল নন।[৩২] এই ধরনের নির্দেশাবলী আধুনিক যুদ্ধ ব্যবস্থাকপদের কোন কাজে আসে না এবং এসবের অর্থ তাদের নিকট খুবই সামান্য। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই

---

২৯ প্রগুক্ত., খ: ৩, পৃ: ৮২৫.

৩০ প্রগুক্ত., খ: ৩, পৃ:৮২১, ৮৩৩, ৮৩৮ ; al Shaybani, al Siyar al Kabir, খ: ১, পৃ: ৮৭.

৩১ প্রগুক্ত., IbnRushd, Bidayat al Mujtahid, খ: ১, পৃ: ৩১১-৩১২; Malik ibn Anas, al Mudawwanah, খ: ৩, পৃ: ৮, and alShaybani, উ: গ্র: খ: ১, পৃ: ৪২.

32 প্রগুক্ত., Muhammad Abu Zahrah, Al 'Ilaqat al Duwalyah ft al Islam (Catro: al Dar al Qawmiyah, 1964), পৃ: ৪৩; S. Sabig, Fiqh al Sunnah, খ: ১১, পৃ: ৪৮-৪৯, ১২৯-১৩২.

www.pathagar.com

আজকাল আর ঐ সমস্ত পছন্দ অপছন্দের কোন বালাই নেই যে, যুদ্ধে কি ধরনের অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করা হবে- সাধারণভাবে ব্যবহৃত অস্ত্র, আনবিক বোমা, নাকি অন্য কিছু। যুদ্ধের সময় বেসামরিক লোকজনকে পৃথক করাও আজাকাল অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আধুনিক যুদ্ধ কৌশলের আওতায় কাকে হত্যা করা উচিৎ কাকে করা উচিৎ নয়- এই নৈতিক প্রশ্ন আর এখন দেখা যায় না। যে প্রশ্নটি আসে, তা হল কি পরিমাণ লোককে হত্যা করা উচিৎ, এবং মাত্রাতিরিক্ত হত্যা কোনটাকে বলা হবে?

এটা বোধগম্য যে, ইমাম শাফীর বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনায় মুসলিম শাসকদের তাদের দেশের মুশরিকদেরকে বেশী না হলেও অন্ততঃ বছরে একবার আক্রমণ করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং দশ বছরের বেশী সময়ের জন্য কোন চুক্তি গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। বস্তুত পক্ষে এই মত নবীর সুন্নাহর অনুরূপ ঘটনার সাথে তুলনা করে প্রতিষ্ঠিত যেহেতু শেষোক্ত জন তার শত্রুর সাথে বছরে অন্ততঃ একবার একটি যুদ্ধ জড়িয়ে পড়েছেন এবং দশ বছরের বেশী সময়ের জন্য কোন চুক্তি গ্রহণ করেননি।[৩৩] যা হোক, আধুনিক যুদ্ধ বিগ্রহরে চরম বিপদজনক অবস্থায় এবং আজকের যুগের ভঙ্গুর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাধীনে এবং যেখানে ভবিষ্যতের ঘটনীয় অবস্থা সম্পর্কে অনুমান করা যায়, সেক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রনায়কই সম্ভবত এ ধরনের তুলনার অবতারণা, বোধ হয়, গ্রহণ করতে রাজী হবেন না।

ইমাম ইবনে কাছির তার তাফসীর গ্রন্থে (কোরআনের ব্যাখ্যা) উল্লেখ করেনঃ *আল্লাহর রাসুল (সঃ) যখন মক্কায় উপনীত হলেন তখন তিনি এবং তাঁর সঙ্গীগণ ইয়রিব* (মদিনা) *এর জ্বর মারাত্মকভাবে ভোগেন। এ জ্বর তাঁদেরকে একেবারে কাহিল করে ফেলে। মুশরিকদের ও মনের আশা ছিল যে, মুসলমানরা নিস্তেজ হয়ে যাবে এবং চরম ভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে মদিনার জ্বরে। মুশরিকরা যখন কালো পাথরের ধারে উপবিষ্ট তখন আল্লাহ পাক তাঁর হাবিবকে জানিয়ে দিলেন, তাঁরা মুসলামনদের সম্পর্কে কি বলাবলি করছিল। সুতরাং নবী করিম (সঃ) তাঁর সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন দৌড়ে হাটতে ঐ এলাকায় যেখানে মুশরিকগণ তাদের দেখতে পারে, প্রথম তিনটি চক্করে* (কাবার)। *এর উদ্দেশ্য ছিল মুশরিকদেরকে তাদের ধৈয্য মাত্রা প্রদর্শন করা। তিনি তাঁদের দুই মধ্যবর্তী জায়গায় হাটার জন্য নির্দেশ দিলেন যেখানে মুশরিকগণ তাদেরকে দেখতে পারেনি। নবী করিম (সঃ) তাঁর সঙ্গীদের সকল চক্করে অর্ধেক পথ দৌড়ানো* (রামাল) হতে রেহাই দেন এই বিবেচনায় যে, তাঁরা ক্লান্ত। মুশরিকরা বলল, এরা কি সেই *লোকজন যাদেরকে* আমরা *জ্বরে নিঃশেষ করে দিয়েছে বলে ভেবেছিলাম? এরাতো অসুক*

৩৩ দেখুন al Shafi al Umm, খ: ৪, পৃ: ৯০-৯২; এবং Ibn Rushd, উ: গ্র: খ: ১, পৃ: ৩১৩-৩১৪.

www.pathagar.com

অমুক এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী। দুটি সিহাহ এর মধ্যে এইগুলো বর্ণিত হয়েছে হামুদ ইবন যায়েদাবাহ কর্তৃক।[৩৪]

ঐ জন্য এটা সুন্নাহর (যা আজও অনুসৃত হয়) একটি নির্দেশ যে মক্কাতে কাবা প্রদক্ষিণে মুসলমানরা প্রথম তিন রাউন্ডে দৌড়ে হাটে। এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এ ক্ষেত্রে যেটাকে হাদিস বলে গণ্য করা হয়েছে এবং অতঃপর ভালবাসা, সম্মান এবং নবীর সুন্নাহর পাবন্দী হিসাবে পালন করা হয়েছে এবং যা ছিল সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, সেটিরই উৎপত্তি হয়েছিল একটি কৌশলের মধ্যে, যে কৌশলটি নবী করিম (সঃ) এক শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন, তার চোখে ধুলো দেয়ার জন্য। এ শত্রু অপেক্ষা করছিল প্রথম সুযোগেই মুসলিম সেনাবাহিনীকে পর্যদস্তু করার উদ্দেশ্যে। এ উদাহরণ থেকে উপলব্ধি করা যায়, নবী করিম (সঃ) তাঁর চার পাশের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে কি রূপ সচেতন ছিলেন। স্থান কাল উপাদানের প্রভাব সব সময় তেমন সুস্পষ্ট বা সহজ নয় এবং স্থান কাল উপাদানের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার জন্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আরও অনেক উন্নতমানের উৎকর্ষতার প্রয়োজন।

সুন্নাহর ব্যাপারে উসূল এর ব্যাপারে এবং মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারার সমস্ত দিকের ব্যাপারে আসল সমস্যা হল স্থানকালের উপাদানের প্রভাবটিকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করার ব্যর্থতা। কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোননা কোন ভাবে সকল নির্দেশনায় এই উপাদানটির উপস্থিতি অবশ্যই থাকতে হবে। এ জাতীয় সুন্নাহ এবং নির্দেশনাকে সেগুলোর মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বহির্ভূত ক্ষেত্রে স্থান-কালের গন্ডিকে ডিঙ্গিয়ে বিস্তৃত করা সমীচিন নয়। চরম রক্ষণশীলতা, ক্ষীণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন বাস্তবতা সম্পর্কে অসচেতনতা ব্যতীত এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না। এসব উদাহরণ থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি, তাহল এই যে, সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যে ক্ষেত্রেই *কিয়াস* প্রযোজ্য হবে, সেক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে হবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধি সহকারে, স্থান কালের ব্যাপক পরিবর্তন ও সুদীর্ঘ পরিক্রমণের ফলশ্রুতিতে আংশিক ভাবে এবং হুবহু ঘটনায় *কিয়াস* প্রয়োগের বাস্তব ক্ষেত্র খুব কমই পাওয়া যাবে।

কুরআনে প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট উদাহরণ

আমরা দেখেছি যে কোরআন হুবহু সুন্নাহর মত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর বক্তব্য ও বর্ণনায় প্রকাশিত হয় সাধারণ ভাষণ এবং দার্শনিক ও আদর্শ পথ নির্দেশ। সুতরাং

৩৪ Ibn Kathir, Tafsir al Quran, খ: ৪, পৃ: ২০২. পাঠকের এই বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত যে ইসলামে এবং এই বইয়ে স্থান-কালের যে প্রশ্ন তা শুধুমাত্র সামাজিক সম্পর্ক এবং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর সাথে ইবাদাহ, শারীআহ এবং জিক্‌রের প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই।

www.pathagar.com

সার্বজনীন প্রকৃতির আয়াতগুলোই মুসলিম বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি রচনা করে। মুসলিম চিন্তা চেতনায় এবং সামাজিক পদ্ধতিতে মূল্যবোধের গঠন এবং লালনের ক্ষেত্রে কুরআন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং করে যাচ্ছে। তবুও কুরআন যখন কোন বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ করে বক্তব্যদান করে বা উদাহরণ পেশ করে তাতে তখন, অনেক হাদিসের মতই, স্থান কালের উপাদানটি বিদ্যমান থাকে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে পাঠকদেরকে অবশ্যই খুবই সতর্ক হতে হবে এগুলোকে কোন সাধারণ নিয়মে পরিণত করার ক্ষেত্রে। এ সতর্কতা বেশী প্রয়োজন বহিঃসম্পর্ক বিষয়ক বিষয়াদিতে, যেখানে বিদ্যমান ঘটনাবলীর উপর মুসলমানদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেই।

প্রাথমিক যুগের মুসলিম সময়কালে স্থানকালের উপাদানের প্রেক্ষিতে যে সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেগুলো বিবেচনায় না এনে ইসলামী উৎস হতে বিষয়াবলীর সরাসরি ব্যবহার দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল একপ্রকার পশ্চাৎমুখী অনুশীলন। ক্ল্যাসিক্যাল জুরীগণ এরূপ অনুশীলন করতে পেরেছেন এই জন্য যে, তাঁদের সময় কালের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল মূলত বরাবরই অপরিবর্তনশীল। কারণ প্রাথমিক মুসলিম যুগ এবং ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম যুগ উভয়ই ছিল সামন্তবাদী সমাজ দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমানরাই ক্ল্যাসিক্যাল যুগে বৃহৎ শক্তি হিসাবে শাসন করেছে এবং তাদের অংশে ক্ল্যাসিক্যাল বিশ্ব এবং এর সভ্যতা সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণ ও করেছে তারাই।

এই পরিস্থিতি সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে নিম্নে উল্লিখিত উদাহরণগুলোর মাধ্যমে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে *ক্ষমতা* নামক একটি মৌলিক ধারণার বিষয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন,

হে নবী! মুমিনদিগকে যুদ্ধেরজন্য উদ্বুদ্ধ কর; তোমাদের মধ্যে কুড়ি জন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশতজনের উপর বিজয়ী হইবে এবং তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকিলে এক সহস্র কাফিরের উপর বিজয়ী হইবে। কারণ তাহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহার বোধশক্তি নাই। আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করিলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশতজন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশতজনের উপর বিজয়ী হইবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকিলে আল্লাহর অনুজ্ঞাক্রমে তাহারা দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হইবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন (৮ ঃ ৬৫ -৬৬)।

এটা সুস্পষ্ট যে, এ আয়াতগুলো হল নবীর (সঃ) প্রতি যুদ্ধের জন্য সংগঠিত হওয়ার এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করার ব্যাপারে নির্দেশ। এ আয়াতগুলিতে মুসলমানরা কি হারে অমুসলিম সৈন্যদেরকে পরাস্ত করতে পারবে তার অনুপাত উল্লেখ করা হয়েছে। সে

www.pathagar.com

অনুপাত হল ১ঃ১০ এবং তারপরে ১ঃ২। আয়াতগুলোতে গুণাবলীর কথাও বলা হয়েছে। এ গুণাবলী হল বিশ্বাস, ধৈর্য্য এবং কষ্ট সহিষ্ণুতা। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, একজন মুসলমান কয়জন অবিশ্বাসীকে পরাস্ত করতে পারবে সে অনুপাত সম্পর্কে কতগুলো মৌলিক ধারণা ঠিক থাকা নির্ভর করে কেবলমাত্র কতগুলো উপাদান যেমন- দক্ষতা, কৌশল, এবং অস্ত্রশস্ত্র অপরিবর্তিত (ধ্রুব) থাকার উপর। ভাষ্যটি এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিচ্ছে এই বলে যে, কিছু উপাদানের পরিবর্তন ঘটলে (বর্তমানে তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে একটি দুর্বল স্পট, আছে), অনুপাত ও দ্রুত সে অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে ১ঃ১০ থেকে ১ঃ২ এসে ঠেকে। সুতরাং পাঠক অথবা জুরীগণকে অর্থের যেকোন পরিবর্তন এবং শত্রুর সাথে মোকাবেলার কৌশলগত দিকের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে সংবেদনশীল হতে হবে। তাছাড়া এটা সুস্পষ্ট যে, মুফাসসীর এবং জুরীগণ যদি এসব আয়াতের অন্তর্নিহিত ধারণাকে বিবেচনায় না আনেন, অথবা এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় নিছক উল্লেখিত অনুপাতের উপর জোর দেন তাহলে তাঁরা মারাত্মক ভুলের আবর্তে নিপতিত হবেন, যেমন ভুল হয়েছে সময় সময় এবং বিকৃত হয়েছে কুরআনে প্রদত্ত এসব উপমা উদাহরণ।

এ বিষয়টি মনে বদ্ধমূল করে নিয়ে আসুন আমরা তুলনা করে দেখি হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকের (অষ্টাদশ খৃঃ) একজন জুরী এবং হিজরী চতুর্দশ শতকের (দুই হাজার খৃষ্টাব্দ) একজন জুরীর বক্তব্য এই সংম্যাগত প্রাধান্যের বিষয়ে কি বলেন।

প্রখ্যাত জুরী আলশাফী (৭৮৬-৮২০) লিখেন ঃ

এই আয়াত যখন নাজিল হয় তখন এই আয়াত প্রসংগে ইবন আব্বাস ব্যাখ্যা দেন যে, *"তোমাদের মধ্যে যদি ধৈর্য্যশীল এবং অধ্যবসায়ী বিশজন থাকে তাহলে তারা দুশ জনকে পরাভূত করবে।" আল্লাহ এটাকে দায়িত্ব হিসাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাদের (মুসলমানগণ) যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালানো উচিৎ হবে না যদি তারা দু'শ জনের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে চায়। মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, বর্তমানে আল্লাহ তোমাদের কাজকে সহজ করে দিয়েছেন কারণ তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে একটি দুর্বলতার ছাপ আছে। এতদসত্ত্বেও যদি তোমাদের মধ্যে ধৈর্য্যশীল ও অধ্যবসায়ী একশত জন থাকে তাহলে তারা দুশতজনকে পরাভূত করবে। আল্লাহ এটা দায়িত্ব হিসাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, তারা শত্রুপক্ষের দুশ সৈন্যের নিকট হতে পালাবে না এবং ইবন আব্বাস বলেন, এটা আল্লাহর ইচ্ছায় এবং পরিষ্কার নাজিলকৃত আয়াত থাকায়; এটার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। যখন মুসলমানরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যায় এবং দেখে যে তাদের শত্রু সৈন্যের সংখ্যা তাদের দ্বিগুন, সে অবস্থায়ও তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছটান দেয়ার অনুমতি আল্লাহর পক্ষ থেকে নেই (হুরিরমা আলাইহীম) ...? এমনকি যদি মুশরিকদের*

www.pathagar.com

সংখ্যা দ্বিগুনের চেয়েও বেশী হয় তবু তাদের পিছপা হওয়া আমি পছন্দ করবো না। কিন্তু এটা আল্লাহ পাকের রোষাগ্নির কারণ হবে না (সুকট)[৩৫]

এ উদ্ধৃতি হতে আমরা এটা পর্যবেক্ষণ না করে পারি না যে, আল- শাফী নিরঙ্কুশভাবে যোদ্ধাদের সংখ্যার উপরই মনোসংযোগ করেছেন। শাফীর সময় কালের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে পূর্ব উল্লেখ করা হয়েছে, এটা তেমন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তিনি এরূপ একটি উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন। নবী করিম (সঃ) এর সময় কালের অবস্থার সাথে তখনকার বিরাজমান অবস্থা তখনও তুলনীয় ছিল। প্রথম কালের আর একজন আইনজ্ঞ মালিক ইবন আনাস একটি অস্পষ্ট পদ্ধতিতে অনুধাবন করেছিলেন যে, এ আয়াতগুলোতে যে বাস্তব বিষয়টি সংশ্লিষ্ট, তাহল শক্তি সামর্থের ধারণা, যোদ্ধার সংখ্যা নয়। ৩৬ বিংশ শতাব্দীর একজন আইনজ্ঞ এ বিষয়ে মালিকের উদ্বৃতি দিয়েছেন।

সাইয়েদ সাবিক, যিনি একই বিষয়ের উপর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে লিখেছেন, তিনিও একই ধারার অনুসরণ করেছেন।[৩৭]

চিত্রটি পরিষ্কার করার জন্য এই সমস্যা নিয়ে আলোচনার বৃহত্তর অংশই আমরা উদ্ধৃত করব। অধ্যায়টির শিরোনাম **"শত্রুদের দ্বিগুণ সংখ্যা হতে পলায়ন"**।

পূর্বে এ বিষয়ে এটা উল্লেখ করা হয়েছিল যে, দুটি ক্ষেত্র ব্যতীত শত্রুর মোকাবিলায় অগ্রসরমান দলের পলায়ন নিষিদ্ধ। এ দুটি ক্ষেত্রের একটি হল কোন ভিন্নদিকে যুদ্ধের জন্য অথবা মুসলিম সেনাদলের অন্যকোন গ্রুপের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য। এখন আমরা যা বলতে পারি তা হল যুদ্ধের সময় যদি শত্রুর সংখ্যা দ্বিগুনের চেয়ে বেশী হয় তাহলে পলায়নের অনুমতি আছে (ইয়াজুজু)। কিন্তু সংখ্যা যদি দ্বিগুণ অথবা দ্বিগুণের চেয়ে কম হয় তাহলে পলায়নের অনুমতি নেই (ইয়াহরুমু)। মহান আল্লাহ পাক বলেন, বর্তমানের জন্য আল্লাহ তোমাদের কাজকে হালকা করে দিয়েছেন।

আল মহাজ্জাব এর গ্রন্থকার বলেন, যদি তাদের সংখ্যা মুসলিমদের সংখ্যার দ্বিগুণের চেয়ে বেশী হয়, তাহলে পলায়ণের অনুমতি আছে। কিন্তু যদি তাঁরা মনে করে যে, সম্ভবত তারা ধ্বংস হয়ে যাবে না তাহলে তাদের দৃঢ়চিত্তে অবস্থান করা উত্তম (আল আফজাল)। কিন্তু তারা যদি মনে করে যে এটা খুবই সম্ভব যে, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তাহলে সেক্ষেত্রে দুটি পথ খোলা আছে। এর একটি হল চলে যাওয়া তাদের জন্য কর্তব্য কারণ আল্লাহ বলেন, তোঁমার নিজের ধ্বংস নিজে টেনে এনো না (২:১৯৫)। দ্বিতীয়টি হল

৩৫ al Shaft al Umm, খ: ৪, পৃ: ৯২.

৩৬ Ibn Rushd, Bidayat al Mujtahid, খ: ১, পৃ: ৩১৩.

৩৭ Sayyid Sabiq, Figh al Sunnah, খ: ৯, পৃ: ১২৮.

www.pathagar.com

এটা সুপারিশ, কর্তব্য নয়। কারণ যদি তারা নিহত হয় তবে তারা শহীদদের মরতবা প্রাপ্ত হয়।

যদি অবিশ্বাসীদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণের চেয়ে বেশী না হয় এবং যদি মুসলমানগণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভবনা দেখতে না পায় তাহলে তাদের পলায়ন করার অনুমতি নেই। কিন্তু যদি তারা ধ্বংসের সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ করে তাহলে তাদের জন্য দুটির যেকোন একটি পন্থা অবলম্বনের সুযোগ আছে। প্রথমত পলায়নের কোন অনুমতি নেই কারণ আল্লাহ বলেন এর কোন অনুমতি নেই এবং আইনজ্ঞগণ বলেন যে এটাই সঠিক, কারণ আয়াতের শাব্দিক অর্থ এটাই। দ্বিতীয়ত মালিক ইবনে আনাসের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবনে মাজিশুন এর মতামত হল এই যে, দুর্বলতা বিষয়টা কেবল সংখ্যার সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়। বরং এটি ক্ষমতার কমতি বিষয়কও। সুতরাং সংখ্যার দিক দিয়ে সমান সমান হলেও পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে শত্রুর অশ্ব, তরবারী এবং শারীরিক সামর্থ সবই উত্তম, তখনও পলায়নের অনুমতি আছে এটাই সঠিক মতামত।[৩৮]

এ বিষয়ে লেখক যা বলছেন, এটাই হল তার সারসংক্ষেপ। অধিকন্তু বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম লেখকবৃন্দ কর্তৃক ক্ষমতা এবং এর প্রয়োগ সংক্রান্ত ধারণার উপর বিশ্লেষণ এবং গবেষণাকে প্রায় অবহেলা করা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর একজন রাষ্ট্র নায়কের নিকট এই সমকালীন কিন্তু সনাতন লেখকের গবেষণা কর্মের তাৎপর্য কতটুকই বা হতে পারে ? আধুনিক বিশ্বের সাথে এরূপ লেখার কি কোন সম্পর্ক আছে ?

ক্ষমতার আধুনিক অর্থ সম্পর্কে এ মানের পান্ডিত্য নিয়ে যদি একজন মুসলমান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ক্ষমতা একটি সংখ্যা সংশ্লিষ্ট বিষয় অথবা চিরাচরিত বিশ্বাস অনুযায়ী এই মনে করেন যে, শত্রুর চেয়ে দুর্বল হলেও মুসলমানরা এমনিতেই বিজয় লাভ করবে তা হলে এতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। প্রতিপক্ষের চেয়ে সত্যিকার অর্থে এবং ব্যাপক অর্থে অধিক ক্ষমতাধর পক্ষই যে বিজয়মাল্যে ভূষিত হয় এটাইসব সময় একটি কৌশলগত নীতি হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সমকালীন বিশ্লেষণে এটা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হচ্ছে যে, ক্ষমতা এমন একটি ব্যাপক অর্থবোধক ধারণা যাতে মানবজীবনের সামরিক, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক নৈতিক এবং ধর্মীয় সকল প্রকার উপাদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইবন্ রূশদ ক্ষমতাকে সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত সমীকরনে বিচার করতে গিয়ে একটি ভুল

---

৩৮ উল্লেখ্য যে মুসলমানদের লেখায় শক্তির উপাদান ও ধারণার যথার্থ ও পর্যাপ্ত আলোচনা না থাকায় আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ কোনো কাজ পাইনি।

www.pathagar.com

করেন। এ ভুলটি তিনি করেন যখন তিনি এই বলে মালিক ইবনে আনাসের মতামতের সার সংক্ষেপ পেশ করেন যে দ্বিগুণ বিবেচনা করতে হবে ক্ষমতা (ব্যাপক অর্থে) প্রসংগে যোদ্ধার সংখ্যায় নয়। কিন্তু মালিক ক্ষমতা (কুওয়া) পরিভাষাটি ব্যবহার করেননি। শক্তির এরূপ তুলনা সত্যি হতে পারে না অথবা যৌক্তিকভাবে সঠিক বলে গণ্য করা যায় না যে পর্যন্ত না মালিকের (রঃ) চিন্তা চেতনায় ক্ষমতার ধারণাটিকে শারীরিক বা বস্তুগত ক্ষমতার মধ্যে সীমিত করা যায়। ব্যাপক অর্থে শক্তি বলতে যা বুঝায় সে অর্থে যদি প্রতিপক্ষের শক্তির পরিমাণ মুসলমানদের তুলনায় দ্বিগুণ অথবা দ্বিগুণের চেয়ে বেশী হয় তাহলে মুসলমানগণ সুনিশ্চিতভাবেই পরিনামে পরাজয় বরণ করবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শক্তি শব্দটি। এটি দৃশ্যমানও হতে পারে আবার অদৃশ্যমানও হতে পারে। মালিক (রঃ) এর উচ্চারিত শব্দের অবশ্য একটি বস্তুগত অর্থ আছে। সে অর্থে অস্ত্রশস্ত্রের প্রসংগ এসে যায়। মালিক (রঃ) পরবর্তীতে শত্রুদের তরবারী এবং অশ্বের উৎকৃষ্টতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে ক্ষমতার বস্তুগত দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তরবারী এবং অশ্বের দিক দিয়ে যদি শত্রুপক্ষ অধিক সুসজ্জিত হয়ে বেশী বস্তুগত শক্তির অধিকারী হয়, তাহলে মালিক (রঃ) এর মতে একজন মুসলমানের জন্য এটা বাধ্যতামূলক নয় যে, সে প্রত্যেকের সাথে সামনা সামনি যুদ্ধ করে যাবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এটাই একমাত্র যুক্তিসংগত যে, যে অধিক ক্ষমতাশালী সেই জয় লাভ করবে, আর দুর্বল হবে পরাজিত। কিন্তু এ সত্যটি প্রয়োগের মৌল কৌশল নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিভাবে শক্তির সংজ্ঞা প্রদান করবেন তার উপর অর্থাৎ তিনি শক্তির বস্তুগত অর্থ এবং ব্যাপকভাবে অবস্তুগত অর্থ গ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়ের উপর।

কুরআনের এ ধরনের আয়াতগুলোর অর্থে যে স্থানকালের উপাদান বিদ্যমান সে দিকের প্রতি অচেতন থাকার আর এক পরিণতি হল কুরআনের আয়াতের স্থায়ীভাবে রহিত হওয়ার (নাস্‌ক) ক্লাসিক্যাল ধারণা। এ ধারণার কারণে মক্কী জীবনে এবং মাদানী জীবনের প্রথমদিকের ইসলামী অভিজ্ঞতার পশ্চাতে যে সমস্ত নীতিএবং মূল্য বোধ ছিল সেগুলো এখন আর অনুশীলিত হয় না এবং সেগুলো হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে। *নাসখ* এর বিষয় বিবেচনাকালে জুরীগণের ভাবনা চিন্তায় যে বিষয়টি কার্যকর ছিল তা হল মদিনা যুগের শেষ সময় কালের অবস্থা। যে অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযোগী হতে পারে একটি শক্তিশালী এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজের জন্য। আর তা উপযোগী হয়েছিল উমাইয়া এবং আব্বাসীয় রাষ্ট্রগুলোতে। এটা এমন যে, জুরীগণ এ সময় কালকে এবং অবস্থাকে মদিনা যুগের শেষ সময়ের পূর্বকাল বলে মনে করেছেন যা কিনা ঐতিহাসিকভাবে রহিত হয়ে গেছে এবং এজন্য এটিকে বিবেচনায় আনা নিরর্থক বলে মনে করেছেন। সমকালীন মুসলমান জুরীগণ যদিও *নাসখ* এর অনেক বিষয় পুনঃ ব্যাখ্যা দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন তবু ও মনে হয় *নাসখ* এর সাথে সংশ্লিষ্ট স্থান কালের

www.pathagar.com

উপাদানকে অগ্রাহ্যকরে তাঁরা স্থায়ী *নাসখের* সে একই ধারণাকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাঁদের চিন্তার এমন কোন উদ্যোগ এসেছে বলে প্রতিভাত হয় না যা তাকে অস্বীকার করবে। তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন কেবল এটাকে পুনঃ ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য। তরবারির আয়াত (আয়াতুল সাইফ) হল *নাসখ*-এর পক্ষে যুক্তি প্রদানকারী আয়াতের একটি ভাল উদাহরণ। এ আয়াত পূর্ববর্তী সকল নীতিমালাকে রহিত করে। খুব নির্ভরযোগ্য তাফসীর অনুসারে তরবারীর আয়াত হল, *এবং তোমরা মুশরিকদের সহিত সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিবে যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকে।" (৯:৩৬)*[৩৯]

আল সেবানীর সিয়ার এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে আল সারাখসী বলেন সংক্ষেপে *বলা যায়, জিহাদ এবং যুদ্ধের জন্য নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে পর্যায়ক্রমে- এর চূড়ান্ত পর্যায় হল অবিশ্বাসীদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করার নির্দেশ ....। এর মধ্যে একটি দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট আছে। কিন্তু এ দায়িত্বের অর্থ হল ইসলামকে ক্রমোন্নতি দান এবং পৌত্তলিকদের বশীভূত করা।*[৪০]

আল জুহেলী এটা পরিস্কার করে দিয়েছেন যে, দ্বিতীয় হিজরীর (৮ম শতাব্দী) অনেক আইনবিদ (জুরী) মুসলমান এবং অমুসলমানের মধ্যস্থিত যুদ্ধকে ব্যতিক্রম হিসাবে মনে না করে নিয়ম হিসাবেই বিবেচনা করেছেন। তদুপরি তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁদের নাসখ ব্যবহার করার সুযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।[৪১] কুরআন সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধি ছিল কম সমালোচনামূলক। এর কারণ ছিল তাঁরা কুরআনের প্রতিটি আয়াতের আক্ষরিক অর্থের মধ্যেই নিজেদেরকে সীমিত রেখেছেন। যে সমস্ত আয়াতের মধ্যে পরস্পর বিরোধী অর্থের ভাবধারা পরিলক্ষিত হয় সেগুলোর মধ্যে তুলনা এবং সমন্বয় সাধনের জন্য তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা নেননি। তৎপরিবর্তে আইনবিদগণ (জুরী) এ দাবী করেন যে, কিছু আয়াত অন্য কিছু আয়াতকে রহিত করেছে। আইন বিষয়ক এইরূপ উপলব্ধি সে কালের বিরাজমান অবস্থার একটি সুস্পষ্ট প্রতিফলন। আল জুহেলী মনে করেন জুরীবৃন্দের এ অবস্থানের কারণ ছিল ঐ সময় ইসলামকে রক্ষার জন্য যুদ্ধার্থে মুসলমানদের সার্বক্ষনিকভাবে প্রস্তুত রাখা একান্ত প্রয়োজন ছিল। তখন বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থায় রহিতকরণের কৌশলটি একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। শত্রুর মোকাবিলায় মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য এটি সরল এবং সুদৃঢ় অবস্থায় সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধের প্রভাব ছিল সীমিত। শত্রুরা কখনও ধর্ম এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতার ধারণা গ্রহণ করেনি। মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ একটি

৩৯ দেখুন Abu Zayd, al Naskh fi al Quran, পৃ: ১১, ৫০৪.

৪০ al Shaybani, al Siyar al Kabir, খ: ১, পৃ: ১৮৮.

৪১ দেখুন W. al Zuhayli, Athar al Harb, পৃ: ১৩০-১৩১.

www.pathagar.com

অনিবার্য প্রয়োজন এবং গ্রহণযোগ্য হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। প্রয়োজনের উদ্ভব হয়েছে দারুল ইসলামের সাথে দারুল হারবের বিরাজমান সনাতন সম্পর্কের প্রেক্ষিতে।

আধুনিক যুগে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি জাতি রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিরাজমান শত্রুতা নিরসন কল্পে কিছু বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ বিভিন্ন জাতির মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সমাধানের জন্য যুদ্ধকে ন্যায় সঙ্গত কৌশল হিসাবে গ্রহণ খুবই বিপদজনক। ক্লাসিক্যাল আইনগত অবস্থান সংরক্ষণে মুসলমান বুদ্ধিজীবীবৃন্দ রহিতকরনের কৌশলের ক্লাসিক্যাল অপব্যবহারকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই কৌশলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বর্জিত হয়েছে ব্যক্তি, এমন অনেক মূল্যবোধ ও অবস্থান যা প্রণীত হয়েছিল মক্কী সময়কাল এবং মাদানী সময়কালের প্রথম দিকে মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের পথ নির্দেশ হিসাবে। আল জুহেলী এই বলে বিষয়টির ইতি টানেনঃ *যুদ্ধ একটি স্থায়ী ভিত্তি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য ক্ল্যাসিক্যাল জুরীগণের এই অবস্থান কারো উপর বাধ্যবাধকতা মূলক কোন কর্তৃত্ব হতে পারে না। কুরান এবং সুন্নাহ হতে এর কোন সমর্থন নাই। এটা ক্ষণস্থায়ী প্রভাবমূলক নিছক একটি সিদ্ধান্ত (রুলিং)।*[৪২]

সমগ্র বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বিবেক এবং দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়নে মৌলিকশক্তির উৎস আল কুরআন। এ মহাগ্রন্থই মুসলমানদের সামাজিক পদ্ধতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের মৌলিক উৎস। এটা সত্যি যে, মুসলমান জাতি ইসলামের কাঙ্খিত আদর্শমানে জীবন যাপন করতে ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, তারা কোরআনের সাথে অব্যাহত যোগাযোগের মাধ্যমে সর্বযুগেই এর দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যে কোন প্রকার সংস্কার কর্মে এ সত্যটিকে অবহেলা করা অথবা অন্য কোন প্রকার পরামর্শ দেয়া হলে তাতে মুসলমানদের উপর কুরআনের যে প্রভাব রয়েছে সে সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা পরিলক্ষিত হবে না। সমকালীন কোন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষনে যখনই কুরআনকে ব্যবহার করা হবে তখন স্থান কালের উপাদানটি অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

ইজমা এবং পরিবর্তনশীল দুনিয়া

সরল অর্থে ইজমা বলতে বুঝায় ঐকমত্য। একটি *'আসল'* (বহু বচন উসূল) হিসাবে এটার প্রয়োগ ক্ষেত্র হল ঐ সমস্তবিষয়ে যেক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ বিষয় অথবা ইস্যুতে হুকুম (রায়) প্রদানের সিদ্ধান্তে আসার কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। এটা বলা বাহুল্য যে, কুরআন এবং হাদিসের নির্ভরযোগ্য

৪২ প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ: ১৩৫.

www.pathagar.com

বক্তব্যের পরিপন্থী কোন রায় প্রদান করা 'ইজমা'-এর মাধ্যমে সম্ভব নয়। সীমারেখার মধ্য থেকে যখন ঐকমত্যে আসা হয় তখন সেটা মানা সকল মুসলমানের জন্য কর্তব্য হয়ে পড়ে।

বাস্তবক্ষেত্রে অবশ্য ইজমার ভিত্তিতে জুরিগণের ঐকমত্যের বিষয় হল দৈনিক নামাজ পাঁচবার হওয়া, যাকাত প্রদানের বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি। অবশ্য এগুলো হল এমন সব বিষয় যেগুলো চূড়ান্তভাবে কুরআন, সুন্নাহ এবং নবী করিমের (সঃ) সাহাবীদের ঐকমত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এভাবে প্রকৃতপক্ষে এগুলো হল সাধারণ জ্ঞান। এসব মৌলিক বিষয়ের বাইরে কোন বিষয়ের উপর চূড়ান্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আইন বিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে এটি যথেষ্ট বিতর্কের বিষয় হিসাবেই চলে এসেছে।[৪৩]

কিছু সংখ্যক লেখক আছেন, যাদেরকে আধুনিক মুসলিম আইন বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য ইজমা-এর কৌশল ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কে খুবই আশাবাদী মনে হয়।[৪৪]

কিন্তু চিরায়ত চিন্তাধারার, বিশেষকরে *উসূল* এর প্রসংগে প্রকৃত সমস্যাটি যদি আমরা উপলব্ধি করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, সমস্যাটি ঐকমত্য অর্জনের সাথে স্বতন্ত্রভাবে সংশ্লিষ্ট নয় বরং এটি সংশ্লিষ্ট এমন এক প্রকার বুদ্ধি বৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যা এখনও কোন প্রকার গঠনমূলক এবং কর্ষকর পদ্ধতি বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেনি। এই পদ্ধতি বিজ্ঞানে যে সমস্ত ধারণা এবং প্রতিষ্ঠান অর্ন্তনিহিত আছে, তা ইজমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেও পারে এবং নাও করতে পারে।

সনাতন পন্থীগণ ইজমাকে মনে করেন সকল মুজতাহেদীনের ঐকমত্য। সমকালীন বিশ্বে এটাকে মনে করা হয় কর্তৃতশীল উলামাদের একমত্য। এইমত অবশ্য অগ্রহণযোগ্য। আলেমগণ এখন আর মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের প্রধান স্রোত ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন না এবং জনসম্পৃক্তির দিক দিয়েও তাঁরা প্রতিনিধিত্বশীল নয়। বর্তমানে বিশ্বে যে সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে সেগুলোর সাথে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নিশ্চিত রূপেই কোন সংযোগ নেই। এজন্য প্রায়ই তাদের মতামত বিভ্রান্তিকেই বৃদ্ধি করে।

এটা পরিস্কার যে, ইজমার সহজ সনাতন ধারণা এখন আর একটি অসনাতন সমাজ ব্যবস্থার জন্য উপযোগী নয়। আইন এবং নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জটিল কৌশল এবং বিবেচনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনক্রমেই ইজমার প্রয়োগের মধ্যে সীমিত করা যায় না।

---

৪৩ M. Abu Zahrah, Malik, পৃ: ৩২৪-৩২৫.

৪৪ A. Khallaf, Ilm Usil al Fiqh, পৃ: ৪৯, এবং M. Mahmasani, al Awda al Tashiryah, পৃ: ১৫০.

www.pathagar.com

এটাও পরিষ্কার যে, বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইজমা এর ক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য অংশের জনগণের ঐকমত্যের প্রয়োজন আছে। অন্যকথায় বলা যায় ইজমার প্রয়োগের অধিকার এখন আর কেবল পেশাদার ওলামাদের মধ্যে সীমিত বলে ধরে নেয়া যায় না। তদুপরি স্থানকালের প্রেক্ষিতে একটি পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে স্থায়ী ইজমার ধারনা বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মত পরিবর্তনশীল ক্ষেত্রে বাস্তবও নয়, সম্ভবও নয়।

মৌলিক ত্রুটি বিচ্যুতি

আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি যে, চিরায়ত এবং সমকালীন জুরী এবং চিন্তাবিদগণ অনেকাংশেই স্থান কালের ধারণাকে এবং ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম পদ্ধতি বিজ্ঞানের প্রয়োগ এবং এর কাঠামোর সাথে স্থান কালের সম্পর্ককে উপেক্ষা করে এসেছেন। ঐ পদ্ধতি বিজ্ঞানে দু'টি অতিরিক্ত দুর্বলতা বিদ্যমান আছে। এর একটি হল পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহে ব্যর্থতা এবং যুগপথৎভাবে অপরটি হল একটি সুশৃংখল দৃষ্টিভংগি প্রয়োগে ব্যর্থতা।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাব

উসূলের সূচনা লগ্ন হতেই আমরা দেখতে পাই, মুসলিম জুরীবৃন্দ কুরআন এবং হাদিসকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ মৌলিক উৎসের উপর ভিত্তি করেই তাঁরা নীতি প্রণয়ন এবং নীতি সংরক্ষণ করেছেন। শরীয়াহ মোতাবেক সামাজিক পদ্ধতি সংরক্ষণ করতে গিয়ে তাঁরা কুরআন এবং হাদিসকে প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আভ্যন্তরীন এবং বহিঃসম্পর্ক বিষয়াদির সমাধানের জন্য এগুলোর উপরই তাঁরা নির্ভর করেছেন। এই প্রক্রিয়াকে তাঁরা নাম দিয়েছেন *উসূল ইসতিনবাতুল ফিকহ* (আইনগত সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার জন্য নীতি)। [৪৫] মেডিসিন, গণিত এবং ভূগোলের ন্যায় প্রকৃতি বিজ্ঞানে অবশ্য মুসলমানগণ টেক্সট এবং যুক্তি উভয়ের উপরই নির্ভর করেছেন। তাঁরা বাস্তববাদী এবং পরীক্ষা নির্ভর দুটোই ছিলেন। প্রয়োগ ও করেছেন আরোহ এবং অবরোহ পদ্ধতি। রাষ্ট্র বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান এবং সমাজ মনোবিজ্ঞানের মত সামাজিক বিজ্ঞান বলতে মূলত কিছু ছিল না। কারণ এসব বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, মানুষ নিজের এবং বাস্তবতা সম্পর্কে গবেষণা করার কোন সুশৃংখল প্রক্রিয়া ছিল না। উল্লেখযোগ্য ব্যতীক্রম হলেন ৮ম হিজরীর পন্ডিত ইবন্ খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খৃঃ) তিনিই আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞানের প্রকৃত যাত্রার সূচনা করেন।

৪৫ A. Khallaf, উ: গ্র: পৃ: ১১-১২; M. Abu Zahrah, Ibn Hanbal, পৃ: ২০৫.

www.pathagar.com

এই অসম ক্ল্যাসিক্যাল মুসলমান বিকাশের দু'টি প্রধান কারণ প্রনিধানযোগ্য। এর প্রথমটি ছিল- পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে- নবী করিম (সঃ) প্রবর্তিত এবং ধর্মীয় গ্রন্থাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ বিদ্যমান সামাজিক পদ্ধতি নিয়ে সাধারণ সন্তুষ্টি। দ্বিতীয় কারণটি মোতাযিলা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার মধ্যে নিহিত বলে মনে হয়। আন্দোলনটি ছিল যুক্তিবাদ এবং ওহীর বিষয়াবলীকে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ হতে সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা। এর ফলে তাঁরা ইসলামে যৌক্তিক দর্শন বিকশিত করার জন্য একটি স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হননি।[৪৬]

নবম এবং দশম শতাব্দীতে গ্রীক দর্শন এবং যুক্তিবাদ ও ওহীর মধ্যস্থিত সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামী উদার অবস্থানের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া বিরাজমান ছিল। এই প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে মুতাজিলাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটে। এর সাথে মৃত্যু ঘটে ইসলামী সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত গবেষণা এবং পরীক্ষা নিরিক্ষার।[৪৭] ইমাম গাজ্জালী (৪৫০-৫০৫ হিঃ) রচিত *তাহাফুতুল ফালাসিফা* (দার্শনিকদের মতবাদ খন্ডন) নামক গ্রন্থ ৫ম হিজরীতে যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের একটি সীমানা স্তম্ভ।

এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে গোঁড়া সনাতন শিক্ষা পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতিতে জোর দেয়া হয়েছে বেশী পুঁথীগত বিদ্যার উপর। আইন এবং সামাজিক গঠন প্রকৃতি সংক্রান্ত পদ্ধতিগত জ্ঞান বিকাশের জন্য তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি।[৪৮] এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে কুরআনের সে দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যেখানে মানবিক উপলব্ধির (সাহাদাহ) কথা বলা হয়েছে। সনাতন পদ্ধতিতে বিধৃত এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সহজেই ঐসমস্ত লোকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছে যারা সমাজের প্রধান স্রোতধারা থেকে বাস্তবক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাপন করেছেন। এ গোষ্ঠী সমাজের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথেও কোন প্রকার সংযোগ রক্ষা করেনি। এ শ্রেণীর মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা ছিলেন স্বভাবগতভাবেই সাহিত্যিক অথবা ছিলেন স্থিতাবস্থা বজায় রেখে চলার ব্যাপারে আগ্রহী। এর অনিবার্য পরিণতি এ দাড়িয়েছে যে, মুসলিম সামাজিক

---

৪৬ দেখুন E. I. J. Rosenthal, Political Thought, পৃ: ১১৪-১১৫; Ignaz Goldzieher, Mawq if Ahl al Sunnah bi Iza Ulum al Awaitl, in al Turath al Yunani ft al Hadarah al Islamiyah: Dirasat It Kibar al Mustashrigin, ৩য় সং. (Cairo: Dar al Nahdah al 'Arabiyah, 1965); Abu Zahrah, Fi Zill al Islam, পৃ: ১৭-৩০; এবং T. J. Boer, Tarukh al Falsafah fi al Islam, translated from German by Muhammad 'abd al Hadi, abu Ridah, ৪র্থ সং. (Cairo: Lajnat al Talif wa al Tarjamah wa a Nashr, 1957), পৃ: ৯৫-১২৫.

৪৭ A. Hourani, Arabic Thought, p. 18; H. A. R. Gibb, Islamic Civilization, উ: গ্র: পৃ:১০-১৪, ১৪৮-১৪৯ এবং W. Watt, Islamic Thought,পৃ: ১৬২-১৬৪.

৪৮ দেখুন Fazlur Rahman, Islamic Methodology, পৃ: ১৬৮-১৭৯.

www.pathagar.com

গবেষণা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সঠিক অবদান থেকে হয়েছে বঞ্চিত। এমনকি সুসংঘটিত সামাজিক বিজ্ঞানের কোন ধারণাও বিকশিত হতে পারেনি। এই সমস্ত কারণে *'সিয়ার'* নিছক একটি নিয়মমাফিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসাবেই চলে এসেছে। এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইসলামিক গতিশীল পরীক্ষা নিরীক্ষা নির্ভর গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে রূপ লাভ করতে পারেনি।

এটা সত্যি নয় যে, ইসলামী গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা কালে জুরীগণ কেবল ঐশী নির্দেশনার দ্বারাই পরিচালিত হন। এ প্রক্রিয়ায় তাঁদের অর্জিত জ্ঞান এবং উপলব্ধিকেও কাজে লাগাতে হয়। একবারে নিরপেক্ষ মন নিয়ে কেউই ঐরূপ কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারেননি। আরোহ এবং অবরোহ উভয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগের অভাবে মারাত্মক ত্রুটি বিচ্যুতি এবং ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ, আবিষ্কার এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং পদ্ধতি বিজ্ঞানের প্রভাব বলয়ের আওতায় থেকেই প্রধানত মুসলমানগণ তড়িঘড়ি করে নতুন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তাদের গ্রন্থাবলীর পুনর্ব্যাখ্যা করেছেন। তবুও আইন, সামাজিক বিজ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সম্বন্বিত এবং পদ্ধতিগত গবেষণার সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। বর্তমানে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ লক্ষ্যে আজও মৌলিকত্বের অভাব দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা আজও এক প্রতিকূল শিক্ষা ব্যবস্থারই নিছক করুন অনুকরণ।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক ক্ষেত্র থেকে তিনটি উদাহরণ হতে দেখা যায়, কি ভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দৈনতা মুসলিম সামাজিক গবেষণা এবং ইসলামী সামাজিক বিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করেছে।

প্রথম উদাহরণটি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। এটি হল কুরআনে উল্লেখিত (৮ঃ৬৬) মুসলমান এবং অমুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বিদের উল্লেখিত সংখ্যার অনুপাত সম্পর্কে। ক্ষমতা সংক্রান্ত সমস্যার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগত এবং ধারণাগত গবেষণা আমাদেরকে সম্যক উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে, কি কারণে কুরআনের আয়াতে বিশেষ সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের আয়াতটাকে গভীরভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে ক্ষমতার উপাদানের প্রকাশ ঘটে, নিছক যোদ্ধার সংখ্যার নয়। সংখ্যা সেনা শক্তির কেবল একটি দিকমাত্র। প্রকৃত পক্ষে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যে শক্তির উপাদানে পরিবর্তন সাধিত হওয়ার কারণে কুরআনে মুসলিম যোদ্ধাদের অনুপাত হ্রাস করে ১ঃ১০ হতে ১ঃ২ করা হয়েছে। আধুনিক যুদ্ধ আরও অধিক জটিল। এর মধ্যে রয়েছে শক্তির উপাদানের আরও বিচিত্র সমাহার। এসব উপাদানের প্রকৃতি নির্ভর করে যুদ্ধের প্রকৃতির উপর। গেরিলা যুদ্ধ, ব্যাপক যান্ত্রিক যুদ্ধ, এমন কি যুদ্ধ সর্বাত্মকও

www.pathagar.com

পারমানবিক রূপ গ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয় উদাহরণটি হল গাছ কাটা, বাড়ী ঘর ধ্বংস করা এবং পশু হত্যা করার ব্যাপারে সেনাবাহিনীর অধিকারের উপর আনুষ্ঠানিক আইনী আলোচনা। দেখুন এ ব্যাপারটি ইবন রুশদ কিভাবে উপস্থাপন করেন;

তাঁদের (জুরীগণের) মতপার্থক্যের (বিজয়ী সেনাদল কর্তৃক ভূমির উপর বর্জ রাখার বিষয়ের উপর) কারণ হল (উভয়ের মধ্যে পার্থক্য) আবুবকর কি করেছিলেন এবং নবী মুহাম্মদ কি করেছিলেন। এটা প্রতিষ্ঠিত বিষয় যে নবী (সঃ) বনু নজীরের পাম গাছ (তালজাতীয় গাছ) জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। এটাও সুনিশ্চিতভাবে জানা যে, আবুবকর (রাঃ) নবী (সঃ) সৃষ্ট উদাহরণের বিপরীত কাজ করেছিলেন। যদিও এটা ধরে নেয়া হয় যে, তিনি এরূপ করেছিলেন দুটি কারণের একটির জন্য। হয়ত তিনি একটি রহিত করণ সম্পর্কে জেনেছিলেন, অথবা তিনি মনে করেছিলেন, বনু আল নজিরের বিরুদ্ধে পরিচালিত কাজটি ছিল একটি বিশেষ ঘটনা। তারপর যেকোন কারণে, জুরীগণ আবুবকরের অনুসৃত নীতিকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু যাঁরা একেবারে নবী করিম (সঃ) দ্বারা সৃষ্ট উদাহরণের উপরই নির্ভর করেন, তাঁরা অনুসরণীয় কর্তৃত্ব হিসাবে আর কারো বা কাজকে গ্রহণ করবেন না। (এই ঘটনায়) তিনি গাছ কাটা অনুমোদন করবেন। মালিক (রঃ) যে কারণে পশু হত্যা এবং গাছ কাটার মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন তা ছিল এই যে, তিনি পশু হত্যার মধ্যে অংগ ছেদনের ব্যাপারটি দেখেছিলেন। অঙ্গ ছেদন হল ইসলামের নিষিদ্ধ। আর এমন কোন তথ্য নেই যে, নবী (সঃ) পশু হত্যা করেছেন। অবিশ্বাসীদের জীবন এবং সম্পদ হানি ঘটানোর ব্যাপারে (মুসলমানদের জন্য) এটাই সীমারেখা।[৪৯]

এই অবস্থানের প্রেক্ষিতে সারাখসী প্রত্যুত্তরে বলেনঃ

কিন্তু আমরা বলি ঃ যদি (এটা) অনুমতি দেয়া হয় (যুদ্ধে) মানুষ হত্যার (আল নুফুস) এবং এটা একটা অধিক গুরুত্বের বিষয়, তাহলে ঘর-বাড়ী এবং গাছ ধ্বংসের বিষয়ও অনুমতিযোগ্য।[৫০]

অবশ্য আমরা দেখি যে, এ সমস্ত যুক্তিতর্ক এখন আর প্রাসংগিক নয়। আধুনিক যুদ্ধে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ অনিবার্য। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, যুদ্ধের বৈজ্ঞানিক এবং যৌক্তিক উপলব্ধি এবং যুদ্ধ কৌশলের ধারণার উপর মতামতের অভাব এবং প্রতিটি

৪৯ Al Shaybani, উ: গ্র: খ: ১ পৃ: ৪৩.

৫০ Ibn Rushd, উ: গ্র: খ: ১ পৃ: ৩১১-৩১২

www.pathagar.com

যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর প্রেক্ষিতে এই যুক্তি হল খুবই দুর্বল অবদান। পেছনের দিকে লক্ষ্যকরে আমরা বুঝাতে পারি যে, নবী করিম (সঃ) অথবা আবুবকর (রাঃ), এ দুজনের কেউই তাঁদের আদেশে এমন কোন যুদ্ধ ম্যানুয়্যাল উপস্থাপন করার আশা পোষণ করেননি যা অফিসারদের দৈনদিন নির্দেশাবলীর জন্য দেখতে হবে। অথবা তাঁরা এও আশা করেননি যে, এর দ্বারা তাঁরা পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রেক্ষিতে বৈদেশিক শক্তির সাথে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ কালে মুসলিম সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের স্বাধীনতা সীমিত করবেন।

এটা সুনিশ্চিত বলে মনে হয় নবী করিম (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) উভয়ই তাঁদের নিজ নিজ উপলব্ধির আলোকে ইসলামী কাঠামোর মধ্যে এমন কিছু করছিলেন যা তাঁদের সমুখে উদ্ভূত পরিস্থিতি দ্বারা প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। বনু আল নাজির এর ঘটনায় একটি শত্রু গোত্রের মোকাবিলা কালে তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত ভবনের আড়ালে দাড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের জীবিকার উৎস ধ্বংস করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এই জন্য যে তারা যেন বের হয়ে এসে আত্ম সর্ম্পণ করতে বাধ্য হয়। তাদের নিয়ন্ত্রণে (কমান্ডে) ছিল পানির কূপ এবং খেজুরগাছ যা অনেকদিনের খাদ্যের উৎস।

ধ্বংসের একটি কৌশল অবলম্বন করে নবী করিম (সঃ) তাঁর সেনাবাহিনীকে মুক্ত করেছিলেন কুরাইশ এবং অপরাপর আরব গোত্রগুলোর কবল হতে একটি ভয়ঙ্কর বিপদ মোকাবিলার জন্য। আবুবকর (রাঃ) যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি তাঁর সৈন্য বাহিনীকে সিরিয়া এবং ইরাকের বিশাল ভূখন্ডে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে শত্রু নয় এমন অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করছিল অজনপ্রিয় শক্তি রোমান এবং পারসিকগণ। বন্ধু জনগণের জীবিকার উপায় উপাদান ধ্বংস করা হত একটি নির্বুদ্ধিতা মূলক নীতি। কারণ এ ধরনের কাজ তাদেরকে শত্রু বানিয়ে দিত এবং তারা অবস্থান নিত গিয়ে শত্রু পক্ষের মধ্যে। অবশ্য এ যুক্তি দুর্নীতি এবং সীমালংঘন অথবা হত্যাসহ বর্জনীয় সকল কিছুর *আদামুল ইফসাদ ওয়া আদাম আল ইসরাফ)* বিরুদ্ধে উচ্চতর কুরানিক মূল্যবোধ ও নীতি কথা নাকচ না করে বরং জোরদারই করে। বিনা প্রয়োজনে কোন কিছুকেই হত্যা বা আহত করা যায় না। এই মৌলিক মূল্যবোধ এবং নীতিমালাই নিঃসন্দেহে নবী করিম (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) উভয়কেই পরিচালিত করেছে বিজয় অর্জনে এবং মানুষের জীবন রক্ষায়। জুরীগণের দ্বারা এর আর কোন আক্ষরিক বা আবেগ নির্ভর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় উদাহরণ হল তরবারির আয়াতের *(আয়াতুল সাইফ)* মত ঘটনাবলীতে *নাসখের* কৌশলের ভূমিকা সংক্রান্ত। এ জন্য সমকালীন মসুলিম পান্ডিতবর্গ ক্ল্যাসিক্যাল জুরীগণকে ভুল করে এ অপবাদ দিয়েছেন যে, তাঁরা অবচেতন ভাবে তাঁদের আশু

www.pathagar.com

প্রয়োজনের অধীনে নিজেদের উপলব্ধিকে ন্যস্ত করে আপোষ করেছেন। [৫১] এটা বুঝা খুবই কষ্টকর যে, কেন সমকালীন মুসলিম জুরীবৃন্দের অনেকে এরূপ ভুল করলেন, বিশেষ করে তৎকালে বিরাজমান পরিস্থিতিতে ক্ল্যাসিক্যাল জুরীগণ জীবন যাপন করেছেন সে সম্পর্কে কিছু দূরদৃষ্টির প্রয়োগ না করে? মক্কী জীবনের শুরু থেকে মাদানী সময়ের চূড়ান্ত কাল পর্যন্ত কুরআনিক অভিজ্ঞতার আনুভূমিক দিক সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধিকে ঐ সমস্ত পরিস্থিতি প্রভাবিত করেছে। মুসলিম ইতিহাসের ক্ল্যাসিক্যাল সময়কাল মূলত ছিল মদিনা সময় কালেরই (৭-১১ হিজরী/৬২৮-৬৩২ খৃঃ) শেষের দিকের বিস্তৃতি। এ সময় মুসলমানদের অবস্থান ছিল উচ্চমানের। শক্তি সমর্থের দিক দিয়েও তাঁরা ছিলেন তখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপরে। উমাইয়া এবং প্রাথমিক আব্বাসীয় রাজত্বের (৬০০-৯০০ খৃঃ) আওতায় আইন বিজ্ঞান এবং তার *উসূলের* প্রতিষ্ঠার জন্য গঠনকাল ছিলএকটি বিজয় দীপ্ত অভিজ্ঞতা যার তুলনা হতে পারে মদিনার শেষ সময়কালের সাথে। *নাসখের* কৌশলের মাধ্যমে মক্কার প্রাথমিক যুগের এবং মদিনার প্রাথমিক কালের অভিজ্ঞতাকে সম্ভবত নাকচ করাই ছিল অনেক জুরীর দৃষ্টিভঙ্গি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মক্কা এবং মদিনাতে ইসলামী আন্দোলনের বিকাশের এবং আরবভূমিতে মুসলিম অমুসলিম সম্পর্কের একটি গভীর বিশ্লেষণধর্মী এবং বৈজ্ঞানিক অনুধ্যান এক ভিন্ন উপলব্ধির জগতের দ্বার উন্মোচন করতে পারতো এবং *নাসখ* কৌশল প্রয়োগও হতে পারতো ভিন্নভাবে। তাছাড়া কুরআনের বিভিন্ন প্রাসংগিক আয়াতের মর্ম থেকে বিভিন্ন আইন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হত। উপরের বর্ণিত উদাহরণগুলো সমসাময়িক জ্ঞান এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে বোধগম্য। কিন্তু বর্তমানে একই দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতিগত কাঠামো নিয়ে অগ্রসর হওয়া সঠিক হবে না। বরং সেটা হবে মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী।

মুসলিম সামাজিক চিন্তনের জন্য ইসলামী দেশগুলোর প্রয়োজন একটি নতুন কাঠামো, এরূপ কাঠামো যেটি প্রতিষ্ঠিত হবে মানব জীবনের সামাজিক দিকের সুশৃংখল এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর। তারপরই সম্ভব একটি কর্মোপযোগী আধুনিক দার্শনিক এবং নৈতিক ইসলামী মূল্যবোধের পদ্ধতি অর্জন। এ প্রয়োজন পুরা করার সাথে অবরোহ এবং আরোহ পদ্ধতিগুলো অবশ্যই মুসলিম সামাজিক গবেষণায় প্রয়োগ করতে হবে কঠোরভাবে। হিজরী শতাব্দীর শেষের দিকে (একাদশ খৃঃ) ইজতিহাদের ধারা থামিয়ে দেয়া হয়। এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ তথ্যসূত্র ছিল একই এবং আরোহ পদ্ধতিও ছিল অনুরূপ। তাছাড়া কোন নতুন এবং চলমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার ও অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায়নি আইন বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানের অনুধ্যানে। [৫২] ধর্ম গ্রন্থের

---

৫১ M. Abu Zayd, al Naskh, খ: ২ পৃ: ৫০৬-৫০৮ এবং W. al Zuhayli, উ: গ্র: পৃ: ৭৯-৮০, ১০৮-১১৩, ১৩৫-১৩৮, ১৯২.

৫২ দেখুন H.A.R. Gibb, Modern Trends in Islam, পৃ: ১২৪.

www.pathagar.com

ভিত্তিতে ইসলামিক সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং এসমস্ত ক্ষেত্রে আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির প্রয়োগে ব্যত্যয় ঘটলে সকল উদ্দেশ্যের জন্য পরিচালিত ইজতেহাদ বন্ধ হয়ে যাবে এবং মুসলিম চিন্তন প্রক্রিয়ায়ও গতিশীলতা এবং উৎপাদনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হবে।

সার্বিক শৃংখলায়নের অভাব

কুরআনের ব্যাখ্যা পর্যালোচনাকালে আল শহীদ ইসমাইল রাজী আল ফারুকী প্রাচীন জুরী এবং ব্যাখ্যাকারীদের লেখার শৃংখলায়নের সমস্যাটির উপর আলোকপাত করে বলেনঃ

এটা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, আমাদের পূর্বসূরীগণ অসাধারণ অনুধ্যান সম্পন্ন করে গেছেন। এসবের ফলে গড়ে উঠেছে দূর দৃষ্টির জন্য এক অসামান্য সম্পদ। যদিও এঁদের কেউই এই পদ্ধতির (এক্সিওলজিক্যাল শৃংখলায়ন) অনুসরণ করেননি। আমরা তাঁদের সৃষ্ট লেখার সাহায্য ব্যতীত এরূপ করতে পারিনা। তাঁদের গবেষণায় যে অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে তাঁদের পর্যবেক্ষণ যেরূপ জ্ঞান সমৃদ্ধ, তা কোন অবস্থাতেই অবহেলা করা যায় না। কিন্তু তাঁদের কেউই আজ আমরা যেরূপ এক্সিওলজিক্যাল শৃংখলায়নের প্রয়োজন অনুভব করি সেরূপ তাঁরা কেউই অর্জন করতে সক্ষম হননি।[৫৩]

ফজলুর রহমান এর সাথে একমত কিন্তু তিনি এটাকে পর্যবেক্ষণ করেন ভিন্ন দৃষ্টি থেকে।

আমাদের ফিক্‌হ এর একটি চমকপ্রদ এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, এর বিভিন্ন অংশ এবং আইনগত ধারা এবং ব্যাখ্যাগুলো একটির সাথে অপরটি সত্যিকার অর্থে এমনভাবে বন্ধন যুক্ত নয় যাতে একটি সুন্দর সুশৃংখল পদ্ধতির উদ্ভব হতে পারে। বস্তুত পক্ষে এমনকি একজন অনিয়মিত ছাত্রের দৃষ্টি ও ফিক্‌হ এর এই অসাবধতনতা এড়ায় না। এর ফল দাড়িয়েছে এই যে, বুদ্ধি বৃত্তিক দিক দিয়ে এর প্রায় সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়ে পড়েছে পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন। বস্তুত এর বিকশিত রূপ ও তাই। এজন্য, একটি পদ্ধতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পরিবর্তে এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে- অগনিত অনুপরমানুর সমষ্টি; যেখানে প্রতিটি অনুই স্বয়ং একেকটি পদ্ধতি। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে বলতে হয় ফিকাই এমন সব উপাদানের সমষ্টি যেগুলো একটি লিগ্যাল সিষ্টেমের জন্য জরুরী, কিন্তু নিজে নিজেই যেগুলো কোন সিস্টেম নয়। অবশ্য আমরা এটা অস্বীকার করি না যে, ফিকাহ যথেষ্ট পরিমাণ সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য দ্বারা সঞ্চিত। এ অবস্থা তাকে একটি স্বতন্ত্ররূপ

[৫৩] Ismail R. al Faruqi, "Towards a New Methodology for Qurianic Exegesis," Islamic Studies (March, 1962), পৃ: ৪৭.

www.pathagar.com

দাম করেছে অপরাপর লিগ্যাল সিস্টেম থেকে। আমরা যা অস্বীকার করি তা হলো এই যে, এটা যৌক্তিকভাবে সংযুক্ত, বুদ্ধি বৃত্তিক দিক হতে উৎসারিত, ঘনিষ্ঠভাবে বিন্যস্ত কোন লিগ্যাল সিস্টেম নয়।[৫৪]

ইতিপূর্বে আলোচিত এক বা একাধিক বিষয়ের উপর আইন বিজ্ঞান এবং *সিয়ার* এর উপর লিখিত ক্লাসিক্যাল রচনাবলীতে বোধগম্য শৃংখলায়নের অভাব পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। আইন এবং ইসলামী সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সমূহে একটি সুশৃংখল বোধগম্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা সত্যিকার অর্থেই একটি সমকালীন মুসলিম সমস্যা।[৫৫] ক্ল্যাসিক্যাল জুরী এবং পন্ডিতবর্গের নিকট সমস্যাটির অস্তিত্ব অনুভূত হয়েছে কদাচিত। তাঁদের একটি সামাজিক পদ্ধতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল না। ছিল না বিদ্যমান পদ্ধতির কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্য। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যমান পদ্ধতির অংশগুলোর খুটি-নাটিগুলোকে তুলে ধরা এবং খাপ খাইয়ে দেয়া। বিদ্যমান অবস্থা এবং মানসিক কাঠামোতে জুরীবৃন্দের রচিত গ্রন্থাবলী বিভিন্ন দিক থেকেই ছিল যৌক্তিক এবং সুশৃংখল। সমকালীন মুসলিম সামাজিক পদ্ধতি নতুন পরিবর্তন, প্রয়োজন, চ্যালেঞ্জ এবং চাপের মুখোমুখি এসে স্থবির হয়ে গেছে এবং এ পরিবর্তন এতই প্রচন্ড যে, সনাতন ব্যবস্থার নিছক সংরক্ষণ দ্বারা আর কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয় এবং এটা কাঙ্ক্ষিত ও নয়।

বর্তমান যুগের মুসলিম চিন্তাবিদগণের অবশ্যই একটি পরিছন্ন কার্যোপযোগী এবং ইসলামিক সামাজিক পদ্ধতির একটি কাঠামো অর্জন করতে হবে। নবী করিম (সঃ) এবং তাঁর সাথীবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক পদ্ধতির মডেল হল *সুন্নাহর* সামগ্রিক রূপ। এ *সুন্নাহ* এক গুরুত্বপূর্ণ সহায় যা থেকে আমরা ইসলামের মৌল দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধগুলো সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু বর্তমান যুগের প্রয়োজন, বাস্তবতা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যে সামাজিক পদ্ধতি নির্মিত হবে, সে ক্ষেত্রে এটা বিষয় ভিত্তিক হুবহু তুলনা বা প্রয়োগ করা যাবে না।

আজকাল মুসলিম ছাত্রেরা যখন প্রাচীন পদ্ধতিতে *উসূলের* ব্যবহার করে তখন শৃংখলায়ন এবং বস্তুনিষ্ঠতার অভাব একটি সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। অথচ প্রাচীন বুদ্ধি বৃত্তিক পরিবেশ এবং অন্তর্নিহিত ধারণা এখন আর বর্তমান নেই এবং প্রযোজ্যও নয়।[৫৬] বর্তমানে এ পরিস্থিতি আধুনিক পন্থীদের জন্য যেমন সমস্যা তেমনি সমস্যা

---

[৫৪] Fazlur Rahman, Islamic Methodology, p. 184; see also, M. A. al Zarqa, al Figh al Islami, পৃ: ১-৫.

[৫৫] N. J. Coulson, A History of Ilamic Law, পৃ: ১-৭ এবং ২২০-২২১.

[৫৬] দেখুন Appendix, note 9.

www.pathagar.com

সনাতনপন্থীদের জন্যও।[৫৭] ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুকরণ তেমনি ভুল যেমন ভুল বৈদেশিক পদ্ধতির অনুকরণ। কারণ উভয়ক্ষেত্রেই সমকালীন মুসলিম জনগণ এবং মুসলিম বিশ্বের বিদ্যমান বাস্তববতার সঠিক উপলব্ধির অভাব প্রতিফলিত করে।

সমকালীন মুসলিম চিন্তাবিদ এবং পন্ডিতবর্গের এটা উপলব্ধি করা উচিৎ যে মুসলিম সামাজিক জীবন এবং পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয়ের উপর সম্পাদনা এবং ক্ষণস্থায়ী প্রতিফলন এখন আর যথেষ্ট নয়। তাঁদেরকে সৃষ্টি করতে হবে ইসলামিক সামাজিক এবং মানবিক বিজ্ঞান। তাদের ইসলামী জীবনের গবেষণার লক্ষ্য এবং পদ্ধতিগুলোর শৃংখলায়নের জন্য এটা প্রয়োজন। এটা আরও এজন্য প্রয়োজন যে এতে করে তাঁরা নিজেদেরকে তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে সমাজজীবনের ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত করতে পারবে। তারা বুঝতে পারবে সমাজ জীবনের প্রকৃতি কিরূপ এবং কিভাবে সমাজে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে। এর মাধ্যমে ইসলামী গ্রন্থগুলোর সাথে এবং নিয়মকানুনের সাথেও তাঁদের পরিচিতি ঘটবে। তাঁরা এ প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে এবং বিকশিত করতে পারবে আরোহ এবং অবরোহ ইসলামিক পদ্ধতি বিজ্ঞান।

সার সংক্ষেপ

১। সাধারণভাবে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তার সমস্যা তথ্য সম্ভারের মধ্যে ততটা নিহিত নয় যতটা নিহিত পদ্ধতি বিজ্ঞানের মধ্যে ।

২। *সুন্নাহর* নির্ভর যোগ্যতার সমস্যাটি মূলত শতাব্দীকালের প্রাচীন আইন বিজ্ঞান নিয়ে মুসলমানদের অসন্তুষ্টির একপ্রকার বহিঃপ্রকাশ এবং প্রতিফলন।

৩। *ইজতিহাদের* সমস্যা এবং সংশ্লিষ্ট আইন বিজ্ঞান এবং *সিয়ার* সংক্রান্ত প্রশ্নের উৎস হল উসূলের প্রকৃতি সম্পর্কে উপলব্ধির অভাব। প্রয়োজন মোতাবেক খাপ খাইয়ে নেয়ার ব্যর্থতার সাথেও এ প্রসংগটি সংশ্লিষ্ট।

৪। *উসূল ইনসতিনবাত আল ফিকহ* (আইন বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সূত্র এবং পদ্ধতি মুসলিম আইন বিজ্ঞান প্রণয়নের জন্য) এর উদ্ভাবন এবং এর প্রণয়ন করা হয়েছিল রাজতন্ত্র কালীন সনাতন সামাজিক পদ্ধতির সংরক্ষণ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে।

---

৫৭ দেখুন A. Khallaf, উ: গ্র: পৃ: ২০-৯৬; Muhammad Yusuf Musa, al Fiqh al Islami Madkhal it Dirasatiht; Nizam al Mu amalah fiht, ৩য় সং (Cairo; Dar al Kutub al Hadithah, 1958), পৃ: ৪৮, ৬৫-৮৪, ১২৭-১৪২; S. Mahmasani, উ: গ্র: পৃ: ৯০-১০৮; S. Ramadan, Islamic Law, পৃ: ১১-১২ এবং ১৮৪. ওপর দেখুন H. A. R. Gibb, Modern Trends in Islam, পৃ: ৭৩, ৮৪, ১০৭, ১২১-১২৪; ১২৪; I. al Faruqi, উ: গ্র: পৃ: ৪৭; N. J. Coulson, উ: গ্র: পৃ: ২০২-২২৫.

www.pathagar.com

৫। আধুনিক পাশ্চাত্যের উত্থান এবং একটি শিল্পায়িত সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাবের পর বিশ্লেষণের ক্লাসিক্যাল কাঠামো আর কার্যোপযোগী নয় এবং গ্রহণযোগ্যও নয়।

৬। উসূল আর আংশিক বিশ্লেষণের উপর ভর করে চলতে পারে না। একে পুনর্গঠিত হতে হবে। পুনর্গঠিত হতে হবে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ সারসংক্ষেপ এবং শৃংখলায়নের জন্য মুসলিম সামাজিক পদ্ধতি পুনর্গঠনের জন্য এবং ইসলামী সামাজিক বিজ্ঞান সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে।

৭। আধুনিক মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আধুনিক গবেষণার জন্য প্রয়োজন মূল্যবোধ, নির্দেশনা এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সারসংক্ষেপকরণ ও ধারণা গঠন, যাতে মুসলমানগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করার আবার শুরু করতে পারেন। *উসূলকে* সৃষ্টি করতে হবে একটি খাঁটি সমন্বিত এবং সুশৃংখল বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া।

৮। মুসলিম চিন্তাধারা, আইন বিজ্ঞান, সিয়ার এবং সামাজিক গঠনে সঠিক এবং যথাযথ অবদান রাখার জন্য মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের জন্য একটি গৃহীতব্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হল সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় এবং মানবিক বিজ্ঞানে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক গবেষণার সৃষ্টি করা।

৯। কুরআন এবং সুন্নাহর ইসলামী তথ্যসূত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এবং সমাজ ব্যবস্থার পুর্নগঠনে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হল অবরোহ এবং আরোহ প্রক্রিয়া, যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং বস্তুনিষ্ঠ উপাদান এবং তথ্যগত অবদান। এ সমস্ত গবেষণা মাধ্যম দ্বারা মুসলিম চিন্তা নায়ক, বৈজ্ঞানিক এবং আইনবিদগণ ইসলামী আদর্শের তথ্যসূত্রের উপর তাঁদের গবেষণায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং গবেষণামাধ্যমে সুসজ্জিত হবেন। এভাবে যুগোপযোগী উপাদানগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করার প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এটা হবে সমাজ ব্যবস্থায় ভবিষ্যত উন্নয়নের এক বাস্তব সম্মত উপলব্ধির রক্ষা কবচ। মুসলিম সমাজের বিকাশের পরিকল্পনা এবং নির্দেশনায় ও এটা হবে সহায়ক।

১০। হাদিসের বিশ্লেষণের সমস্যাটি মূলত নির্ভর যোগ্যতা সম্পকীয় নয়। সমস্যাটি হল মূল্যায়ন সম্পর্কিত সঠিক বিবেচনা সংক্রান্ত এবং সুস্পষ্ট ব্যবস্থার উপর স্থান কালের প্রভাবের উপলব্ধিজনিত দুর্বলতার।

১১। *কিয়াস* আর ইস্যু ভিত্তিক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হতে পারে না। একে হতে হবে সুশৃংখল কনসেপ্ট নির্ভর, সংক্ষিপ্ত এবং সমন্বিত।

www.pathagar.com

১২। *ইজমা* কেবল কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ বা আইনজ্ঞের ঐকমত্যের বিষয় নয়। এর অর্থ এবং কার্যপ্রণালী সুস্পষ্ট রাজনৈতিক পদ্ধতিতে আইন সভার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট করে প্রণীত হওয়া উচিত। এ পদ্ধতির মধ্যে ইহা আদর্শও বাস্তবের মধ্যে একটি কার্যোপযোগী সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে। এ পদ্ধতিতে মুসলিম জনগণেরও সর্বাধিক সমর্থন এবং অংশগ্রহণ থাকবে।

১৩। *নাসখ* কৌশলের একটি সমন্বিত এবং ধারণাগত উপলব্ধি দরকার। এতে করে সমৃদ্ধ ইসলামি এবং কুরানিক শিক্ষাকে একটি মাত্র ঐতিহাসিক ঘটনার সংকীর্ণতার মধ্যে আটকে দেয়ার ধারা শেষ হবে। কারণ ইসলামের মত একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক সুস্পষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা এ সংকীর্ণতার পদ্ধতিতে আবদ্ধ থাকতে পারে না। এটা করতে হবে আইন করে নয়, পদ্ধতিগত এবং ধারণা গঠন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

১৪। সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং আইন সংক্রান্ত বিষয়ে দূরদৃষ্টি এবং সঠিক ইসলামী সাহিত্যের পর্যালোচনার মাধ্যমে মুসলিমগণ তাঁদের পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় সঠিক দিক নির্দেশনা পাবেন। সমকালীন মুসলমানদের ইতিবাচক অংশ গ্রহণের জন্য এ লক্ষ্যে শিক্ষার প্রয়োজন। হাদিসের নির্ভরযোগ্যতা এবং অন্যান্য আনুসংগিক বিষেয়ের উপর বিতর্কের মাধ্যমে কোন ইতবাচক ফলাফল লাভ করা যায় না।

পরবর্তী অধ্যায় হল এ অধ্যায়ের সুপারিশকৃত বিশুদ্ধ পদ্ধতির একটি পরীক্ষামূলক প্রয়োগ। আমরা ইসলামের মৌলিক তথ্য সূত্র কুরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে এবং সিষ্টেম এনালাইসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তথ্য সূত্র, বিশেষ করে *সুন্নাহকে* উপলব্ধি করার এবং ধারণা গঠন করার জন্য উদ্যোগ নিব। আমরা আরো প্রচেষ্টা নেব কি করে ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিশেষ করে নবী করিম (সঃ) এর সময়ের সুস্পষ্ট সমাজব্যবস্থার উপর হতে স্থানকালের প্রভাবটি অপসারিত করা যায়।

যথাযথ উপাদান এবং তথ্যসূত্র থেকে অবদানের মাধ্যমে যথাযথ সমন্বয় এবং মুসলিম বিশ্বে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় আধুনিক চ্যালেঞ্জের ধারণা গঠনের মাধ্যমে যে দূরদৃষ্টি অর্জিত হবে তা সুষ্ঠু পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং আরও ইতিবাচক অংশগ্রহণের বিষয় সহায়ক হতে পারে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

বিধি বিধান থেকে রাজনৈতিক চিন্তাধারা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম চিন্তাধারার আধুনিক বিকাশ সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করেছি। যদি এমন কোন শব্দ থাকে যা দ্বারা বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান মুসলিম চিন্তাধারার বর্ণনা করা যায় তাহলে সে শব্দটি হল *অপ্রাসংগিকতা*। ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গিতে জিহাদের মধ্যে যুদ্ধের একটি আক্রমণাত্মক ভাবধারা আছে। এটি বর্তমান যুগে দরিদ্র, দুর্বল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তির দিক থেকে পশ্চাদপদ কোন জনগোষ্ঠীর নিকট সুস্পষ্টরূপে অপ্রাসংগিক।

বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান ভাবে সংগ্রামের সম্মুখীন হচ্ছে।[১] এ ক্ষেত্রে নিছক শান্তি এবং আত্মরক্ষামূলক চিন্তাধারা সম্বলিত উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও অপ্রাসংগিক। মানবজাতির দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধিতে আভ্যন্তরীণ এবং বহির্জগতে বিরাজমান অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রয়োজন। এ সংগ্রামে মুসলিম জাতির সর্বাত্মক শক্তি নিয়োজিত হওয়া দরকার সে ক্ষেত্রেও এ দৃষ্টিভঙ্গি অপ্রয়োজন অকার্যকর।

বহির্বিষয়ক ক্ষেত্রে আধুনিক মুসলিম চিন্তাধারা হয়তো মুসলিম মনস্তত্ত্বের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অপ্রাসংগিক, নতুবা যে বিশ্বে মুসলিম জনগণ বসবাস করছে তার বাস্তবতার নিরিখে অপ্রাসংগিক। এটা মনে করা সঠিক নয় যে, মুসলিম মনস্তত্ত্ব, ধ্যান ধারণা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভূখন্ড এবং জনগণের কোন স্বরূপ স্বকীয়তা নেই। মুসলিমদের অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে কি করে আধুনিক প্রতিষ্ঠান এবং চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খাওয়ানো যায় এবং কিভাবে এ প্রসংগে প্রতিক্রিয়া করা যায় এবং কিভাবে সাধারণ মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্ব সমাজে নিজেদের অবস্থান করে নেয়া যায়। তাঁদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে বিভিন্ন সময়ে মুসলিম ভূ-খন্ডের বিভিন্ন অংশে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের জন্য যে কৌশল এবং নীতিমালা উপযোগী, সেগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তুরস্কের জন্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে যা প্রয়োগযোগ্য ছিল তা উনবিংশ শতাব্দীতে যা প্রয়োগ করা যেত তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একইভাবে বলা যায় পাকিস্তানী, ইরানী এবং তুর্কীদের জন্য বর্তমানে যে নীতি প্রযোজ্য তা মিশরীয় এবং সিরিওদের জন্য উপযোগী নীতি হতে ভিন্ন প্রকৃতির।

---

[১] দেখুন অধ্যায়-২, পাদটীকা ৭৩, আরও দেখুন Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt 9New york: Russel & Russel, 1933), পৃ: ২৪৮-২৬৮; and Erwin I. J. Rosenthal, Islam in the Modern National State (Cambridge, UK: University Press, 1965), পৃ: ১১-৩৩

www.pathagar.com

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ের উন্নততর রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক নতুন বাস্তব সম্মত ইসলামিক কাঠামো সৃষ্টির জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাকে একটি পূর্ব শর্ত হিসাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলামী চিন্তাধারায় এইরূপ উদ্যোগ গ্রহণ সংগত হতে পারে কেবল প্রাচীন ইসলামিক উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আমাদেরকে সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দৃষ্টিপাত করতে হবে নবী করিম (সঃ) এর মদিনার রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রতি। ঐ সমস্ত নীতিমালার সনাতন আইনগত ব্যাখ্যার অপসারণে এ প্রচেষ্টা আমাদের সাহায্য করবে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে সনাতন মুসলিম ধারনায় বিদ্যমান কিছু গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি সংশোধন করা। তৃতীয় পদক্ষেপ হল সনাতন পদ্ধতিতে স্থান কালের উপাদান প্রসংগে চিন্তা ধারার মুসলিম নীতি নির্ধারকগণের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান সে সম্পর্কে তাঁদেরকে সচেতন করে বহিঃসম্পর্ক বিষয়ে একটি কার্যোপযোগী ইসলামিক কাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা। এটা করা সম্ভব হলে নীতি নির্ধারকগণ সমকালীন বিশ্বের পরিবর্তনশীল বাস্তবতার মোকাবেলায় সন্তোষজনক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন। চূড়ান্ত পদক্ষেপে এই কাঠামোকে সমকালীন মুসলিম বৈদেশিক নীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিকের বিপরীতে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে একটি আদর্শ ভিত্তিক কাঠামোর সাফল্যের মূল্যায়ন হয় একদিকে ঐ আদর্শের মৌলিক ধারণার প্রেক্ষিতে এর উপযুক্ততা দ্বারা এবং অন্যদিকে নীতি প্রণেতাদের জন্য এর উপযোগ দ্বারা। আমরা প্রথম পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা শুরু করবো। এ পদক্ষেপ হল বহিঃসম্পর্ক বিষয়ে নবী করিম (সঃ) এর দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতি সম্পর্কীয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য সে সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।

ইতিহাসের পুনর্গঠন ঃ নবী করিম (সঃ) এর বহিঃসম্পর্কীয় নীতির রাজনৈতিক যৌক্তিক ভিত্তি

অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত কিছু ত্রুটিপূর্ণ ধারণার উপর আমরা ইতিপূর্বে (২য় অধ্যায়ে) আলোকপাত করেছি। ঐসব ধারণাই ক্ল্যাসিক্যাল যুগে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবনতি ঘটিয়েছিল। ঐ ধারণাগুলো একটি অধিকতর গতিশীল ফেডারেল সিস্টেমের উন্নয়ন, মানবাধিকারের একটি প্রশস্ত পরিসর অর্জন এবং অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করেছিল। ত্রুটিপূর্ণ ধারণার ফলশ্রুতিতে মুসলমান এবং অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি যথোপযোগী সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হতে পারেনি।

কিভাবে এই পরিস্থিতি মুসলমানদের চিন্তা ধারায় ভর করলো তা ব্যাখ্যা করার জন্য

www.pathagar.com

যা বর্ণনা করা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। এটাও পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই যে, বিষয়টির অর্থ এই রূপ নয় যে, অমুসলমানগণ নির্দোষ ছিল অথবা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানদের প্রতি ছিল সহনশীল অথবা সহযোগিতামূলক।

সহযোগিতার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এ দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতিতে আধুনিক মুসলিম লেখকবৃন্দ প্রায় সময় বৈপরীত্য প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁরা মুসলিম ইতিহাসের পুর্নব্যাখ্যা প্রচেষ্টা কালে কৈফিয়তমূলক অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। এইভাবে তাঁরা ইসলামের সমৃদ্ধ এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতার রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং যৌক্তিকতাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। আমি এখানে এমন চারটি মৌলিক বিষয় পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রস্তাব করছি যেগুলো প্রায় সময়ই উল্লেখ করা হয়, কিন্তু ভুল পড়া হয় সনাতনপন্থীগণ দ্বারা। এ চারটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বৈদেশিক বিষয়ে নবী করিম (সঃ) এর আচরণের নিছক আইনগত নয় বরং সর্বোত্তম রাজনৈতিক যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে। এই চারটি বিষয় হলঃ

১। বদরের যুদ্ধে ধৃত যুদ্ধবন্দীবৃন্দ

২। আরবের ইহুদী এবং বিশেষ করে মদিনার বনু কোরাইজ্রার বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযান;

৩। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের প্রধান শত্রু কোরাইশদের প্রতি গৃহীত উদার নীতিমালা

৪। আহলে কিতাবদের প্রতি প্রদর্শিত অব্যাহত সম্মান এবং ধৈর্য

বদরের যুদ্ধের যুদ্ধবন্দী

মক্কা হতে মদিনায় নবী করিম (সঃ) *হিজরাতের* (দেশত্যাগ) পর দ্বিতীয় বর্ষে মুসলমান এবং কোরাইশ গোত্রের মধ্যে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[২] প্রায় তিনশত মুসলিম প্রায় এক হাজার কুরাইশ যোদ্ধার মোকাবিলা করে। মুসলমানগণ এতে এক সিদ্ধান্তমুলক বিজয় অর্জন করেন। এ যুদ্ধে কোরাইশ নেতাদের অনেকেই নিহত অথবা বন্দী হয়। প্রায় ৭০ জন বন্দীর মধ্যে মাত্র দুইজনকে আইনানুগ প্রাণদন্ড দেয়া হয়। বাকীদেরকে বিভিন্ন অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হয়। মুসলমান কোরাইশ এবং আরবের অন্যান্য আরব ও ইহুদী গোত্রের মধ্যে বদরের যুদ্ধই ছিল প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষ। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ বারটি বছরের চাপ এবং মারাত্মক নির্যাতনের পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বার বছরের অত্যাচার নির্যাতনের সংকটকালে মুসলমানদের অনেকেই বাধ্য হন পলায়ন করতে, প্রথমে আবিসিনিয়ায় এবং পরে মদিনায়।[৩]

---

[২] দেখুন Abu Muhammad 'Abd al Malik Ibn Hisham al Ma afir, al Sirah al Nabawiyah, সংস্করণ M. al Saqqa, I. al Ibiari, and A. Shalabi, ২য় সংস্করণ (Catro: Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuh, 1955), খ. ১ পৃ: ৬০৫-৭১৫; খ. ২. ৩-৪৩; এবং ibn Athir, al Kamil fi al Tarikh, খ. ২. পৃ: ৩৭.

[৩] দেখুন Ibn Hisham, উ: গ্র: খ. ১. পৃ: ২৬৫-৩৯৫, ৬৪২-৬৪৬.

www.pathagar.com

কোরাইশ যখন মদিনার লোকদেরকে নবী করিম (সঃ) এবং তাঁর কোরাইশ অনুগামীদেরকে মদিনা থেকে বহিস্কার করে দেয়ার জন্য প্ররোচিত করতে সচেষ্ট হয় তখন নবী (সাঃ) অনিবার্য সংঘর্ষ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে মুসলিম শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত করার কাজ শুরু করেন।[৪] তিনি মদিনার ইহুদী গোত্রসমূহ এবং মুসলমানদের মধ্যে একটি সম্মানজনক শান্তিচুক্তি (মদিনা চুক্তি) সম্পাদন করেন। *আনসার* এবং *মুহাজিরদের* ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে মদিনার চতুর্দিকে অভিযান প্রেরণ করেন।[৫] একটি কোরাইশ কাফেলার বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রথম আক্রমণেই ইবনে যাহশ এর গোয়েন্দা অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই অভিযানের গুরুত্ব এই যে, এটা কোরাইশ সেনাদলের অগ্রাভিযানকে প্রথমে মদিনা এবং পরে বদ্রুরের যুদ্ধের দিকে পরিচালনা করছিল। এ ঘটনা উপলক্ষে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নহে। (৮ ঃ ৬৭)

আইনের বিধানের চুলচেরা অনুসরণ (লিগালিজম) মুসলিম লেখকবৃন্দকে এই আয়াতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করার পর্যায়ে পরিচালিত করেছে আর একটি আয়াতের মাধ্যমে বিপরীত যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা। সে আয়াতটি নিম্নরূপঃ

অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে। (৪৭ঃ৪)[৬]

সংশ্লিষ্ট লেখকবৃন্দের যুক্তি হল, প্রথম আয়াতটি কোন স্থায়ী আইন প্রণয়ন বা রায় নয়। দ্বিতীয় আয়াতটি হল স্থায়ী এবং প্রতিষ্ঠিত রায় যা দ্বারা যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্য নিরূপিত হয়। প্রথমটি হল কেবল মুসলমানদেরকে গ্রহণ করার দায়ে দোষারূপ করার জন্য এবং এটা দেখিয়ে দেয়ার জন্য যে, আল্লাহর ইচ্ছা যুদ্ধ বন্দী গ্রহণ করা নয়।[৭]

নাসখ এর সেকেলে এবং স্থবির কৌশল প্রয়োগের এটাই আধুনিক পদ্ধতি।

---

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১৭-৩৯০, ৪১৯-৪২৯, ৫৯১-৬০৬.

[৫] দেখুন M. Hamidullah, al Wathaiq al Siyasiyah, পৃ: ৩৯-৪৭; and Ibn Hisham, উ: গ্র: খ. ১. পৃ: ৫০১-৫০৪, ৫৯০-৬০৬.

[৬] দেখুন al Zuhayli, উ: গ্র: পৃ: ৪০৬-৪০৮.

[৭] প্রাগুক্ত.

www.pathagar.com

সমকালীন লেখকগণ প্রায় সময় এক প্রকার উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। একটি নিরাপদ এবং সুষ্ঠু নীতি হিসাবে যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেয়ার বিষয় বিবেচনা করে তারা এ উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেন। দোষারোপের আয়াতের (বদরযুদ্ধে ধৃত সকল যুদ্ধ বন্দীকে হত্যা না করার জন্য) তীব্রতা হ্রাস করেন এটা বলে যে, এটা হল ক্ষণস্থায়ী ধরনের কিছু এবং এটা প্রযোজ্য ছিল কেবল প্রাথমিক যুগের মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কালে।[৮] অন্য একটি বিকল্প দৃষ্টিতেও আধুনিক লেখকগণ বিষয়টিকে দেখেন। সেটা হল নিছক যুদ্ধ বন্দী হিসাবে না দেখে যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে একটি আইনগত বিষয় হিসাবে এটিকে যুক্তিযুক্ত করা।[৯]

যে পরিস্থিতিতে মুসলমানদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে পরিস্থিতির গুরুত্ব এ লেখকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয় না। এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে প্রথম আয়াত নাযিল হয় এমন এক সময়ে যখন মুসলমানদের উপর মারাত্মক চাপ বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে দ্বিতীয় আয়াতটি গভীর ভাবে পরীক্ষা করলে প্রতীয়মান হয় যে মুসলমানদের বিজয়ের বিষয়টি ছিল পূর্ব পরিজ্ঞেয়।

বদরের যুদ্ধ সংঘটনে এবং তা থেকে সৃষ্ট পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মদিনা যুগের প্রাথমিক দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্য ব্যবস্থা, নীতিমালা এবং ঘোষণা সমূহের অর্থ এবং তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য আমাদেরকে বদরযুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ সুরা আনফালের অংশগুলোকে গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।[১০]

এটা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক যে, নবী করিম (সঃ) এর প্রতি উপদেশমূলক কতিপয় আয়াত, যেগুলোতে মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য চরম ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো, সুরাতুল আহযাবের পরিবর্তে সুরাতুল আনফালের অন্তর্ভুক্ত (নবী সঃ এর নির্দেশে) করা হয়েছে। এটা উপলব্ধি করা জরুরী যে, সুরাতুল আহযাব বাহ্যত অবতীর্ণ হয়েছে খন্দকের যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী বনু কুরাইজার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে মুসলমানদের বিজয়ের প্রেক্ষাপট কি ছিল সেদিকে নির্দেশ করছে।

---

[৮] প্রাগুক্ত.

[৯] দেখুন Muhammad Ahmad Ba Shumayl, Ghazwat Badr al Kubra, খ. ১. of Min Maarik al Islam al Fasilah, ৪র্থ খ (Beirut; Dar al Kutub, 1969), পৃ: ২২৭-২২৯; Muhammad al Ghazali, Figh al Sirah, ৪র্থ সং (Cairo: Dar al Kutub al Haditha, 1964), পৃ: ২৫৪-২৫৫; and Nadav Safran, Egypt in Search of political Community, পৃ: ২১৩.

[১০] দেখুন al Naysaburi, Asbab al Nuzul, পৃ: ১৩২-১৩৮; Ibn Hisham, উ: গ্র: পৃ: ৬৬৬; এবং al Tabari, Jami al Bayan, খ. ১৯. পৃ: ১৬৮-২৫০, খ. ১০. পৃ: ১-৫৭.

www.pathagar.com

এতে দেখা যায়, সূরাতুল আনফালে মদিনার প্রাথমিক সময়কালে মুসলমানগণ যে চাপের সম্মুখীন হয়েছিলেন সে বিষয় এবং যখনই তাঁরা অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন সেক্ষেত্রে তাঁদের দিক নির্দেশনা লাভের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[১১]

সূরা আনফালে পাঠকদের নিকট যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করছে সেগুলো হল জনশক্তির অভাবের জন্য মুসলমানদের মধ্যে যে ভীতি সৃষ্টি হয়েছিল তা, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জন্য তাদের যেসব বিষয় প্রয়োজন সেগুলো এবং নবী করিম (সঃ) সকল দিক দিয়ে শত্রুদের সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাধীনতা। এই সূরাতে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের জন্য মুসলমানদের আবেদনের বিষয় উল্লেখ আছে। মুসলমানগণ যে তাদের প্রতি কৃত অত্যাচার নির্যাতন এবং ধর্মের বিরোধিতার অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পরস্পর সহযোগিতা করার বিষয়ে আগ্রহী, সে বিষয়টি এ সূরায় প্রকাশ করা হয়েছে।

বদরের যুদ্ধে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোতে আলোচনা আছে। এসব আয়াতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুমকি প্রদান করা হয়েছে। আয়াতগুলো দ্বারা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের একটা প্রতিরোধমূলক কৌশল প্রয়োগের বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে। এ হুমকি ছিল প্রকৃতপক্ষে মনস্তাত্ত্বিক। বাস্তবে হুমকি মোতাবেক বদরের যুদ্ধে আচরণ করা হয়নি। যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা ছিল নবী (সঃ) এর সমগ্র জীবনে একটি বিরল ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। এরূপ ব্যবস্থাকে আইনে পরিণত করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

বনু কুরাইযা ঃ নিরাপত্তা এবং মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে চরম ব্যবস্থার ব্যবহার

মদিনার আরবগোত্রগুলো ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বনু কুরাইযা ছিল মদিনায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্রগুলির একটি। ইহুদী গোত্রগুলো ছিল জনসংখ্যা এবং সামরিক শক্তির দিক দিয়ে দুর্বল। কিন্তু তারা ছিল পন্ডিত, শিল্প, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির দিক দিয়ে তাদের আরব প্রতিবেশীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ[১২]

মুসলমান এবং মদিনার ইহুদী গোত্রগুলোর মধ্যে একটা ফেডারেল ব্যবস্থা ছিল। বনু কুরাইযা ছিল এ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যবস্থায় ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগ ছিল। আরও

---

[১১] দেখুন Ibn Hisham, উ:গ্র:খ.২ পৃ: ২৪৫-২৫০; al Tabari, খ. ১০. ২৫-৩৫; এবং the Quran (৮:১৯, ২৬, ৩০, ৩৮, ৩৯, ৪৫, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬৭, ৭০-৭৩, এবং ৮১).

[১২] দেখুন Bernard Lewis, The Arabs in History, পৃ: ৪০.

www.pathagar.com

এতে ছিল, স্বায়ত্বশাসন এবং মুসলমানদের বড় শত্রু কুরাইশদের বিরুদ্ধে একটি সামরিক জোট।[১৩]

কুরাইশ, গাতফান, কায়েস এবং বনু নজির গোত্রসমূহ মিলে একটি জোট গঠন করে। এ জোট বিরাট এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলে। এ সেনাবাহিনী নিয়ে তারা মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। নগরীর অবরোধ কালে বনু কুরাইযা মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে তারা আক্রমণকারীদের সাথে আলাপ আলোচনার সূত্রপাত করে। বনু নজিরের হুয়ে ইবন আহতাব এসব আলোচনার সূচনাকারী এবং মধ্যস্থতাকারী ছিল। বনু নজির গোত্রটি সেই গোত্র যাদেরকে মদিনা হতে কুরাইশদের সাথে দালালী কালে শত্রুতামূলক ও ধ্বংসাত্মক কাজের অপরাধে মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। বনু কুরাইযা এবং আক্রমণকারীদের মধ্যে এসব আলোচনা অবশ্য সফল হয়নি। কারণ বনু কুরাইযাদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। অবরোধ ভেঙ্গে যাওয়ায় মুসলমান এবং বনু কুরাইযাদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় আমরা দেখেছি যে খন্দকের যুদ্ধের সমগ্র অধ্যায় এবং মদিনার বিরুদ্ধে বিশাল জোটটি ছিল মুসলমানদের জন্য একটি ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি। নবী করিম (সঃ) গাতফান গোত্রকে বলেছিলেন, যদি তারা মুসলমানদের উপর হতে কিছু চাপ প্রত্যাহার করে তাহলে তাদের মদিনার বাৎসরিক ফসলের তিন ভাগের একভাগ দেওয়া হবে। কুরআন মজিদ এ চাপ এবং মুসলমানদের মধ্যে সর্বাত্মক ধ্বংসের ভীতকে অনুপম বাচনভঙ্গিতে প্রকাশ করে।

মুসলমানদের সাথে বনু কুরাইজারা চুক্তিভঙ্গ করে। এ চুক্তি ভঙ্গ ছিল বিশ্বাঘাতকতাপূর্ণ। ইহুদী ধর্মযাজকগণ ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক যুদেধর প্রচারণা চালায়। এতে তারা বলে ইহুদী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণের জন্য মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এ বিষয়টির নৈতিক এবং আইনগত অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে বলে লেখকগণ খুব জোর দিয়েছেন।[১৪] অনেক শতাব্দী পর লেখক বৃন্দের দৃষ্টি

---

[১৩] প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৪২-৪৫; F. Gabrielli, Muhammad, পৃ: ৬৪-৬৫, ৭২-৭৬; Muhammad Hamidullah, The First Writtten Consititution in the World; aAn Important Document of the Time of the Prophet, ২য় সংশোধিত সং (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1968), পৃ: ৪৮-৪৯, ৫১-৫২. মোহাম্মদ তালাও আল ঘুনেমী প্রস্তুতকৃত সারসংক্ষেপ এবং অনুবাদ দেখা ও প্রয়োজনীয় The Muslim Conceptionof International Law and the Westem Approach (The Hague: Martinus Nijhoff, 1968), পৃ: ৩৭. বানু কুরাইজার বিরুদ্ধে কিরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা অনুধাবন করার জন্য দেখুন।

[১৪] দেখুন F. Gabrielli, উ: গ্র: পৃ: ৬৪-৮০; Muhammad Ba Shumayl, উ: গ্র: খ. ৪. পৃ: ২৩৮-২৭০; M. al Ghazali, উ: গ্র: পৃ: ২৫৭-২৬০; Mahmud S. Khattab, al Rasul al Qaitd (Bangdad: Dar Maktabat al Hayah, 1960), Mahmud S. Khattab, al Rasul al Qaitd (Baghdad: Dar Maktabat al Hayah, 1960), পৃ: ১৬১-১৬২; Sayyid Ameer Ali, the Spirit of Islam: A History of the Evolutin and Ideals of Islam with a Life of the Prophet (London: Methuen, 1922),, পৃ: ৭২-৮২; H. Watt, উ: গ্র: পৃ: ১৬৬-১৭৫; পৃ: M. T. al Ghunaymi, উ: গ্র: পৃ: ৩৮-৪২.

www.pathagar.com

এড়িয়ে গেছে একটি বিষয়ে সে বিষয়টি হল এ ধরনের জোটের মধ্যে যে চরম বিপদ বিদ্যমান সে সম্পর্কে কুরআন মজিদ এবং নবী করিম (সঃ) এর পর্যবেক্ষণ। জোট থেকে ইহুদী চক্র সরে পড়ায় মুসলমানদের উপর এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ে। ফলে তাঁরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে ব্যতিক্রমধর্মী এবং চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রেরণা অনুভব করে। ভবিষ্যতে আর কোন বিশ্বাসঘাতকতা করা হবেনা-এ বিষয়টির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য মুসলমানগণ বনু কুরাইজাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বনু কুরাইজাদের বিরুদ্ধে যে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিষয়টির তাৎপর্য এখানেই। আর কোন যুক্তিই এ বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন না।

কারণটি অর্থ সম্পদ কুক্ষীগত করা নয় বরং আরও অধিক কিছু। তা না হলে অন্য ধনাঢ্য ইহুদী এবং আরবগোত্রগুলোর বিরুদ্ধে কেন বনু কুরাইজার মত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অপরাপর লেখকদের মতে, যদি কারণটি ইহুদীদের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম এবং চুক্তিভঙ্গ হয়ে থাকে তাহলে এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, বনু নাজির এবং কোরাইশ সহ অন্যান্য ইহুদী এবং আরব গোত্রগুলিকে খন্দক যুদ্ধের আগে এবং পরে একই আচরণের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে, এটা লক্ষ্যনীয় যে, ওহুদযুদ্ধের পর বনু নজিরদেরকে মদিনা থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। অথচ হুদাইবিয়ার সন্ধির (কুরাইশদের সাথে) পর খায়বরের ইহুদী গোত্রগুলোকে কেবল তাদের ফসলের অর্ধেক কর হিসাবে দিতে হয়েছিল। সেটিই তাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল। তাছাড়া এক বছর পর মুসলমানদের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী কুরাইশদের তাদের সম্পদের বিনিময়ে সম্মানজনকভাবে মুক্তি দেয়া হয়। পরবর্তী শিরনামে কুরাইশ এবং খায়বরের ইহুদী গোত্রগুলোর ক্ষেত্রে কেন ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার রাজনৈতিক কারণ আলোচনা করা হবে।

ইসলাম যদিও সুস্পষ্ট ধর্মীয় অনুশীলন (যেমন যাকাত দান এবং রোজা পালন) প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তথাপি তা কখনও পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের অনুসারীদের (ইহুদী এবং খৃষ্টান) ধর্ম প্রচার এবং পালনের অধিকারের উপর কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। শত্রুদের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সমগ্র ব্যাপারটিই ছিল রাজনৈতিক এবং আমার বিচারে প্রথমিক যুগের ইসলামী কাঠামোর প্রদর্শিত নমনীয়তা এবং বাস্তবতার তাৎপর্য মন্ডিত। এটার অর্থ এই নয় যে, বহিঃসম্পর্কের ইসলামী কাঠামো, নৈতিকতার বাধ্যবাধকতামুক্ত। কারণ কুরআন এবং নবীর সুন্নাহর প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই প্রতীয়মান হবে এ ধরনের দাবী অন্তঃসার শূন্য। বিভিন্ন মুখী শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে এই যে, মুসলিম সরকার এবং সম্প্রদায়ের মৌলিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সমূহ ইসলামী কাঠামোর সীমা রেখার মধ্যে অবশ্যই বাস্তব সম্মত এবং নমনীয় হতে হবে। এ কাঠামো যদিও নৈতিক আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর

www.pathagar.com

সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তথাপি সংকীর্ণভাবে এবং অন্ধভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য এবং কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

ক্রম বর্ধমান আরব-ইহুদী বিশ্বাসঘাতকতা এবং যাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল সে সমস্ত বনু নজিরের মারাত্মক এবং বিপদজনক ভূমিকার তাজা স্মৃতি মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর সর্বগ্রাসী চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের মধ্যে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটা ভীতির সঞ্চার করেছিল। মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে এজন্য হুজুরে পাক (সঃ) কে সম্ভাব্য সকল প্রকার রাজনৈতিক এবং সামরিক উপায় উপাদান ব্যবহার করতে হয়েছে শত্রুদের একচ্ছত্র শক্তি ধ্বংস করার লক্ষ্যে। এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল যে, নবী করিম (সঃ) মদিনায় বনু কুরাইজার বসবাস আর সহ্য করতে পারছিলেন না। ভয়ংকর বিপদের মুখে তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে শত্রু পক্ষের শক্তি বৃদ্ধিও করতে পারছিলেন না।[১৫]

সামরিক এবং রাজনৈতিক মোকাবিলার প্রেক্ষিতে চরম কার্য ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও ধর্মীয় এবং বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে অমুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে মুসলমানদের সাথে সহঅবস্থান করতে দেয়ার ইসলামী অবস্থানকে কখনও অস্বীকার করা হয়নি। বরং নবী করিম (সঃ) সারা জীবন ধরেই এ অবস্থানকে অব্যাহত রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর বিজয়গুলো বহিসম্পর্ক বিষয়ে তাঁর নৈতিক এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিরই কেবল প্রকাশ ঘটিয়েছে। বস্তুত পক্ষে সবসময়ই তিনি চুক্তির শর্ত পুরা করাকে যে কোন বহিঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটি শর্ত বানানোর চেষ্টা করেছেন। এভাবে তিনি নিজের তরফ হতে তাঁর প্রতিপক্ষের উপর নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব ফেলেছেন।[১৬]

আদর্শিক ভিত্তির উপর বিকশিত সমাজগুলোর সাফল্যের জন্য প্রয়োজন নৈতিক

---

[১৫] দেখুন Ibn Hisham, উ: গ্র: খ. ২. পৃ: ৫১-৫৮, ২৭৩-২৭৬; M. T. al Ghunaymi উ: গ্র: ৩৮-৪২; এবং W. M. Watt, ১৪৪০১৭৬. উ: গ্র: পৃ: Yusuf 'Ali, the Holy Quran Text, Translation and Commentary (Brentwood, MD : Amana Corporation, 1983), পাদটীকা ৩৭০১-৩৭০৪ পৃ: ১১১-১১১২.

[১৬] দেখুন the Quran (২৩:৮, ১৭:৯১, ৫:১, ১৬:৯১-৯২, ৯:৪-১৪, ২:১০০, ৮:১০০, ৮:৭২, ৩:৭৬-৭৭, ২:১৭৭, ১৩:২০,২৫, ৬:১৫২, ১৭:৩৪, ৩৩:১৫, ৮:৬১). আরও দেখুন A. A. Mansur. Mnagranat, পৃ: ৫৭-৬১; al Farra; উ: গ্র: পৃ: ৪৮-৪৯; Ibn Malik ibn Anas, al Muwatta, খ. ১. পৃ: ২৯৮; M. Hamidullah, The Muslim conduct of State, পৃ: ৮২ এবং ২০৮; M. Khadduri, War and Peace, পৃ: ২১৮-২২০; M.t. al Ghunaymi, Muslim International Law, পৃ: ১৬১; Muhammad Rashid Rida, Tafsir al Manar, ৪র্থ সং (Cairo: Dar al Manar, 1954), খ. ১০. পৃ: ৫৩-৬০, ১৬৯, ১৭৮-২০৩, ২১৭-২২২ ২২৯-২৩৪,এবং খ. ১১ ২৮১; al Shafi i, al umm, খ. ৪. পৃ: ১৮৪-১৮৬; al Tabari, উ: গ্র: খ. ১০ পৃ: ২৬-২৭. চুক্তির নীতিমালা বাস্তবায়নের উদাহরণের জন্য দেখুন M. Hamidullah, al Watatq, যয. ৫৮-৬৩, ৩৬৯, ৩৭১-৩৭২, ৩৮৭, এবং ৩৯৩-৩৯৪; ওসমানের শাসন কালের এবং ক্যাপিচুলেশন চুক্তির জন্য দেখুন J. C. Horowitz, Diplomacy in the Near and Middle East, খ. ১. পৃ: ১-৫ এবং ৭-৯.

www.pathagar.com

অঙ্গীকার, সফল পরিকল্পনা এবং বৈদেশিক নীতির বাস্তবায়ন। নবী করিম (সঃ) কর্তৃক নীতি প্রণয়নে এসব উপাদানের প্রয়োগ তাঁর সুমহান সাফল্যকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। আমাদের নিজেদের সময়কালে এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিক অঙ্গীকারের অভাবই হচ্ছে বিশ্ব শান্তির জন্য বিপদের সত্যিকারের উৎস।

মুসলিম উম্মাহ এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে নবী (সঃ) জীবনের শেষ দশ বছর কালে সম্পাদিত অন্যান্য রাজনৈতিক এবং সামরিক কার্যাবলীর আরও পরীক্ষা নীরিক্ষা দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিবেশের প্রেক্ষিতে এর মৌলিক স্বার্থ এবং প্রয়োজনের একটি গতিশীল প্রতিক্রিয়া হিসাবে বহিষ্কার এবং প্রতিশোধের বিষয়ে নীতি সংক্রান্ত তারতম্যের তাৎপর্য আরও বেশী করে উপলব্ধি করা যায়।

এসমস্ত কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শত্রুর নেতৃত্ব উৎখাতের মিশনগুলো, বিশেষ করে বনু আল নাজিরের কাব ইবনে আল আশারাফকে হত্যা করার মিশন।[১৭]

মুসলিম লেখকবৃন্দ এসব মিশন এবং যুদ্ধকে আইনের পরিভাষায় ব্যাখ্যা এবং যুক্তিযুক্ত করার লক্ষ্যে যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল ঐ সমস্ত মিশনের রাজনৈতিক এবং কৌশলগত তাৎপর্যের প্রতি তাঁরা খুব কমই মনোযোগ দিয়েছেন।

যেহেতু নবী করিম (সঃ) এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ একটি নতুন জীবন পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করছিলেন সেহেতু তাঁরা কুরাইশ এবং অন্যান্য আরব গোত্রের নিকট হতে খুব প্রতিকূল প্রতিক্রিয়াই আশা করছিলেন। এজন্য তাঁদেরকে নিতে হয়েছিল প্রতিরোধের অবস্থান। মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ার নৈতিক যৌক্তিকতা সহজেই অনুধাবন করা যায়। কিন্তু এটা প্রতিক্রিয়ার কৌশল সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করে না।

মদিনায় প্রথম থেকেই নবী করিম (সঃ) কোরাইশদের প্রধান অর্থনৈতিক স্বার্থ বাধাগ্রস্ত করার প্রয়াস পান। তিনি তাঁর যুদ্ধগুলোকে অকস্মাৎ আক্রমণ করার কৌশল হিসাবে পরিকল্পনা করেন। এমন কি তিনি আবু বশিরকে কোরাইশদের যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রতি একটি গেরিলা কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। শত্রুদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব অপসারনের জন্য নিয়োজিত মিশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল ঐসব মিশনের বিরুদ্ধে যারা কুরাইশদের সাথে জোট বেঁধেছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে। হতবাক করার উপাদান, গেরিলা আক্রমণ এবং কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুমকি-

---

[১৭] দেখুন IbnHisham, উ: গ্র: খ. ২. পৃ: ৩৮৯-৩৯৭.

www.pathagar.com

এসবই শত্রু পক্ষকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে সফল হয়েছিল। সফল হয়েছিল তাদের পদমর্যাদার বিন্যাসে বিশৃংখলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে। এ পদক্ষেপ শত্রু পক্ষের অনেককে মুসলমানদের দলে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল।

এটা হল ঐ ধরনের বাস্তবতা যার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক কৌশলী পরিচালনার ব্যাপক দিগন্ত। এতে ছিল না কোন আইনবিদ এবং আনুষ্ঠানিকতাবাদ। এরূপ বাস্তবতাই নবী করিম (সঃ) এর বৈদেশিক বিষয়াদির সফল পরিচালনার বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে পারে।

কুরাইশ ঃ পরাজিতদের জন্য সম্মান

খায়বরের যুদ্ধের পর নবী করিম (সঃ) মদিনা এবং তার চতুর্দিকের এলাকার বৈরী ইহুদী শক্তির চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটান। উদ্বিগ্ন, অক্ষম এবং হতবল কুরাইশদের প্রতি তাদের মূল্যবান রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বন্ধ করার মাধ্যমে এটা করা হয়।

নবী করিম (সঃ) এবং কুরাইশদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এর উপর কুরাইশরা প্রতিষ্ঠিত থাকতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া যখন তাদের মিত্র বনু বকর খোজাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তখন তাদের দ্বারা স্বয়ং মক্কা মুয়াজ্জামায় সংঘটিত হয় রক্তপাতের তান্ডব। এসময় নবী করিম (সঃ) মক্কার বিরুদ্ধে আচমকা এক বিরাট আঘাত হানার সুযোগ কাজে লাগান।[১৮] তাঁর এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ যখন মক্কা এবং কুরাইশদের আত্মসম্পর্ণে বাধ্য করল, তখন তিনি মক্কার কুরাইশদের দ্বারা মুসলমানদের উপর সুদীর্ঘ নির্যাতনের সকল সিক্ত স্মৃতির পরও তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ সামরিক ব্যবস্থা, ধ্বংস এবং শাস্তির নির্দেশ প্রদান করেননি।[১৯]

বিপরীত পক্ষে, নবী করিম (সঃ) মক্কার নিরাপত্তার জন্য এবং তার অধিবাসীদের নিরাপত্তার বিধান নিশ্চিত করার জন্য সকল কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের ক্ষমতার আওতায় তাদের হৃদয় জয় করার জন্য এবং তাদের সমর্থন লাভের জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করেছিলেন। তিনি এখন হয়ে গেলেন আরবের অবিসংবাদিত নেতা। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে নমনীয় নীতি এবং কুরাইশ ও অপরাপর গোত্র যেমন তাইখের হাওজীন গোত্র এর প্রতি বদান্যতা দেখানো সম্ভব ও ফলপ্রসূ বলে বিবেচনা করেন।[২০] এই সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। তখন মুসলমানগণ একটি শক্তিশালী এবং নিরাপদ

---

[১৮] দেখুন Ibn al Athir, উ: গ্র: খ. ২. পৃ: ২৩৯-২৪০.

[১৯] দেখুন Ibn Hisham, উ: গ্র: খ. ২. পৃ: ৩৯৭-৪-০৭.

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮২-৪৮৬.

www.pathagar.com

জাতি হিসাবে তাঁদের অবস্থান করে নিয়েছিলে। তাছাড়া নতুন পরিকল্পনাও ইতিমধ্যে রূপলাভ করতে শুরু করে। খায়বরের যুদ্ধের পর বৃহৎশক্তি বাইজেনটাইন এবং পারস্যের সাথে যে সশস্ত্র যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে তা তিনি উপলব্ধি করলেন। মুসলিম এবং রোমান সৈন্য বাহিনীর মধ্যে মুতা নামক স্থানে তখন প্রথম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বাস্তবায়ন ঘটে। নিজের পক্ষে আরব এবং কুরাইশদের নিয়ে নবী করিম (সঃ) এর পক্ষে এখন আরবের উত্তর উঞ্চলের উপর বাইজেন্টাইনদের প্রভাব বলয়ের উপর নজর দেয়া সম্ভব হল। উত্তরাঞ্চলের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে এভাবে জড়িয়ে পড়ার একটি ইতিবাচক দিকও ছিল। আর তা হল এই যে, আরব গোত্রগুলির মধ্যে এর ফলে সংহতি এবং উদ্দীপনা সংরক্ষণের চেতনা সঞ্চারিত হল। নতুন মুসলিম রাষ্ট্রের বিস্তার উচিত কি অনুচিত সে বিষয়ে কোন তাত্ত্বিক যুক্তিতে যাওয়ার পূর্বেই স্বশস্ত্র সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে।[২১]

শান্তিপূর্ণ মক্কা বিজয় অভিযান থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে মুসলমানদের প্রতি রোমানদের শত্রুতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের জবাবের উত্তরে ফিলিস্তিন সীমান্তে তাবুকের দিকে নবী করিম (সঃ) তাঁর সময়কালের বৃহত্তম এক সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হলেন। মৃত্যুর পূর্বে এটাই ছিল তাঁর শেষ অভিযান। উসামাহর অভিযান ছিল হজুর পাক (সঃ) এর মৃত্যুর পূর্বে নির্দেশিত শেষ অভিযান। নবী করিম (সঃ) এর ওফাতের পূর্বেই এটা প্রস্তুত ছিল। তথাপি নব নিযুক্ত খলিফার নবতর নির্দেশ লাভের পরই উত্তর দিকের গন্তব্য অভিমুখে এ বাহিনী যাত্রা করে। উত্তরের সীমান্তে দুটি বৈরী সাম্রাজ্যের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে আরবে মুসলিম শক্তিকে তিনি সংহত করেছিলেন। এ পদক্ষেপ পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রমাণ করে।

ধর্ম এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা

চতুর্থ বিষয়টি হল ধর্ম এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা। এটি আজও সমকালীন মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় বিভ্রান্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে বিদ্যমান। এক্ষেত্রেও মুসলিম এবং অমুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ভীতি এবং সন্দেহের আবহাওয়ায় সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা বিদ্যমান। কারণ এতে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। দূরূহ করে তোলে, আন্তযোগাযোগ ও সহযোগিতার বিষয়কে। স্বধর্মত্যাগ (রিদ্দা), যাযাবর আরবদের বাধ্যতামূলক ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করার ঐতিহাসিক ঘটনা এবং অমুসলমানদের উপর আরোপিত পোল ট্যাক্স (জিযিয়া) বিষয়ক উৎসসমূহের ক্ল্যাসিক্যাল ব্যাখ্যা হতে বিকশিত হয় সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি। পুনরায় উল্লেখ করা যায় যে, এই বিষয়গুলো প্রমাণ করে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান বিশ্বে মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গঠনমূলক নীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে

---

[২১] দেখুন Abdul Rahman Azzam, The EternalMessage of Islam, আরবী হতে অনুবাদ Caesar E. Earah (New york: New American Library, 1965), পৃ: ৪৬; Ibn al Athir, উ: গ্র: পৃ: ২৭৭; Ibn Hisham, উ: গ্র: খ. ২. পৃ: ৫৯১-৫৯২, ৬০৬-৬০৭, ৬৪১-৬৪২; M. al Ghazali, উ: গ্র: পৃ: ৩৯৫-৩৯৬, ৪৩৫-৪৩৮, ৪৪২.

www.pathagar.com

প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে রেখেছে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে আছে আধুনিক ইসলামী কাঠামোর আলোকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে।

আবদুহু, রিদা, আযাম, আল সাইদী এবং এঁদের মত আরও অনেক মুসলিম সংস্কারক এবং আধুনিকতাবাদী এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু ইহা এখনও ধারণাগত দিক দিয়ে পরিষ্কার হয়নি।[২২]

অন্যান্য উপাদান তো আছেই, মুসলিম সমাজের জন্য আজকের দিনে বেশী প্রয়োজন হল বিশ্বাসের স্বাধীনতার বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্যের।[২৩] মুসলিম সমাজের জন্য বিষয়টি আভ্যন্তরীণ একটা কিছু নয়। কারণ অন্যান্য রাষ্ট্র এবং জনগণের সাথে তাঁদের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শিক দিককে এ বিষয়টি স্পর্শকরে। বর্ণিত বিষয়ের স্পষ্টতা এ জন্য জরুরী যে মুসলিম সমাজ সত্যিকার অর্থে একটি খোলামেলা সমাজ। এ সমাজে নাগরিক অধিকারের বিষয়ে সুনিশ্চিয়তা রয়েছে। এ নিশ্চয়তা গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সমান। অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে এ সমাজে ধর্ম এবং গোত্রের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হয় না। এ সমাজে ব্যক্তি এবং দল কর্তৃক অধিকার এবং কর্তব্যের সম্পর্কে আন্তরিক ভাবে অনুশীলন করা হয়। এ বিষয়টির নিশ্চয়তা বিধান করা হয় জনগণের কল্যাণের প্রতি এবং তাঁদের প্রচলিত আইন পদ্ধতির প্রতি আনুগত্য এবং অঙ্গীকারের বিষয়কে নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থিতিশীল বিকাশমান এবং প্রগতিশীল একটি সমাজের জন্য। আদর্শ এবং ধর্মের স্বাধীনতা নামমাত্র থাকলেই চলবে না। এ বিষয়টিকে বিকশিত করতে হবে অনুশীলন এবং মতপ্রকাশের শান্তিপূর্ণ ও সুশৃংখল উপাদানের সুব্যবস্থার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা জিয্‌য়া এবং আহলে কিতাবদের ক্ল্যাসিক্যাল ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করবো তা হল এই যে, সামগ্রিক ইসলামিক কাঠামোর আদর্শিক যাত্রা শুরু হয় একজন ব্যক্তির প্রতিবেশীর বিষয়ে তার সত্যিকার দায়দায়িত্বের বিষয়কে কেন্দ্র করে।[২৪]

---

[২২] দেখুন 'Abd al Karim 'Uthman, al Nizam alSiyasi fi al Islam (Beirut: Dar al Irshad, 1968), পৃ: ৬০-৬৭; M. Abu Zahrah, উ: গ্র: পৃ: ১৪২-১৪৩; Muhammad 'Abduh, al Islam wa al Nasraniyah ma a al Ium wa al Madaniyah (Cairo: Matba at Mubammad Ali Sabih, 1954), পৃ: ৬৪; M. al Bahi, al Fikr al Islami, পৃ: ১৩০-১৩৭; Muhammad al Ghazali, উ: গ্র: পৃ: ৪৫৩-৪৫৪, ৪৫৮-৪৬৪; এবং 'A. al Saidui, al Hurryah al Diniyah, পৃ: ২৫. ৩০,

[২৩] দেখুন M. al Ghazali, al Ta assub wa al Tasamuh bayna al Masihiyah wa al Islam (Kuwait: Dar al Bayan, n.d.), ষ. ৩৭-৬৬; and W. C. Smith, Islam in Modern History, যষ. ২৬৬-২৯১.

[২৪] দেখুন al Quran, ৬০:৮-৯, ১১:৮৪, ২৬:১৩৫, ৪৬:২১, ৫:১১৮, ১৮:৮৭, ২৬:৩, ৩৪:২৮, ২১:১০৭, ৩:১০৪, ৯:৬৭, ১১:১১৬, ১৬:১২৫, ৪৯:১৩, ১৮:৮৭, ২৬:১৫১-১৫২, ৬৮:১০-১২, ৪২:৪১-৪৩, ১৬:৯০-৯১, ১০৭:১-৭, এবং ৯০:১২-২০. আরও দেখুন al Bukhari, Matn al Bukhari bi Hashyat al Sindi (Cairo: Dar Ihya al Kuub al 'Arabiyah, 1960), শমক. অ, ষ. ২২৮, টডড শমক. অত, যষ. ১৫৯, ১৬১, ১৭১-১৭২; al Khatib, Mishkat al Masabith (ed. al Albani), খ. ২. পৃ: ৬০৫, ৬০৮, ৬১৩; al Fakhr al Razi, al Tafsir al Kabir, খ. ২৬. পৃ: ৫৪-৬১; M. Rashid Rida, Tafsir al Manair, খ. ৪. পৃ: ২৫-৪৫; খ. ৯. পৃ: ২৯০-২৯১; al Tabari, Jamt al Bayan, খ. ১২. পৃ: ৯৮-১০৫; এবং Muhammad 'Izzat Darwazah, al Tafsir al Hadith (Cairo :'Isa al Babi al Halabi, 1964), পৃ: ২০০-২০৩.

www.pathagar.com

সকল মুসলমানের বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকটির উপর মনোনিবেশ করা দরকার। পবিত্র কুরআন এবং সুন্নায় মানুষে মানুষে সম্পর্কের বিষয়ে মৌলিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি যে বিষয়গুলোর মাধ্যমে প্রকাশ ঘটিয়েছে সেগুলো হল ভালবাসা *(তাওয়াদ্দুহম)*, সাহায্য *(তুহাসিনু)* ভ্রাতৃতা *(আল্লাতি হিয়া আহসান)* এবং নিরাপত্তা বিধান *(জিম্মাহ)*।

এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অবশ্য এসব সংঘাতময় পরিস্থিতি, বিশেষ করে ঐ সমস্ত ঐতিহাসিক সংঘাত যা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের আরব ভূমিতে সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেগুলোর সাথে একাকার করে ভুল করা ঠিক হবে না। স্বয়ং নবী করিম (সঃ) বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন খৃষ্টান গোত্র ও নাজরান গোত্রগুলির প্রতি। তিনি তাদের সাথে সম্মানজনক জিয়য়া চুক্তিও সম্পাদন করেছিলেন। তারও পূর্বে তিনি ইহুদী এবং মদিনাবাসীদের সাথেও সম্পাদন করেছিলেন মদিনা চুক্তি। এতদসত্ত্বেও তিনি যে সমস্ত ইহুদী গোত্র মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে জীবন মরণ সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। এসব সংঘাত ছিল পরিস্থিতি নির্ভর এবং কৌশলগত। এসব সংঘাত কিছুতেই ইসলামী আদর্শের মৌলিক ভিত্তি বিনষ্ট করে না। ইসলামের বাস্তবধর্মী এবং যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার জন্য পবিত্র কুরআনের রেফারেন্স এবং সুন্নাহ ও সীরাতের বিস্তারিত বিবরণ অত্যন্ত সহায়ক। মুসলিম জাতির আদর্শের অগ্রাভিযানের সাফল্য এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য রাসূল (সঃ) কর্তৃক যে সমস্ত বাস্তবধর্মী ইসলামী নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছিল তার তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য এই বিস্তারিত বিবরণগুলো হল ঐতিহাসিক দলিল বিশেষ।

ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত মূর্তি পূজারী আরবগোত্রগুলোর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত থাকার বিষয়টি আদর্শিক নির্যাতন হিসাবে ধরে নেয়া যায় না। এ সিদ্ধান্তটি অবতীর্ণ হয়েছে মদিনায় মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের সুদীর্ঘ ২০টি বছর নির্যাতন ভোগ এবং যুদ্ধে অতিবাহিত হওয়ার পর। নবী করিমের (সঃ) উপর তাদেরকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করানোর বাধ্যবাধকতা ছিল এটা বলা সমীচীন নয়। যেমন সনাতন পন্থীরা এরূপ বাধ্যবাধকতা ছিল বলে মনে করেন। বাধ্যবাধকতা ছিল বলা ঠিক নয় এ জন্য যে, আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া প্রদান সংক্রান্ত আয়াতটি আরব বেদুইনদের জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার জন্য নবী করিম (সঃ) এর নির্দেশ দানের সময় নাযিল হয়নি।[২৫] বস্তুতপক্ষে নবী করিম (সঃ) কখনও মদিনার ইহুদী গোত্র অথবা নাজরানের আরব খৃষ্টানদের জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানোর চেষ্টা করেননি।

---

[২৫] W. al Zuhayli, উ: গ্র: পৃ: ১০২.

www.pathagar.com

মুসলমান এবং আরব জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রশ্নে বিশ বছরের অভিজ্ঞতার সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর জবরদস্তিমূলক ইসলামীকরনের সিদ্ধান্তটি অবতীর্ণ হয়। একটি সুসংবদ্ধ সামাজিক পদ্ধতির কাঠামো এবং সুশৃংখল আন্তগোত্রীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা যেকোন সমাজেরই একান্ত কাম্য। এ রূপ একটি অবস্থা উপহার দেয়াই ছিল আরব উপদ্বীপের জন্য বেদুইন আরবগোত্রগুলির ইসলামীকরনের উদ্দেশ্য। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এ পরিবর্তন ছিল আন্তরিক, দায়িত্বশীল সঠিক এবং আরবদের বিশেষ করে তাদের মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে। মোঙ্গলীয় এবং জার্মান উপজাতির মত অন্যান্য উপজাতির তুলনায় ইসলামের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার প্রভাবে এবং তাদের শৃংখলায় আসার ফলে আদি আরব গোত্রগুলী হয়ে গেল সংস্কৃতির বাহক এবং সভ্যতার নির্মাতা। আরবজাতি অন্যান্য মুসলিম জনগণের সাথে তৎকালীন সময় পর্যন্ত মানব জাতির ইতিহাসে বৃহত্তম সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেছিল। মানবীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার রক্ষণ এবং বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের অবদান অনন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেনঃ

যাহারা ঈমান আনে ও পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে, আবার কুফরী করে, অতঃপর তাহাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে কোন পথে পরিচালিত করিবেন না (৪ ঃ ১৩৭)।

তাহারা কোন মুমিনের সহিত আত্মীয়তার ও অংগীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না। তাহারাই সীমালংঘনকারী। অতঃপর তাহারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাহারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি (৯ঃ১০-১১)।

উহারা আত্মসম্পর্ণ করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, 'তোমাদের আত্মসমপর্ণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না। বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও' (৪৯ঃ১৭)।

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয় প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে (৩ ঃ ১০৩)।

যদি বাধ্যতামূলক ইসলামে দীক্ষিত করার বিষয়টির অন্তরালে নিছক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন অথবা ধর্মীয় স্বাধীনতা অস্বীকারের অনুশীলন জাতীয় কিছু হত তাহলে নবী (সঃ) এর এ জন্য মদিনার ইহুদী গোত্রগুলির বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আরও বেশী অজুহাত ও সুযোগ ছিল। কিন্তু আরব গোত্রগুলির ইসলামীকরনের জন্য তাঁর নির্দেশ জারী করার

www.pathagar.com

আগে বা পরে তিনি কখনও এই নীতি গ্রহণ করেননি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমন আমরা উল্লেখ করেছি যে, এ ক্ষেত্রে কুরআনের বক্তব্য সুস্পষ্ট। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, আরব বদ্বীপের বেদুইন, মূর্তি পূজারী গোত্রগুলীর ইসলামীকরণের ঘটনাটি ছিল মানবীয় পরিপূর্ণতা দান প্রসংগে। সম্মানের ভিত্তির উপর রচিত মানবীয় যোগাযোগের জন্য একটি প্রয়োজনীয় মুখ্য কাঠামো প্রতিষ্ঠার বিষয় সঠিকভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে এ পদক্ষেপ মানবতার জন্য উপযোগী মৌলিক মানবাধিকারের জন্য আদর্শিক সহনশীলতা এবং প্রকৃত উদ্বেগকে ধ্বংস নয় বরং জোরদার করে। আর এটাই হল খিলাফতের দায়িত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।[২৭]

স্বধর্ম ত্যাগের বিষয়টি হল তিনটি বিষয়ের মধ্যে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয়। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ মুসলমান কর্তৃক ইসলামকে অস্বীকার করা হল স্বধর্ম ত্যাগ। আমরা দেখতে পাই অনেক ক্ল্যাসিক্যাল পন্ডিত মনে করেন স্বধর্ম ত্যাগী ইসলামে ফেরত না আসলে তাকে দন্ডিত করতে হবে।[২৮] এখানে যে সমস্যাটির উদ্ভব হয় তার দুটি দিক আছেঃ একটি হল স্থান কাল উপাদান, অপরটি হল মুসলিম লেখকবৃন্দ কর্তৃক বিষয়টিকে যে ভাবে নেয়া হচ্ছে সে ক্ষেত্রে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণাগত বিভ্রান্তি।

স্বধর্ম ত্যাগের বিষয়টির স্থান কালের প্রভাব একটি ষড়যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ ষড়যন্ত্রের হোতা হল ইহুদীদের কিছু গোষ্ঠী। তারা এটা করেছে মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। তারা ধর্মত্যাগের বিষয়টিকে বিভ্রান্তি সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। এ বিষয়টি হল এরূপ যে, প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে এর প্রচার করা এবং পরে একটি গ্রুপ হিসাবে তা পরিত্যাগ করা। এখানে এটা উল্লেখ্য যে, এই ষড়যন্ত্র এবং এর দ্বারা সৃষ্ট প্রভাব সম্পর্কে কুরআনে পাকে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

কিতাবীদের একদল বলিল, 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তোমরা দিনের প্রারম্ভে তাহা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে তাহা প্রত্যাখান কর; হয়ত তাহারা ফিরিবে। আর যে ব্যক্তি তোমাদের দীনের অনুসরণ করে তাহাদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও বিশ্বাস করিও না।' (৩ঃ ৭২-৭৩)

---

[২৭] দেখুন Ibn Khaldun, অনুবাদ Franz Rosenthal, The Muqaddimah, সং N. J. Dawood (Princeton, NJ : Princeton University Press, 1967), পৃ: ১১৮-১২২; Ahmad Amin, Faijr al Islam, ৯ম সং (Cairo: Maktabat al Nahdah, 1964), পৃ: ৩০-৩৮; Jawad 'Ali, al Mufassal fi Tarkh al'Arab Qabla al Islam (Beirut : Dar al-Ilm, 1970), খ. ৪. পৃ: ৩৬৪; Muhammad Kamil Lilah, al Mujtama al 'Arabi wa al Qawmyah al 'Arabyah (Cairo : Dar al Fikr al 'Arabi, 1966), পৃ: ৮৫-৯১, ১০৮-১১১: এবং W. Watt, Islamic Thought, পৃ: ৬-৭.

[২৮] দেখুন 'A. al Saidi, al Hurryah al Dinyah, পৃ: ২৫-৩৩.

www.pathagar.com

ধর্ম ত্যাগের প্রশ্নটি মুনাফেকীর মারাত্মক বিষয়ের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। এই মুনাফেকীর বিষয় নিয়ে পবিত্র কুরআনে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। মদিনায় মুনাফিকগণ মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের জন্য একটি দ্বৈত সমস্যার সৃষ্টি করে। তারা শত্রুদের সাহায্য করে যুদ্ধ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনা করে এবং তাঁদের মনোবল বিনষ্ট করার কাজে আত্মবিনিয়োগ করে। এ প্রসংগে পবিত্র কালামে পাকের এরশাদ হচ্ছেঃ

উহারা তোমাদের সহিত বাহির হইলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করিত এবং তোমাদের মধ্যে ফিত্‌না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করিত। তোমাদের মধ্যে উহাদের কথা শুনিবার লোক আছে। আল্লাহ্ জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। পূর্বেও উহারা ফিত্‌না সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল এবং উহারা তোমার বহু কর্মে উলট পালট করিয়াছিল যতক্ষণ না উহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসিল এবং আল্লাহর আদেশ বিজয়ী হইল। এবং উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে, 'আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফিত্‌নায় ফেলিওনা।' সাবধান! উহারাই ফিত্‌নাতে পড়িয়া আছে। জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে বেষ্টন করিয়াই আছে। তোমার মংগল হইলে তাহা উহাদিগকে পীড়া দেয় এবং তোমার বিপদ ঘটিলে উহারা বলে, 'আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম; এবং উহারা উৎফুল্ল চিত্তে সরিয়া পড়ে। বল, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হইবে না ; তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহর উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত।' বল, 'তোমরা আমাদের দুইটি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষা করিতেছ এবং আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ পক্ষ হইতে অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমারাও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি' (৯ঃ৪৭-৫২)।

এ মুনাফেকীর জন্য জন্য ভয়ংকর শাস্তি প্রদানের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। হুমকি দেয়া হচ্ছে তাদের কার্যক্রম এবং ষড়যন্ত্রমূলক মুনাফেকীর অনুশীলন বন্ধ করার জন্য মুনাফিকরা সারাজীবন তাদের নিজেদের ভূমিকার ফাঁদে নিজেরাই আবদ্ধ হয়। মুনাফিকী এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য নবী করিম (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারহ্‌কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে উসমান ইবনে আফফানের সাহসী অনুরোধে এ নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছিল। আবু সারহ ছিলেন নবী করিম (সঃ) এর একজন লেখক। সে পালিয়ে গেল এই বলে যে, সে বিশ্বাসী ছিল না। সে আরো প্রচার করল সে তার উপর অর্পিত রেকর্ড করার কাজে কিছু পরিবর্তন করেছে। মুনাফেকীর এরূপ ষড়যন্ত্র অথবা ধর্মত্যাগ হল মারাত্মক অপরাধ। এসব অপরাধের গুরুত্ব এবং শাস্তির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান কালের বিবেচনা আছে। এসমস্ত উপাদানগুলো

www.pathagar.com

তাদের আইনগত শাস্তির পরিমান নির্ধারনে সিদ্ধান্তকারী ভূমিকা পালন করে।

ধারণাগত বিভ্রান্তিগুলোর উন্মেষ ঘটে ইসলামের প্রাথমিক যুগে। ঐ সময় ক্ল্যাসিক্যাল জুরীগণ একটি আচরণ যে জন্য হয়েছে ঠিক সেটাতেই এটাকে সীমিত রেখেছেন। এর অন্তরালে অন্যকোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল কিনা বা এরূপ করার কারণ কি ছিল তা খতিয়ে দেখে সেটাকে সে ভাবে গ্রহণ করেননি। তাঁরা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকে বিশ্বাসের স্বাধীনতার মানবাধিকারের অনুশীলন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। জুরীগণ সামগ্রিক প্রশ্নটির বিশ্লেষণে খুব সামান্যই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। কেবল ধর্মত্যাগ পরিভাষাটিই তাদের অবস্থান নির্ণয় করছে।

পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত ধর্মত্যাগ এবং এর জন্য উল্লেখিত শাস্তির তাৎপর্য সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা হয়নি। উপলব্ধি করা হয়নি নবী করিম (সঃ) হাদিসে এর জন্য প্রযোজ্য শাস্তির তাৎপর্য। এই ভুল উপলব্ধি ক্ল্যাসিক্যাল আইন বিজ্ঞানে সহনশীলতা এবং মানবিক দায়িত্বের ইসলামী আদর্শের ভিত্তিকেই ধ্বংস করে দিয়েছে।

আমরা দেখেছি ধর্ম ত্যাগের উপর প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের অবস্থান, বিবেক এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা এবং যুদ্ধরত বেদুইন গোত্রগুলোর উপর ইসলামীকরনের নীতিকে জোরদার করা।[২৯] ধর্ম এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা সম্পর্কীত ইসলামী অবস্থান কুরআনে সুস্পষ্টরূপে বর্ননা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

"দীন সম্পর্কে জোর জবরদস্তিইঃ (২ঃ২৫৬)।

তোমরা উত্তমপন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সহিত বিতর্ক করিবে না, তবে তাহাদের সহিত করিতে পার, যাহারা উহাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী (২৯ঃ৪৬)।

ইসলাম সব সময় এর শিক্ষায় নিহিত সত্যের ব্যাপারে এবং অনুসারীদের বিশ্বাসের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন করেছে। ইসলাম সব সময়ই পছন্দ, বিবেক, দায়িত্ব এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতায় মানরাধিকারকে অর্জন এবং রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

---

[২৯] 'Afif 'A. Tabbarah, al Yahud fi al Quran : Tahlil 'Ilmi it Nusus al Quran ft al Yahud 'Ala Daw' al Ahddath al Hadirah, Ma a Qisas Anbiya' Allah, Ibrahum wa Yusuf wa Milsa 'Alayhim al Salam (The Jews and the Qurian: Scientific Analyssis of the Qurlanic Text Pertaining to Jews in the Light of the Contemporary Events with the Stories of the Prophets Abraham, Yusuf and Musa, May Peace Be Upon them), ২য় সং (Beirut : Dar al 'Ilm li al Malayin, 1966), পৃ: ৩০-৩২; এবং Muhammad Sayyid Tantawi, Banil Israil fi al Quran wa al Sunnah, পৃ: ১৬৮- ২৬৩. আরও দেখুন Ibn al Athir, al Kamil, খ. ২. পৃ: ২৪৯; এবং Ibn Hisham, al Sirah, খ. ২. পৃ: ৪০৯.

www.pathagar.com

দুর্বিনীত মরুগোত্রগুলোর ইসলামীকরনের জন্য নবী (সঃ) এর নীতির অন্তরালে নিহিত মৌলিক তাৎপর্য এবং কারণ কি ছিল তা মুসলিম পন্ডিত বর্গ সম্যকভাবে উপলব্ধি না করার কারণে ক্ল্যাসিক্যাল এবং পরবর্তীতে সনাতন রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসের স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণগত বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। এর আরেকটি কারণ হল এসকল মুসলিম পন্ডিত যে সমস্ত ক্ষেত্রে নবী করিম (সঃ) ধর্মত্যাগের বিষয়কে নিন্দার চোখে দেখেছেন, সে সমস্ত ক্ষেত্রে এ প্রশ্নটির অপরাধমূলক দিক অথবা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার দিকটি বিবেচনায় নেননি। জুরীগণের তরফ হতে কৃত এ ধরনের বিভ্রান্তি থেকে বিরাজমান ধারণাগত সীমাহীন বৈপরীত্য এবং রহিত করন প্রক্রিয়ার প্রতি অযৌক্তিক গুরুত্ব আরোপ কেন করা হয়েছিল সে বিষয়ে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বিরুদ্ধে বেদুইন গোত্রগুলো কর্তৃক পরিচালিত তথাকথিত ধর্মত্যাগীদের যুদ্ধ বিশ্বাসের অথবা বিবেকের স্বাধীনতার লক্ষ্যে কোন কিছু ছিল না। বরং এটা মূলত ছিল রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্তৃত্বের সকল বাধার বিরুদ্ধে একটি নবায়নকৃত বেদুইন প্রতিক্রিয়া। আবু বকর (রাঃ) এর সরকারের বিরুদ্ধে ঐ বিশেষ যুদ্ধ কার্যক্রমের বিষয়গুলো ছিল যাকাত প্রদান এবং আরবে নতুন কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্পর্কীয়।

ক্ল্যাসিক্যাল পন্ডিতগণের মধ্যে ইবনে আল কাইয়ুম মনে হয় এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক ধর্মত্যাগের প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মদিনায় নবী করিম (সঃ) কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনামার আদর্শিক তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। ইবনে আল কাইয়ুমের মতে এগুলো ছিল ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ব্যবস্থা। বিশ্বাস অথবা বিবেকের স্বাধীনতার প্রশ্নে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।[৩০]

মুসলমানদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, বিস্তারিত এবং পুঁথিগত বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আইনগত এবং ক্ষুদ্র দৃষ্টিসম্পন্ন তাত্ত্বিক যুক্তির বেড়াজালে ইসলামে বিশ্বাস এবং বিবেকের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নৈতিক দায়িত্বের মৌলিক এবং কেন্দ্রীয় মূল্যবোধগুলো তাঁরা বিনষ্ট করবে না। বরং তাঁরা এগুলোকে রাখবে তাঁদের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে। আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃসম্পর্ক উভয় ক্ষেত্রের জন্যই যে কোন গঠনমূলক, শান্তিপূর্ণ এবং মানবীয় আদর্শের জন্য একটি মৌলিক প্রয়োজন হল আদর্শিক স্বাধীনতা।

---

[৩০] দ্রঃ A. 'Uthman, al Nizam al Siyasi, খ. ২. পৃ: ৬৬-৬৭.

www.pathagar.com

কুরআনের ব্যাখ্যায় ধারাবাহিকতার পুনর্গঠণ

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কিভাবে ক্ল্যাসিক্যাল জুরীবৃন্দ নবীকরিম (সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার অনুরূপ সমাজ ব্যবস্থা সংরক্ষণ এবং তাতে জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। এজন্য কিভাবে ক্ল্যাসিক্যাল জুরীগণ তাঁদের সময় কালীন মুসলমানদের আচরণ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বরূপ কেমন হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত ফিরিস্তি দিয়ে ম্যানুয়াল তৈরী করতে চেয়েছিলেন। আমরা দেখতে পাই *নাসখের* ক্ল্যাসিক্যাল পদ্ধতির মাধ্যমে জুরীবৃন্দ, রাজনৈতিক কার্যক্রমে স্বাধীনতার দিগন্তকে মূলত মদিনা রাষ্ট্রের শেষ দিকের আদর্শতে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছেন। এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের একটি নিরাপদ "বৃহৎ শক্তি" নীতি। তবে মদিনা যুগের প্রাথমিক মুসলমান এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যস্থিত কিছু অত্যাচারী আক্রমণাত্মক এবং বিশ্বাসঘাতক নেতৃস্থানীয় লোকের মধ্যকার সংঘাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু নীতি নির্ধারণী উপাদান আজও দৃশ্যমান আছে।

মুসলিম রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যেরূপ শক্তি বিদ্যমান ছিল এবং শত্রু পক্ষের যেভাবে দুর্বলতা ও অবক্ষয় প্রকাশিত হচ্ছিল, সে অবস্থার কারণেই মুসলিম উম্মাহর পক্ষে এরূপ নীতি চালু রাখা সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য ব্যত্যয় যে ঘটেনি, তা নয়। যখনই সুলতানগণ রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে কোন পরিবর্তন ঘটানো অনিবার্য মনে করেছেন তখন তারা তা করেছেন।

যে সমস্ত উদারপন্থী আধুনিকতাবাদী ইসলামের অবস্থানকে কেবল আত্মরক্ষামূলক শান্তিপূর্ণ এবং সহনশীল অবস্থানের মধ্যে সীমিত করার পক্ষপাতী তাঁরা দেখেছেন যে, রহিতকরণ প্রক্রিয়াটি সবসময় সহায়ক নয়। বরং কোন কোন সময় বাস্তবক্ষেত্রে এটি দুধারী অস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। বস্তুতপক্ষে *নাসখের* প্রসংগটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে ধারণাগত বিভ্রান্তির মধ্যে। আমাদেরকে এ বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে হবে, বিশেষ করে যে সব সুনির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ এবং আলোচনা কুরআনে পাকে রয়েছে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে এবং তুলে ধরতে হবে কুরআন পাকের আভ্যন্তরীণ গঠন প্রকৃতির তাৎপর্যকে। তা না হলে পবিত্র কুরআন এবং এ জন্য সকল প্রকার ইসলামী আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠানকে একটি সনাতন এবং সেকেলে জীবন পদ্ধতি হিসাবে মনে হবে।

রহিতকরণ (নাস্‌খ)

সামগ্রিকভাবে কুরআনিক এবং প্রাথমিক যুগের ইসলামী অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রধান এবং তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের যুগগুলোর মধ্য দিয়ে মুসলমানগণ এসেছে। পৃথিবীতে ইসলাম মানুষের জন্য ন্যায়বিচার এবং শান্তির অন্বেষণ করেছে। শান্তি চেয়েছে নিখিল চরাচরের অনন্ত ধারা এবং জীবন মৃত্যুর

www.pathagar.com

যাহারা স্বচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদিগকে ভালবাসেন; এবং যাহারা কোন অশ্লীল কার্য করিয়া ফেলিলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করিলে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করিবে এবং তাহারা যাহা করিয়া ফেলে, জানিয়া শুনিয়া তাহারা পুনরাবৃত্তি করে না। উঁহারাই তাহারা, যাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম! (৩ ঃ ১৩৪ - ১৩৬)

কুরআনিক অভিজ্ঞতা মানুষকে নিয়ে আলোচনা করেছে। তাকে একজন ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করেছে এবং সাথে সাথে তাকে সমাজের একজন সদস্য হিসাবেও বিবেচনা করেছে। একজন ব্যক্তি এবং সংখ্যালঘুর মর্যাদা হতে তাকে উন্নীত করা হয়েছে সমাজ এবং সরকারের মর্যদায় অবজ্ঞা, অপমান, নির্যাতন এবং দুর্বলের অবস্থান থেকে উদ্ধার করে তাকে মর্যাদা এবং ক্ষমতার আসনে বসিয়েছে। কুরআনের অভিজ্ঞতার বদৌলতে যেমন অনেক কিছু অর্জিত হয়েছে শান্তির মাধ্যমে তেমন অর্জিত হয়েছে অনেক কিছু যুদ্ধের মধ্যদিয়ে। মানব জীবন এবং মনের এমন একটি অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিও পাওয়া দুষ্কর হবে যেটি এ বিশাল ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। মানুষের জীবন এবং সমাজের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যগুলো অর্জনের অন্বেষায় ইসলাম মূল্যবোধ, নীতিমালা এবং সীমারেখাগুলোর একটি মৌলিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে যা মুসলিম নেতৃত্বের জন্য একটি গতিশীল এবং সৃষ্টিধর্মী রাজনৈতিক পরিকল্পনা এবং কার্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনন্ত দিগন্ত অবারিত করেছে।

জুরী এবং পন্ডিতগণ *নাসখ* এর উপর এ আয়াত সে আয়াত সম্পর্কে নবী করিম (সঃ) এর সাহাবীগণকে উদ্ধৃত করেন। কিন্তু কোন আয়াত দ্বারা কোন আয়াত রহিত করা হয়েছে বলে নবী করিম (সঃ) বলেছেন সে সম্পর্কে স্বয়ং নবী (সঃ) কেই উদ্ধৃত করেন না।[৩১] বস্তুত পক্ষে জুরীগণ কুরআনে *নাসখের* অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টাকে বহুদূর বিস্তৃত করেছেন।[৩২] তাঁরা *নাসখ* এর সংজ্ঞার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেন কিন্তু সমকালীন পন্ডিতবর্গ *নাসখ* এর কাঠামোর ব্যাপারে কোন আগ্রহই

৩১ M. Abu Zayd, al Nasikh, খ. ১. পৃ: ১২৫-১৩৪, খ. ২. পৃ: ৫৫৩, ৫৬৩-৫৬৮, ৫৭৯-৫৮১.

৩২ M. Abu Zayd, উ: গ্র: খ. ১. ২২১-২৮৫.

www.pathagar.com

প্রকাশ করেন না।[৩৩] তাঁদের সুদীর্ঘ যুক্তিমালা হতে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি তা হল এই যে, তাঁদের কাঠামো স্থবির। রহিতকরণ এমন এক ঘটনার ফল যা ইতিহাসে কেবল একবারই ঘটেছে এবং ইতিহাসের কোন এক অতীতে ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়া কালে একটি দুর্ঘটনা দ্বারা নির্ধারিত একটি মাত্র অবস্থানের ফাঁদে মুসলমানদেরকে আটকিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্ল্যাসিক্যাল জুরীগণ মুসলিম সমাজকে শক্তিশালী এবং প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করেছেন, এটা বোধগম্য। কিন্তু সমকালীন জুরী এবং পন্ডিতগণ এ বিষয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন। তাঁরা এমন ভাবে কথা বলেন, যাকে বলা যায় অস্পষ্ট সাধারণীকরণ। এরূপ সাধারণীকরণের সাথে মুসলিম জনগণ এবং কর্তৃপক্ষ যে প্রকৃত সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছেন তার কোন সম্পর্ক নেই। অথবা তাঁরা যে কথা বলেন, তা আদর্শিক কল্পনা বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এ কল্পনা বিলাসে তাঁরা নিজেদেরকে ক্ষমতাধর, প্রতিষ্ঠিত সমাজ এবং কর্তৃপক্ষ হিসাবে মনে করেন। তাঁরা ভুলে যান যে, মুসলিমগণ বর্তমানে আর সে সময়ের অধিবাসী নন, আর এখন তারা সে স্থানেও বাস করেন না। মুসলিম কর্তৃপক্ষগুলোর প্রয়োজন একটি ইসলামিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং পান্ডিত্য যা হবে যথেষ্ট সুসংহত এবং যা দ্বারা তাঁরা গঠনমূলক ভাবে সমকালীন পৃথিবীর বাস্তবতা এবং চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে পারবেন।[৩৪]

নাসখ এর ধারণাকে এর সত্যিকারের অতীতের প্রেক্ষিতে স্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে। ইসলামের বাণী পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে যেসব অবতীর্ণ বাণী এবং আয়াতের নাসখ হয়েছে সেগুলোতে মূলত বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকে। ইসলামের সকল বাণী এবং অভিজ্ঞতার সকল অংশই মানবজীবন এবং অভিজ্ঞতার সামগ্রিক প্রবাহের পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োজন হয়। ইসলামের লক্ষ্য, মূল্যবোধ এবং নীতির আলোকে ইসলামের নিয়মনীতি ও পদ্ধতিগুলো সবসময়ই বর্ণাঢ্য ক্ষেত্রে মানবীয় প্রয়োজন এবং পরিস্থিতির জন্য উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। *নাসখ* শুধু ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিৎ যেসব ক্ষেত্র নাসখ এর ধারণার জন্য উপযোগী। কেবলা পরিবর্তন এরূপ একটি ক্ষেত্র। এটা মাত্র একবারের জন্যই প্রযোজ্য যখন বায়তুল মোকাদ্দিসের জেরুজালেমের দিক থেকে মক্কার দিকে কেবলার দিক পরিবর্তন করা হয়।[৩৫] মুসলমান বুদ্ধিজীবী এবং

---

[৩৩] আরও আমাদেরকে এখানে উল্লেখ করতে হবে যে, আমাদের পুরাতন ভুলের পুনরাবৃত্তি করা ঠিক হবে না। ভুলটি হল নাসখ হিসাবে কতিপয় নীতিমালার স্থাপিতকরণকে মনে করা পরিস্থিতির কারণে এক নীতির পরিবর্তে অন্য নীতি গ্রহণ করা হয়) এর অর্থ হল স্থায়ীভাবে মূল্যবোধ অথবা নীতির বাতিল। দেখুন

[৩৪] M. Abu Zayd, al Naskh খ. ১. পৃ: ২০৫-২২০. M. al Zarqani, Manahil al Irfan, খ. ২. পৃ: ৬৯-৭৬.

[৩৫] M. Abu Zayd, উ: গ্র: খ. ১. পৃ: ২৩৬-২৪২, ৩৯৯, ৩৯৯-৫০১; উ: গ্র: খ. ২ পৃ: উ: গ্র: খ. ২. পৃ: ১৫২-১৬৪

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষকে ইসলামী কাঠামোর মধ্যে কৌশল প্রয়োগের দায়িত্বশীল, বুদ্ধিদীপ্ত, রাজনৈতিক এবং আইনী স্বাধীনতাকে বিকশিত করতে হবে। মদিনা সময়কালের শেষের দিকের অবতীর্ণ আয়াত এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর মত বর্তমান কালের মানবীয় পরিস্থিতি এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে মক্কায় অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলোও সঠিক এবং প্রাসংগিক। ভদ্রতা, দয়া এবং মানবতা মানব সমাজের জন্য শক্তি এবং দমনীতির মতই প্রাসংগিক। মুসলমনদের সব সময়ই নিজেদের আরও প্রয়োজনানুসারে মনস্তাত্ত্বিক এবং দৈহিকভাবে সক্ষম রাখা উচিৎ অনুপ্রেরণা প্রদানের ক্ষেত্রে, সবর অবলম্বনের ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজনে কিতালের (যুদ্ধকরা) জন্য।

দায়িত্বশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক এবং আইন প্রনয়নের স্বাধীনতা সবসময়ই উন্নয়নশীল এবং গতিশীল সমাজগুলোর বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এরূপ বৈশিষ্ট্য গঠনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে কুরআনের বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গির গতিশীল প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে। এ রূপ নীতিই ছিল সব সময় নবী করিম (সঃ) এর। তাঁর পরবর্তী দুই খলিফাও এ নীতি অনুসরণ করেছেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব এর (রাঃ) বেলায় বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এ অবস্থার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যদি বিদ্যমান স্থান কালের সীমাহীন শূন্যতাকে গঠনমূলকভাবে অনাগত ভবিষতের জন্য পূরণ করতে হয়। এ লক্ষ্যে *নাসখের* প্রকৃত অর্থ এবং সঠিক পরিধি সম্পর্কে আবু মুসলিম আল ইসফাহানীর অবস্থান এবং যুক্তিগুলোকে বিশ্লেষণ এবং বিবেচনা করে দেখা দরকার।

কুরআনের আভ্যন্তরীণ পদ্ধতির তাৎপর্য

ইসলামী সাহিত্যের পাঠকগণ অনুভব করেন, প্রেক্ষিতের উল্লেখ না করে অনেক ক্ষেত্রে কুরআন হতে আয়াত উদ্ধৃত এবং ব্যবহার করা হয়। আমরা মনে করি এ ঘটনার পিছনে একাধিক কারণ বিদ্যমান। একটি কারণ যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল এই যে, *নাসখ* এর ব্যাপারে স্থবির, দৈবাৎ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ। দ্বিতীয়টি হল কুরআনের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার সঠিক এবং যথাযথ মূল্যায়ন ও অনুধাবনে ব্যর্থতা। এর ফলে ক) কুরআনে উল্লেখিত সুস্পষ্ট ঘটনার মাত্রাতিরিক্ত সরলীকরণ ও সাধারণীকরণ করা হয়েছে। ফলে স্থান কালের কিছু প্রেক্ষিত চলে গেছে দৃষ্টির আড়ালে দ্বি-দ্বতীয়ত কুরআনের আভ্যন্তরীণ গঠন প্রকৃতির প্রতি এবং প্রতি অধ্যায়ে আয়াতের ক্রমবিন্যাসের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেয়া হয়নি। বিন্যাসের মাধ্যমে কুরআন তার মূল বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করেছে। মূল বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে তা নিবদ্ধ হয়েছে আইনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণের দিকে। এভাবে খন্ড বিখন্ড করে কুরআনের বিশ্লেষণ করা হলে কুরআনের আয়াত সম্পর্কে একটি অস্বচ্ছ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং ইসলামী লক্ষ্য ও

www.pathagar.com

প্রাধিকারগুলো সম্পর্কে সৃষ্টি হয় অস্পষ্ট ধারণা। একদেশদর্শিতা, খবরাখবর এবং কুরআনের আলোচনা ও উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বিত উপলব্ধি এবং সুশৃংখল চিন্তার দৈন্যতার জন্য তৃতীয় যে কারণটি দায়ী তা হল মুসলিম সমাজ ও সরকারের, বিচার কর্ম ও শৃংখলায়নে নিয়োজিত বিচার বিভাগের এবং শিক্ষাদান, সাহসদান ও প্রতিরক্ষা বিধানে নিয়োজিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে ধারণাগত বিভ্রান্তি।

কুরআনে বাস্তব ঘটনার তাৎপর্য

কুরআন মূলত এমন সব আয়াতের এক অপূর্ব সমাহার যেগুলোকে বলা চলে সাধারণ নীতি নির্দেশনা এবং দর্শনের নির্যাস। এসব আয়াতের সাথে রয়েছে বিশেষ ঘটনার উল্লেখ, তাদের ব্যাখ্যা এবং ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলমানদের জন্য বিশেষ দিক নির্দেশনা এবং আদেশ। প্রাথমিক যুগের লেখক এবং তফসীরকারগণ এসব আয়াতের সাধারণীকরণ করার ক্ষেত্রে এবং ঐগুলো হতে মর্ম উদ্ধার ও দিক নির্দশনা লাভের সময় তাদের বৈশিষ্ট্য এবং সেগুলো নাজিলের ঐতিহাসিক পটভূমির তাৎপর্যকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। *আয়াতুল সাইফ* অথবা *আয়াতুল কিতাল* (তরবারীর আয়াত অথবা যুদ্ধের আয়াত) হল আলোচ্য সমস্যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। *নাসখ* এর সহজ ক্ল্যাসিক্যাল এবং আইনীক দৃষ্টিভঙ্গি একটি যুদ্ধের উদ্দেশ্যকে সাহায্য করেছে। নবী করিম (সঃ) এর ওফাতের পূর্বে উত্তরের বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ তখন অগ্রগতির পথে ছিল। বস্তুতপক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গির সরাসরি এবং সরল ব্যাখ্যার সুবিধা ছিল। উত্তরাঞ্চলের প্রতাপশালী রাজশক্তি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রচন্ড নৈতিক শক্তি যোগায়।

তরবারীর আয়াতের বক্তব্য হল

তোমরা মুশরিকদের সহিত সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিবে, যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকে (৯ঃ৩৬)।

হে মুমিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর এবং উহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখিতে পায় (৯ঃ১২৩)।

এই দুটি আয়াত জাতিগুলোর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান নির্ণয়ে ক্ল্যাসিক্যাল আইন বিজ্ঞান কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে ক্ল্যাসিক্যাল ব্যাখ্যা কুরানিক দর্শনের বহুমূখী ইসলামী বৈশিষ্ট্যের অনেকদিকের ক্ষতি সাধন করছে।

মানবজাতির নিকট ইসলামের বার্তা এবং কুরআনের বাণী ব্যাখ্যা করার জন্য মুসলিম পন্ডিতবর্গকে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কার করতে হবে। তাঁদেরকে এটা করতে হবে

www.pathagar.com

কুরআনের সামগ্রিক বক্তব্য এবং অভিজ্ঞতার আলোকে এবং সমকালীন প্রয়োজন এবং চ্যালেঞ্জ সমূহকে বিবেচনায় রেখে।[৩৬]

কুরআনে প্রদত্ত সকল বাস্তব উদাহরণ বিবেচনা করতে হবে নিবিড়ভাবে স্থান কালের প্রেক্ষিতের বিষয়কে যথাযথভাবে বিবেচনায় রেখে। এটা করতে হবে উদাহরণগুলোর সত্যিকারের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য। সমগ্র কুরআনে যে মূল্যবোধগুলোর কাঠামো প্রকাশিত হয়েছে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে, তারই আলোকে বিচার করতে হবে উদাহরণগুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, উপরোক্ত আয়াত *(আয়াতুল কিতাল)* এমন এক পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট, যেখানে মুসলমানগণ ইতোমধ্যেই একটি সর্বাত্মক ও দুরভিসন্ধিমূলক যুদ্ধে কুরাইশ এবং তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আয়াতগুলো মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে এবং কৌশলে উপদেশ দিচ্ছে এসব বর্বর শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য। সুতরাং এ আয়াতগুলো একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে সামাল দিচ্ছিল। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামিক যে বৃহত্তর কাঠামো এবং ক্ষেত্র, যে সাধারণ আইন কানুনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব, তার অনুপূরক হিসাবে কাজ করা- সেগুলোর বিরোধিতা করা নয়।

কুরআনের আভ্যন্তরীণ কাঠামো

ক্ল্যাসিক্যাল পদ্ধতির একটি বড় ধরনের ত্রুটি হল কুরআনের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী বিন্যাসে এর সূরাপারা এবং আয়াতের তাৎপর্য উপলব্ধিতে ব্যর্থতা। এমনও পন্ডিত ছিলেন, যিনি কুরআনের আয়াতগুলোকে পরস্পর স্বাধীন সত্ত্বার আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেন এরূপ করতে গিয়ে তিনি সূরার মূল বক্তব্যের প্রতি হয়তো সামান্যই নজর দিয়েছেন অথবা মোটেই সেদিকে খেয়াল করেননি। পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সূরার আলোকে সংশ্লিষ্ট সূরার অবস্থান এবং সে অবস্থানে এ আয়াতগুলোর স্থান এবং তাৎপর্য কি ছিল, তা বিবেচনায় না এনে আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। একটি আয়াত অথবা আয়াতের অংশ বিশেষকে প্রেক্ষিত বিবেচনা না করে এবং সূরায় এর প্রাসংগিকতার দিকে লক্ষ্য না করে অথবা সূরায় অন্য আয়াতের সাথে এর সম্পর্কের কথা চিন্তা না করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ পদ্ধতির ফলে কিছু ব্যক্তির জন্য কুরআন এবং এর আয়াতগুলো জোরপূর্বক তাদের খায়েশ মোতাবেক কিছু সংকীর্ণ ব্যাখ্যার আধার হিসাবে হাজির হয়েছে। এই পদ্ধতির

---

[৩৬] Ibn Salamah, al Nasikh wa al Mansukh, পৃ: ১৯, ৫১; M. Abu Zayd, উ: গ্র: খ. ২. ৫০৩, ৫৮৩; al Zarkashi, al Burhan, পৃ: ৪০; M. Zarqani, উ: গ্র: খ. ২. পৃ: ১৫৬; Wahbah al Zuhayli, উ: গ্র: পৃ: ৭৮-৮৯.

www.pathagar.com

ফলে ঐ সমস্ত ক্ল্যাসিক্যাল জুরীগণের পক্ষে নাসখ এর ধারণা ব্যবহারের মাধ্যমে কুরআন হতে প্রেক্ষিত বিবেচনা না করে আয়াত অথবা আয়াতের অংশ চয়ন করেছেন তাঁদের সময় এবং অবস্থায় খাপ খাওয়ানোর জন্য। আর তাঁদের সময়গুলো ছিল এমন যখন মুসলমানরা ছিল পৃথিবীর একটি বিরাট শক্তি। ঐ সময় তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন নিকৃষ্ট শত্রুদের সাথে যুদ্ধে। এবং তখন যুদ্ধই ছিল রাজনৈতিক বিতর্ক নিষ্পত্তির জন্য একটি যুক্তিসংগত মাধ্যম। সমকালীন বিশ্বে এ পদ্ধতি আর গ্রহণযোগ্যতা নাই।

কুরআনের গবেষণা এবং ব্যাখ্যার জন্য আমাদেরকে পদ্ধতিগুলোর পুনর্বিবেচনা করতে হবে। বিবেচনা করতে হবে কুরআনের আভ্যন্তরীণ সংগঠন এবং বিন্যাসকে। মূল্যায়ন করে দেখতে হবে ঐ প্রক্রিয়াকে যেভাবে তা সুরায় সুরায়, আয়াতে আয়াতে, আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় নবী করিম (সঃ) নিকট অবতীর্ণ হয়েছে।[৩৭]

যে পন্থায় নবী করিম (সঃ) আল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে কুরআনের প্রত্যেক আয়াত এবং প্রত্যেক শব্দকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেছেন তাতে অবশ্যম্ভাবী রূপে একটি ঐশী উদ্দেশ্য ছিল।

নিম্নোক্ত দুটি উদাহরণ ক্ল্যাসিক্যাল ত্রুটিকে তুলে ধরেছে। প্রথম উদারহণটি দ্বারা বুঝানো হচ্ছে কিভাবে মুফাসসিরগণ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে ব্যবহার করেছেন। আয়াতের বক্তব্য হল, *দীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত করে নাই তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়নদিগকে ভাল বাসেন (৬০ ঃ ৮)।*

মুফাস্সীর এবং ফকীহ্গণ দীর্ঘকাল যাবত যুক্তির অবতারণা করেছেন এই নিয়ে যে, তরবারীর আয়াত কি এ আয়াত (শান্তির) কে রহিত করে।[৩৮] সূরা মুমতাহানাতে এর ঘটনা স্থানে যদি এই আয়াতটির প্রতি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখি যে, শান্তিপ্রিয় অমুসলিম আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের প্রতি মুসলমানদের আচরণের একটি সাধারণ নিয়ম এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদেরকে তাঁদের সাথে বন্ধু সুলভ সহযোগী এবং ন্যায়পরায়ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধাবস্থা এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করে। অমুসলিম শত্রুদের সাথে যুদ্ধ এবং শত্রুতামূলক মোকাবিলার সময়, মুসলমানগণ

---

[৩৭] Ibn Kathir, Tafsir al Quiar, খ. ২. পৃ: ৩৩১; Manna al Qattan, Mabahith Ft 'Uum al Qurian (Studies inthe Quaranic Scetences) (Jeddah, Saudi Arabia: al Dar al Su udiyah il al Nashr, n.d.), পৃ: ৪৯-৫৭.

[৩৮] Ibn Salamah, উ: গ্র: পৃ: ৯১; M. Abu Zayd, উ: গ্র: খ. ২. পৃ: ৫৫১-৫৫৩.

www.pathagar.com

নিজেদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে পাহারা দিতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তাঁদেরকে তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে। তাঁদের কোন সাহায্য অথবা সমর্থন করা যাবে না।[৩৯]

সূরাটি এবং আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াত মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে ইসলামী শিষ্টাচার, অমুসলমানদের প্রতি, শান্তি এবং যুদ্ধকালীন সময়ে আচার আচরণের সাধারণ নিয়মের অন্তরালে কি কারণ বিদ্যমান এবং দেখিয়ে দিচ্ছে যে, যুদ্ধ একটি ক্ষণ কালীন অবস্থা। সূরা আল মুমতাহিনাহতে সমগ্র কুরআনের শিক্ষা এবং নির্দেশনার শুরু হয়েছে নিম্নোক্তরূপেঃ

যাহাদের সহিত তোমাদের শত্রুতা রহিয়াছে সম্ভবত আল্লাহ তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়া দিবেন; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৬০ ঃ ৭)।

দ্বিতীয় উদাহরণ আরেকটি আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করে। এই আয়াতটিও একই সূরার অন্তর্গত। আয়াতটি নিম্নরূপঃ

যাহারা তোমার হাতে বায়াত করে তাহারা তো আল্লাহ্রই হাতে বায়াত করে। আল্লাহর হাত তাহাদের হাতের উপর। অতপর যে উহা ভঙ্গ করে, উহা ভঙ্গ করিবার পরিনাম তাহারই এবং যে আল্লাহর সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাহাকে মহা পুরস্কার দেন (৪৮ ঃ ১০)।

আল তাবাবী, ইবনে কাছির এবং আল রাজী বিরচিত কতগুলো প্রধান প্রধান তাফসীর গ্রন্থে প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, এ আয়াতটি মানুষের মধ্যে যে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার প্রতি কোন মনোযোগ দেয়নি। তাঁরা মনোযোগ দিয়েছেন যে লোকগুলির প্রতি আয়াতটি ইঙ্গিত করেছে সে দিকে। ইঙ্গিত করেছে এই বলে যে যারা 'মহাশক্তিধর' এই বলে কাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছে তা নির্ণয় করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আমরা দেখি আল তাবারী, অনেক জুরী এবং পন্ডিতবর্গ কর্তৃক যে সব লোককে ঐ সব ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করে সর্বোচ্চ অনুমান করা হয়েছে তাদের একটি বিরাট তালিকা প্রদান করেছেন। এ তালিকায় তিনি মুসলমানদের সম্ভাব্য সকল শত্রুর নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে তাফসীরকারীগণ পারসি, রোম (বাইজেনটিয়ান) হাওয়াজিন, গাতাফান এবং বনু হানিফাকে তালিকাভুক্ত করেছেন। পন্ডিতদের কতেক সংখ্যক এমনও অনুমান করেছেন যে, আয়াতটির

---

[৩৯] উদাহরণ স্বরূপ দ্রঃ প্রবন্ধ waliy in Arabic dictionaries such as Mukhtar al Sihah by Muhammad ibn Abu Bakr al Razi.

www.pathagar.com

কার্যকারিতা যে সব লোকের এখনও আগমন ঘটেনি, তাঁদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য হতে পারে। পরিশেষে আল তাবারী বিষয়টির উপর উপসংহার টানেন এই বলে যে, বিভিন্ন পন্ডিত যেসব অনুমান করেছেন সেগুলোর কোনটিই সঠিক ছিল কিনা সে সম্পর্কে আয়াতটিতে কিছু বলা হয়নি এবং এটা জানাই যথেষ্ট ছিল যে, যে সমস্ত ব্যক্তির কথা আয়াতে বলা হয়েছে তারা হল ঐ সবব্যক্তি যারা খুব শক্তিশালী।[৪১] ইবনে কাছির অনুমিত তালিকার ব্যাপারে নিম্নোক্ত সংযোজন করেন, আকিফ গোত্র, সকল মূর্তিপূজারী, কুর্দ এবং ছোট চোখ, চেপটা নাক এবং চেপটা চেহারাওয়ালা জাতি যাদেরকে তুর্কী বলে মনে করা হয়েছিল।[৪২] আল রাজীর মন্তব্য এবং বিশ্লেষণ তুলনামূলক ভাবে কম বিস্তারিত হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্যদের মন্তব্যের সাথে এর তেমন পার্থক্য নেই।[৪৩]

মুনাফিকদের মধ্যে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রু ছিল। তাদের তরফ হতে তাঁরা যে বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা আলোচনার জন্য সূরা *ফাতহ* এর সন্নিবেশ এবং গঠনপ্রকৃতি অধিকতর প্রাসংগিক। সূরাটিতে এ সব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি এবং তা মোকাবিলার জন্য মুসলমানদের যেরূপ আচরণ, শৃংখলা এবং কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। মুসলমানদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য এবং মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে বেদুইনদের নিকট হতে যেরূপ সঠিক আচরণ ও শৃংখলা প্রত্যাশিত তা শিক্ষা দেয়ার জন্য এ সূরায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের অভ্যন্তরীণ বিন্যাস ও সংগঠনের প্রতি ক্ল্যাসিক্যাল জুরীগণ সম্ভবতঃ সীমিতাকারেই মনোযোগ দিতে পেরেছেন। তাঁদের মনকে ক্ষুদ্র এবং সীমিত বিষয়গুলো আছন্ন করে রেখেছিল যেগুলোর প্রতি তাঁদের এবং কুরআনের বিশ্লেষণকে সীমিত রাখতে পারতেন। মুসলমান এবং মুসলিম পন্ডিত বর্গ এরূপ সংকীর্ণ আগ্রহ এবং পদ্ধতি বিজ্ঞান নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন না। তৎপরিবর্তে তাঁদেরকে আগ্রহী হতে হয় ঐ সমস্ত মৌলিক বিষয়, মূল্যবোধ এবং নির্দেশনার প্রতি যা পবিত্র কালামে পাকে প্রকাশিত হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস এবং গঠনপ্রকৃতির মাধ্যমে। মন-মানস,

---

৪০ Fakhr al Din al Razi, al Tafsir al Kabir, খ. ২৮. পৃ: ৯৩; Arthur J. Arberry's translation, The Koran Interpreted (New York: The Macmillan Company, 1955), পৃ: ২২৯; Yusuf Altis translation, The Qurian, পৃ: ১৩৯৫-১৩৯৬; M. Pickthall's translation The Glortous Quran, পৃ: ৩৬৬.

৪১ Al Tabari, উ: গ্র: পৃ: ৮২-৮৪

৪২ দ্রঃ Ibn Kathir, উ: গ্র: খ. ৪, পৃ: ৯০-৯৩.

৪৩ দ্রঃ al Razi, উ: গ্র: খ. ২৮. পৃ: ৯১-৯৩.

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতি বিজ্ঞানের ক্ল্যাসিক্যাল কাঠামো হতে সূরাহ আল বাকারার ২৫৬ নং আয়াতের *(ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি নাই)* ব্যাখ্যার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনে কাছির যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ আয়াতটির ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি বেশ দূরবর্তী সূরা ফাতহ্ এর ৪৮ নং আয়াত এবং দূরবর্তী অপর এক সূরাহ তাওবাহ এর ৩৬ নং আয়াতের দিকে ফিরে যান। ইবনে কাছির ২ঃ২৫৬ নং আয়াতের প্রথম অংশের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ[৪৪]

কিছুসংখ্যক জুরীর মত হল আয়াতটি (ধর্মে জবরদস্তি নাই) যুদ্ধের আয়াত (৯ঃ৩৬) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে এবং সকল জাতিকে আহ্বান করতে হবে ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য। যদি কোন ব্যক্তি তা না করে আত্মসমর্পণও না করে, জিয়য়া ও প্রদান না করে তাহলে নিহত না হওয়া পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যেতে হবে। বাধ্যতামূলক এর অর্থ এটাই। আল্লাহ বলেন, 'বিরাট শক্তিধর' জাতির বিরুদ্ধে তোমাদেরকে ডাক দেয়া হবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যদি না তারা আত্ম সর্ম্পণ করে। আল্লাহ বলেন, হে নবী অবিশ্বাসী এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করুন। তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন।

ব্যাখ্যার এ দিকগুলোর উপর এবং সনাতন পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে মুসলমান পন্ডিতগণের বেশী মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।[৪৫]

ছাত্রদেরকে কুরআনের আভ্যন্তরীণ সংগঠনের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সাইয়েদ কুতুব তাঁর ফি যিলালুল কুরআন (কোরআনের ছায়ায়) নামক তাফসীর গ্রন্থে কুরআনের আলোচনা করার জন্য প্যারাক্রম চালু করেছেন। কোরআনের আভ্যন্তরীণ বিন্যাস এবং গঠন থেকে আরও কার্যকর সুশৃংখল এবং উত্তম ধারণা লাভের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া যেতে সগুলোর মধ্যে এটি মাত্র একটি।

ধর্মান্ধতা হতে যুক্তিবাদে

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম চিন্তাধারার উন্নয়নে সুশৃংখল বাস্তব সম্মত পদ্ধতি হিসাবে দ্বিতীয় পদক্ষেপটি হল আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যস্থিত সম্পর্কের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সনাতন ভুল ধারণা সংশোধন করা। এ ভুল ধারনার গুরুত্ব হল এই যে, কতিপয় শর্তের আওতায় মুসলমান এবং অন্য জনগোষ্ঠীর মধ্যকার আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা ধর্মান্ধতার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

---

[৪৪] দ্রঃ IbnKathir, উ: গ্র: খ. ১. পৃ: ৩১০-৩১১

[৪৫] দ্রঃ W. al Zuhayli, উ: গ্র: পৃ: ৯৯.

www.pathagar.com

যারা ধর্মান্ধ, তাঁদের মধ্যে মুসলিম সামাজিক পদ্ধতির অবক্ষয় এবং দুর্নীতি পরায়ণতা সম্পর্কে একটা বিশেষ ধরনের উৎকণ্ঠা আছে। কিন্তু এ অবক্ষয় থেকে পরিত্রাণের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মারাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয়। আন্তঃসাম্প্রায়িক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ ধর্মান্ধতার দিকটি হল এমন একধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যাতে নিজকে সম্পূর্ণরূপে সঠিক বলে মনে করা হয়। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণে অমুসলিমদের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করা হয় না (সকল অমুসলমানকে মুসলমানদের শত্রু বলে মনে করা হয়)। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি কেবল মুসলমান অমুসলমানের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর নয় বরং ইসলামের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের জন্যেও ধ্বংসাত্মক। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে,

আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণা করিয়াছি (২১ঃ১০৭)।

দীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করে নাই তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করিতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়নদিগকে ভাল বাসেন (৬০ঃ৮)।

মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত এবং ধর্মান্ধ দৃষ্টি ভঙ্গির বিকাশে দুটি উপাদান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। প্রথমটি হল প্রাথমিক কালের মুসলমানদের চতুর্দিকে যে সব শত্রুভাবাপন্ন আরব এবং ইহুদী গোত্র ছিল তাদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেদনাদায়ক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার প্রভাব। দ্বিতীয়টি হল কুরআনে পাক যে প্রেক্ষিত থেকে তার বক্তব্য উপস্থাপন করে সে সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। কুরআন এবং ইসলাম কখনও মানুষকে ধর্মের ব্যাপারে কর্তৃত্ব গ্রহণের অবস্থান নেওয়ার অনুমোদন করে না। কিন্তু তথাপি ধর্মান্ধতার জন্ম হয় তখন যখন একজন মুসলিম বাস্তবক্ষেত্রে নিজেকে মহান রাব্বুল আলামিনের সমকক্ষ চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এবং জ্ঞানের অধিকারী বলে ভেবে অন্যলোককে বিচার বিশ্লেষণ করে।[৪৬]

কাফিররা বলে, 'তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না এবং উহা আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাহাতে তোমরা জয়ী হইতে পার।' আমি অবশ্যই কাফিরদিগকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব এবং নিশ্চয়ই আমি উহাদিগকে উহাদের নিকৃষ্ট

---

৪৬ দ্রঃ Hasan al 'Ishmawi, Qalb Akhir li Ajl al Zaim (Another Heart for the Leader) (Beirut: Dar al Fath, 1970). পৃ: ৯৮-১৮০; M. D. al Rayyis, al Nazaruyah al Siyasyah, পৃ:৩২০-৩৪১; and M. Khadduri, War and Peace, পৃ: ৭-১৮.

www.pathagar.com

কার্যকলাপের প্রতিফল দিব। জাহান্নাম, ইহাই আল্লাহর শত্রুদের প্রতিফল; সেথায় উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী আবাস, আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ। ৪১ ঃ ২৬-২৮)

মুনাফিক নর, মুনাফিক নারী ও কাফিরদিগকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জাহান্নামের অগ্নির, যেথায় উহারা স্থায়ী হইবে, ইহাই উহাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ উহাদিগকে লানত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি। (৯ ঃ ৬৮)

পবিত্র কুরআনে এরূপ অনেক আয়াত আছে। কিন্তু এ সমস্ত আয়াতে আল্লাহর যে অবস্থান সেরূপ অবস্থান থেকে অমুসলিমদের ব্যাপারে কথা বলা মুসলমানদের জন্য একটি মারাত্মক ত্রুটি। এসব আয়াতে আল্লাহ যা বলেন, তা তিনি বলেন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এবং প্রজ্ঞার সাথে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে অবিশ্বাসীদের দ্বন্দ্ব এবং তিনি যে ভাবে তাদেরকে তিরস্কার করেছেন তার উল্লেখ করে মুসলমানদের এসব আয়াতের ব্যাখ্যা করা সমীচীন নয়। কারণ সকল সময়ের জন্য সকল মুসলমানের সকল অমুসলমানের প্রতি এ অবস্থান নয়। (এটিকে একটি স্থায়ী অবস্থান হিসাবে গণ্য করে আয়াতের ব্যাখ্যা করা এজন্য সঠিক নয়- অনুবাদক)। এসব আয়াতে স্থান কালের যে উপাদান বিদ্যমান তাকে তাহলে এরূপ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যাবে। ইসলামের বিশ্বজনীন মিশনের পতাকাবাহী হিসাবে তাদের ভূমিকার প্রতি এরূপ ব্যাখ্যা মারাত্মক আঘাত হানবে। ইসলামী মিশনের বাহক হিসাবে তাদের যে মানবিক ভূমিকা পালন করতে হবে সে সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে কুরআনের সে সব আয়াতগুলোর উপরও সমগুরুত্ব দিয়ে মুসলমানদের পাঠ করতে হবে। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ দেয়া হল ঃ

যাহাদের সহিত তোমাদের শত্রুতা রহিয়াছে সম্ভবত আল্লাহ্ তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়া দিবেন; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। দীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করে নাই তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়নদিগকে ভালবাসেন (৬০ ঃ ৭-৮)।

স্মরণ কর, আদ্ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, যাহার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা আসিয়াছিল। সে তাহার আহ্কাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া 'তোমরা' আল্লাহ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না। আমি তো তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি (৪৬ ঃ ২১)।'

www.pathagar.com

মুমিন ব্যক্তিটি বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি- যেমন ঘটিয়াছিল নূহ, আদ, ছামূদ এবং তাহাদের পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে। আল্লাহ তো বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম করিতে চাহেন না। হে আমার সম্প্রদায়। আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি আর্তনাদ দিবসের' (৪০ ঃ ৩০-৩২)।

উহারা মুমনি হইতেছে না বলিয়া তুমি হয়ত মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হইয়া পড়িবে (২৬ ঃ ৩)।

বল 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট সত্য আসিয়াছে। সুতরাং যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজেদের ধ্বংসের জন্য এবঙ আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নহি (১০ঃ১০৮)।

অন্যলোকের সাথে যোগাযোগের চ্যানেলে যে সব কার্যাবলী প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সকল মুসলমানকে সেসব কাজ পরিহার করে চলার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ঐতিহাসিক ঘটনা এবং পুনর্জীবিত দ্বন্দ্বের কারণে যেন এমন না হয় যে তারা কোন অশত্রু অমুসলিম ব্যক্তি বা জনগণের সাথে শত্রুর মত আচরণ করবে। অমুসলিম শত্রুদের সাথে অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের আচরণ হবে যুক্তিপূর্ণ এবং সংহত।

যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারিগণকে ভালবাসেন না। ....যদি তাহারা বিরত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ...যদি তাহারা বিরত হয় তবে জালিমদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও আক্রমণ করা চলিবে না। (২ ঃ ১৯০-১৯৩)

মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তাহার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। আল্লাহ্ যালিমদিগকে পসন্দ করেন না। .. কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়, উহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি। অবশ্য যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয় উহা তো হইবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ। (৪২ঃ ৪০-৪৩)

কুরআনের এসব উদাহরণ হতে জানা যায় মুসলিম সমাজের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এবং সংখ্যালঘু অথবা বিদেশীদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মীয় গোড়ামীর সত্যিকার বিপদ কিরূপ। এ উদাহরণগুলোর বিভিন্ন অবস্থানকে যদি নির্বিচারে আদান প্রদান করার

www.pathagar.com

সুযোগ করে দেয়া হয় তাহলে এর যৌক্তিক পরিণতি হবে ধর্মান্ধতা। এটাকে পরিহার করার জন্য আল্লাহ এবং মানুষের ভূমিকার মধ্যে কিরূপ পার্থক্য বিদ্যমান মুসলমানদের তা নির্ণয় করতে হবে। কুরআন তার বক্তব্যকে চূড়ান্ত উচ্চারণে প্রকাশ করার জন্য নাযিল হয়েছে। এর আবেদন সরাসরি মানুষের বিবেকের প্রতি। মুসলমানদের উপর খিলাফতের (প্রতিনিধি ও আমানতদার) মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য এ দায়িত্বের অন্তর্গত। মুসলিম কর্তৃপক্ষের উপর দায়িত্ব রয়েছে খিলাফতের এ দায়িত্বকে এগিয়ে নেয়ার, একে ধ্বংস-করার নয়।[৪৭]

সুতরাং কুরআন, সুন্নাহ এবং মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজন ধারণাগত স্বচ্ছতা। বিভিন্ন গোত্র, বর্ণ ভাষা, অঞ্চল এবং আদর্শের মানুষের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক সহযোগিতার প্রত্যাশাকে কোন মুসলমানের অবহেলা করা সমীচিন নয়। কুরআনের লালিত আদর্শে মুসলিম জাতির ধৈর্য্যের সনাতন রূপ মানুষের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সকল সম্ভাব্য দ্বার পুনরায় উন্মুক্ত করা উচিৎ। এসব চ্যানেলগুলো এ পৃথিবীতে মানব রচিত সীমারেখাকে অতিক্রম করে মানব জাতির সম্মুখে উন্নত এবং আরও ইনসাফ ভিত্তিক জীবনের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে।

ইসলামী কাঠামো

তৃতীয় পদক্ষেপ হল, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য একটি আদর্শিক ভিত্তি অথবা কাঠামোর নকসা প্রণয়ন। তাছাড়া কুরআনের আয়াতগুলোর মধ্যে, সামঞ্জস্য রক্ষার এবং আল্লাহর প্রতি মানুষের মধ্যে সুন্দর বিনয়কে লালন করার বিষয়তো রয়েছেই।

ক্ল্যাসিক্যাল মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং ক্ল্যাসিক্যাল সময়কালের মুসলিম রাজনীতির প্রশাসনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম নীতি নির্ধারকগণ নবী করিম (সঃ) এর- যৌক্তিক ইসলামী রাজনৈতিক নীতিমালা হতে লাভবান হয়েছেন এবং মূলত সেগুলো দ্বারা পরিচালিতও হয়েছেন। মুসলমানদের জানা বিশ্ব রাজনীতির ভিত্তি এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং সামরিক কৌশলগুলোর ভিত্তি যখন মৌলিকত্বের দিক থেকে একই রূপ ছিল তখন এটা সম্ভবপর এবং যুক্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু পদ্ধতিগত এবং কৌশলগত পরিবর্তনের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রাথমিক যুগের

---

৪৭ কুরআনে বহু আয়াত আছে যেগুলো মুসলিমদের শিক্ষা দেয় অন্যান্য মানুষের জন্য ভাবতে এবং ভালবাসতে এবং মানুষের সাহায্য ও সেবায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করার জন্য মুসলিম কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানায়। উদাহরণস্বরূপ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দেখুন ৩:১৫৯, ১৪:৩৬, ৬:৮, ৩:১০৩-১০৫, ২:১৯০ প্রভৃতি।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ইসলামিক ঘটনাবলী এবং নীতিমালা হতে আর লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা সেরূপ নেই। বর্তমানে সমকালীন প্রয়োজন এবং কৌশলের নিরিখে দরকার অবাধ অনুসন্ধানে এমন এক নতুন উদ্যোগ যা পরিকল্পিত হবে মুসলিম নীতি নির্ধারকগণকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সাহায্য করার লক্ষ্যে। মুসলিম নীতি নির্ধারকগণের সাহায্যার্থে প্রয়োজন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত, বোধগম্য, সুশৃংখল পরীক্ষামূলক ইসলামী সমাজবিজ্ঞান। প্রাথমিকযুগের ইসলামী উৎস এবং ঐতিহাসিক নীতিমালা থেকে একজন মুসলিম নীতিনির্ধারকের যে বিষয়টি প্রয়োজন তা হল পথ নির্দেশ হিসাবে এমন একটি আদর্শিক প্যারাডাইম (মডেল) যা মুসলিম জনগণের চেতনার প্রতি প্রতিক্রিয়া করার জন্য এবং তাঁদের শক্তি সামর্থকে সক্রিয় করার লক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তাঁদেরকে সক্ষম করবে। ইসলামী আদর্শিক কাঠামো প্রয়োজন কেবল মাত্র ইসলামী দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্যই নয় বরং এটা প্রয়োজন মৌলিক অগ্রাধিকারগুলো চিহ্নিত করার জন্যেও। অপ্রয়োজনীয় সকল প্রকার স্থানকালের উপাদানগুলো অপসারণের জন্য আদর্শিক কাঠামোকে হতে হবে যথেষ্ট সাধারণ প্রকৃতির। মুসলিম নীতি নির্ধারক এভাবে সক্ষম হবেন সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা এবং পছন্দসমূহ বিবেচনা করতে।

এক্ষণে প্রয়োজন, ইসলামী চিন্তাভাবনার কেন্দ্র বিন্দুতে যে সমস্ত মৌলিক নীতি এবং মূল্যবোধ রয়েছে সেগুলোর কিছুসংখ্যকের সারসংক্ষেপ তৈরী করা।[৪৮] হৃদয়ে এ মৌলিক বিষয়গুলোকে স্থান দিয়ে যে কেউ সমকালীন মুসলিম সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীগণের অনেক সিদ্ধান্ত এবং নীতিমালা উপলব্ধি এবং মূল্যায়ন করতে পারে।

মৌলিক নীতিমালা

তাওহীদ

ইসলামের সবচেয়ে মৌলিক নীতি হল *তাওহীদ*। কারণ ইসলামী কাঠামোর অন্তরালে যে উদ্দেশ্য নিহিত তা তাওহীদ থেকেই উৎসারিত। তাওহীদের শিক্ষা স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহর অস্তিত্বের শিক্ষা, এর শিক্ষা আল্লাহর একত্ব এবং অনন্যতার শিক্ষা। এর শিক্ষার মধ্যে আছে মানুষের ঐক্য এবং সাম্যের বিষয়। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা এবং প্রতিনিধি। পৃথিবীতে শাসন চলবে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সাথে সংগতি রেখে।

---

৪৮ দ্রঃ the Quran, ৬:১০১-১০৪, ৪:১, ৪৯:১৩, ৬৭:২, ২:৩০, ৭:৩২ ২১:৩৫, ১৬:১২৫-১২৬, ৩:১৫৯, ১৬:৯০-৯১, ৩:৬৪, ৫:২, ২১:৯৪, ৯:৩৬, এবং ২:১৯৩, আরও দেখুন B.E. Smith, Religion and Political Development (Bason: Little, Brown & Co., 1970).

www.pathagar.com

এসব বিষয়ও মূলত তাওহীদের শিক্ষারই প্রকাশ।

তাওহীদের ধারণা থেকেই ইসলামের মৌলিক ধারণা এবং আদর্শিক ভিত্তির বিকাশ হয়েছে। মহান আল্লাহ এবং তার সৃষ্টির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক আছে। মানুষের জীবনের প্রকাশ তাওহীদের এক অভিব্যক্তি। মানবজীবন এখানে পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষা হবে জীবনে উৎকর্ষতা সাধন এবং সার্থকতা অর্জনের ব্যাপারে। সমাজে ব্যক্তি মানুষের উপর এটাই চূড়ান্ত দায়িত্ব এবং উদ্যোগ গ্রহণের জন্য দায়িত্ব আরোপ করে। মানব সম্পর্কের মান অথবা একজন ব্যক্তির গুণাগণ বিচারে বর্ণ, ভাষা অথবা সম্পদের পার্থকের মানব রচিত ভিত্তির আলোকে ভেদা ভেদ করার জন্য এতে কোন প্রকার সুযোগ নেই।

তাওহীদ এমন এক মানব সমাজের ভিত্তি রচনা করে যাতে আল্লাহর খলিফা হিসাবে প্রত্যেক মানুষের উপর দায়িত্ববর্তায়। এরূপ সমাজে উৎকর্ষতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব কেবল মাত্র স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য অর্পিত থাকে নির্ধারিত। মানুষের জীবনে এবং সমাজিক পার্থক্য হয় কেবল গুণ, কর্ম এবং কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে। তাওহীদের আদর্শ সমাজ এবং ব্যক্তিকে তার গন্তব্যের লক্ষ্যের ব্যাপারে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করে। অমুসলিমদের প্রতি মুসলমানদের সহনশীলতার জন্য এটাই হল ভিত্তি।[৪৯]

ন্যায়বিচার *(আদল)*

সকল প্রকার কর্মকান্ডে মুসলমানদের উপর স্বচ্ছতা এবং ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শনের নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ পাক বলেনঃ

হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকিবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করিবে, তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহার সম্যক খবর রাখেন। (৫ ঃ ৮)। [৫০]

যেহেতু ন্যায়পরায়নতার ধারণা ইসলামের একটি মৌলিক নীতি, সেহেতু সকল প্রকার বহিঃসম্পর্ক বিষয়ে স্বচ্ছতা এবং ন্যায়পরায়তার প্রতি ইসলাম মুসলমানদের দায়িত্ব এবং অঙ্গীকার সম্প্রসারিত করে। কোন একটি বিশেষ বিষয়ে ন্যায়নীতি কি, কিভাবে সে রায়ে উপনীত হওয়া যায়, এবং কিভাবে বর্তমানে মুসলমানগণ বিশ্ব আন্তর্জাতিক

---

[৪৯] দ্রঃ আরও M. Abu Zahrah, উ: গ্র: পৃ: ১৯-৪৭; এবং Sayyid Qutub, al Salam al 'Alami wa al Islam (Cairo: Dar Ihya al Kutub al 'Arabiyah, 1967), পৃ: ১২৮-১৫৫.

[৫০] দ্রঃ the Quran at ১৬:৯০, ৫৭:২৫, ৭:২৯, ৪:৪৮, ৪৯:৯, এবং ৬০:৮.

www.pathagar.com

পদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে পারেন অথবা সে পদ্ধতির কোন একটি অংশের উপাদান এবং প্রক্রিয়ার সাথে নিজদেরকে খাপ খাওয়ানো যায়- এগুলোই হল সে সব বিষয় যেগুলো সম্পর্কে পদ্ধতির অভ্যন্তর হতে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর পারস্পরিক সম্মতির (চুক্তির) দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

শান্তি পারস্পরিক সমর্থন এবং সহযোগিতা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম ঐক্যের জন্য এগুলো হল ন্যূনতম প্রয়োজন। আল্লাহ পাক বলেনঃ

মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহকে ভয় কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও (৪৯ ঃ ১০)।

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করিবে না। আল্লাহকে ভয় করিবে নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (৫ ঃ ২)

বুখারী এবং মুসলিম এর একটি হাদিসে উল্লেখ আছে নবী করিম (সঃ) এ ধারণাগুলোকে হাদিসটিতে নিম্নোক্তরূপে সংক্ষেপ করেছেনঃ *একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ক্ষতি করেনা অথবা তাকে পরিত্যাগ করেনা। যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করে তাহলে আল্লাহ তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।*[৫১]

নবী করিম (সঃ) যে সমস্ত মুসলিম একই বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার তাঁদের মধ্যকার সম্পর্কের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন আরও একটি হাদিসে। হাদিসটি বোখারী শরীফে নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হয়েছেঃ

সে ব্যক্তি মুসলমান যাঁর হাত এবং জিহবা হতে অপর মুসলমান নিরাপদ।[৫২]

কুরআনের এসব আয়াত এবং রাসুলের হাদিস এবং আরও প্রমাণাদি ব্যক্তি, দল এবং রাষ্ট্র হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য একটি ভিত্তি রচনা করে। এসব বিষয় সুস্পষ্টরূপে মুসলমানদের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের ন্যূনতম প্রয়োজন সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এসব আয়াত এবং হাদিসে আক্রমণ এবং সন্ত্রাসকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। উৎসাহিত করা হয়েছে পারস্পরিক সাহায্য এবং সহযোগিতার চেতনাকে। মুসলমান জনগণের মধ্যে শান্তি

---

[৫১] Wali al Din al Tabrizi, Mishkat al Masabith, ed. Nasir al Din al Albani (Damascus: al Maktab al Islami, 1961), খ. ১. ৬০৬.

[৫২] M. M. Khan, The Translation of the Meaning of Sahth al Bukhari (Gujaranwala, Pakistan : Sethi Wtraw Mills Limited, n.d.), খ. ১. পৃ. ১৮-১৯.

www.pathagar.com

সংরক্ষণ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সকল সম্ভাব্য শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যবহার করার জন্য ইসলাম মুসলমানদেরকে নির্দেশ প্রদান করে। কুরআন দাবী করে যে, যেখানে সম্ভব মুসলমানদের উচিৎ নিজেদের সংগঠিত করা এবং একটি যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মুসলমানদের শান্তি বিনষ্টকারী ধ্বংসাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত মুসলিম শত্রুদের বিরুদ্ধেও শক্তি প্রয়োগের কথা আছে। আল্লাহ বলেনঃ

মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে; আর তাহাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়া বাড়ি করিলে যাহারা বাড়া বাড়ি করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে-যদি তাহারা ফিরিয়া আসে তাহাদের মধ্যে ন্যায়ের সহিত ফয়সালা করিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদিগকে ভালবাসেন। (৪৯ঃ৯)

এ ন্যূনতম প্রয়োজনগুলোর বাইরে যে সব বিবরণ বিস্তৃত সেগুলোকে বিবেচনা করতে হবে তাদের স্বস্ব মানের ভিত্তিতে। সেক্ষেত্রে ঐসব হাদিস যেগুলো উপরে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করা যাবেনা। এ হাদিসগুলোর সম্পর্ক হল নবী করিমের (সঃ) এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাগণের দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্র এবং সমাজের অবস্থার সাথে।

মুসলমানদের মধ্যকার সশস্ত্র সংঘাত এবং আগ্রাসনের অনুপস্থিতি এবং মুসলমানদের জাতীয় চেতনা কোন বিশেষ রাজনৈতিক কাঠামোর উপস্থাপন করেনা। ইসলাম মুসলমানদেরকে গঠনমূলক প্রগতিশীল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে। কেবলমাত্র এ পদ্ধতিতেই দায়িত্ব এবং কর্তব্যের ইসলামী আদর্শ অর্জন করা সম্ভব।

আধুনিক মুসলিম চিন্তা ধারায় মুসলিম ঐক্য এবং রাজনেতিক সংগঠন বিষয়ক প্রাথমিক যুগের ইসলামী উৎস সমূহের সনাতন ব্যাখ্যা একটি বিভ্রান্তিকর বিষয়। এটাকে অবশ্যই পরিস্কার করতে হবে। মুসলিম ঐক্যের সনাতন ব্যাখ্যাসমূহের বক্তব্য হচ্ছে মূলত একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কাঠামোর অনুকূলে। এরূপ কাঠামো ছিল নবী করিম (সঃ) এবং তাঁর পরবর্তী চার খলিফার পরবর্তী সরকারের (৬২২-৬৬০ খৃঃ)। প্রধানত সনাতন অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে কিছু সংখ্যক হাদিস থেকে। এ হাদিসগুলো হল একেবারে প্রাথমিক যুগের মুসলিম সরকারের রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট।[৫৩]

সনাতন ব্যাখ্যা অবশ্য এসব হাদিসের সাথে যে স্থানকালের উপাদান বিদ্যমান

[৫৩] Ahmad Amin, Yawm al Islam, (Cairo : Muasasats al Khanji, 1958), পৃ: ১৪৩-১৫২; 'Aziz Ahmad, Islamic Modernism in India and pakistan; 1857-1954 (London; 'Arabi (Beirut, Dar al Nahar, 1970), পৃ: ২৫০-২৫১; Muhammad 'Abduh, al Islam wa al Radd 'ala Muntaqidih (Cairo: al Maktabah al Tijariyah al Kubra, 1928), পৃ: ৭৬;

www.pathagar.com

তাকে অবহেলা করেছে। প্রতিনিধিত্বমূলক কিছু হাদিসের আলোচনা থেকে সনাতন ব্যাখ্যার ভুল ধারণা সমূহ সুস্পষ্ট হবে এবং ইসলামিক রাজনৈতিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ঐক্য এবং ক্ষমতার বুদ্ধিদীপ্ত উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া যাবে। এসব হাদিসের মধ্যে নিম্নোক্তগুলো উল্লেখ করা হল। আরফাজা বলেনঃ

আমি নবী করিম (সঃ) কে বলতে শুনেছি, সেখানে কিছু গোলমাল হতে চলছে; যে কেউ বিদ্যমান ঐক্যে ফাটল ধরাতে চায় সে যেই হোক না কেন তাকে তরবারী দ্বারা আঘাত কর।[৫৪]

জাবির (রাঃ) বলেনঃ *বিদায় হজ্জে নবী করিম (সঃ) জনগণকে শ্রবণ করতে বললেন। তিনি বললেনঃ যে সমস্ত অবিশ্বাসী একে অপরের গর্দানে আঘাত করে, একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের মত কাজ করার জন্য আমার মৃত্যুর পর ফিরে যেও না।*[৫৫]

উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, *নবী করিম (সঃ) মদিনার এক নগর ভবন থেকে বাইরে তাকালেন এবং তারপর বললেনঃ তোমরা কি জান আমি কি দেখছি। তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেনঃ আমি দেখছি হত্যা (কিতাল) এবং বৃষ্টির মত (নৈরাজ্য) তোমাদের বাড়ী ঘরে চলছে।*[৫৬]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বলেনঃ

আমরা যখন কিছু সংখ্যক জন্তুর যত্ন নিচ্ছিলাম তখন আমরা আল্লাহর রসূলের (সঃ) ঘোষককে মসজিদে একটি সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ডাকতে শুনলাম। আমরা নবী করিম (সঃ) সাক্ষাতে হাজির হলাম। তিনি বললেন, আমার পূর্বে এমন কোন নবী ছিলেন না যিনি তাঁর লোকদের জন্য যেটা ভাল বলে জেনেছেন সেটা তাদের নিকট উল্লেখ করা তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেননি। এবং তাদের জন্য যেটা খারাপ বলে জেনেছেন সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেননি। এটার প্রবর্তনের সাথে সাথে তোমাদের জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। শেষের দিকে উম্মাহ একটি প্রলয়ের মধ্যে পতিত হবে, পতিত হবে এমন জিনিষের মধ্যে যা তোমরা অনুমোদন করবে না। সুতরাং যে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি এবং জান্নাতের কামনা করে, তার উচিৎ লোকদের সাথে সেরূপ ব্যবহার করা যেরূপ ব্যবহার সে তাদের নিকট থেকে প্রত্যাশা করে। যে ব্যক্তি তার আনুগত্য কোন ইমামের (রাজনৈতিক নেতা) প্রতি প্রদান করে, তাকে স্বীকৃতি দেয় এবং হৃদয়ের আনুগত্য প্রদান করে যদি পারে সে যেন তাঁকে মান্য করে। যদি অন্য কেউ

---

[৫৪] দ্রঃ al Mundhiri, Mukhtasar Muslim, খ. ২. পৃ: ৯৪.

[৫৫] দ্রঃ al Bukhari, al Jami al Sahih, খ. ১১. পৃ: ৪২-৪৩; al Mundhir, উ: গ্র: খ. ১. পৃ: ১৯.

[৫৬] al Bukhari, উ: গ্র: খ. ৯. পৃ: ৪০-৪১.

www.pathagar.com

[৫৭]

নবী করিম (সঃ) এর ওফাতের অব্যবহিত পরে আরব ভূখন্ডে কিরূপ অবস্থা বিরাজ করছিল এ হাদিসগুলো সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ঐসময় বেদুইন গোত্রগুলোর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মুসাইলামা এবং আসওয়াদ আল আনবাসীর ন্যায় ভন্ডনবীরদল নবী (সঃ) মদিনার কেন্দ্রিয় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং সরকারকে চ্যালেঞ্জ করতে আরম্ভ করে। মদিনা রাষ্ট্রে রাজনৈতিক পদ্ধতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিদ্রোহের বিষয়গুলোর প্রতি এ হাদিস সমূহ ইঙ্গিত করছে।

উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোতে *উম্মাহ* শব্দটি হল মূল। কারণ এর ইঙ্গিত হল নবী (সঃ) এর প্রজন্ম এবং তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) প্রতি। সনাতন ব্যাখ্যায় এ হাদিস সমূহ হতে যেরূপ সাধারণীকরণ করা হয় তাতে এগুলোতে স্থানকালের যে উপাদান বিদ্যমান তাকে বিবেচনায় আনা হয়নি। যদি এ হাদিসগুলোতে বিদ্যমান স্থান কালের উপাদানের স্বীকৃতি থাকে এবং উম্মাহ শব্দটির অর্থ সংশোধন করা হয় (প্রজন্মকে এবং প্রাথমিক যুগের মদিনার সমাজকে বুঝাবার জন্য) তাহলে এ হাদিসগুলো আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশের প্রয়োজনীয় রাজনীতির ধরন এবং অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন আইনগত সমস্যার সৃষ্টি করে না।[৫৮]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে বলতে হয় সকল মুসলমানের জন্যএকটি স্থায়ী কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং লালন করার জন্য মুসলমানদের জন্য নির্দেশনামা হিসাবে এসব হাদিসের ক্ল্যাসিক্যাল ব্যাখ্যা বিকাশমান মুসলিম সমাজের সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণের বিষয়কে সাহায্য করেছে। আমরা উল্লেখ করেছি তখন থেকে মুসলিম বিশ্বে যে সব রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং বিবর্তন দেখা দিয়েছে সে প্রেক্ষিতে মুসলিম চিন্তাধারা পিছিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমন আমরা অবগত হয়েছি যে, জুরীগণ এমন কোন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অথবা বাস্তব সমাধানের কোনটাই প্রবর্তন করতে সক্ষম হননি। সে জন্য তাঁরা বাধ্য হয়ে আব্বাসীয় শাসকগণের সমগ্র খিলাফত পদ্ধতির পতনকাল পর্যন্ত সামরিক এক নায়ক এবং অবৈধ নব্য স্বাধীন সার্বভৌমদের রাজনৈতিক দুর্নীতির সাথে আপোষ করে চলা এবং ঐসব কর্মকান্ডকে যুক্তিযুক্ত করার জন্য বাধ্য হয়েছিলেন।

---

[৫৭] দ্রঃ al Farra, Kitab al Imamah, inNusus al Fukr, ed. yusuf al Ibish, পৃ: ২১৮; al Mundhiri উ: গ্র: খ. ২. পৃ: ৮৭. Notice that inthe last hadith the Prophet was addressing immediate issues and circumstances rather than the future in general.

[৫৮] দ্রঃ Charles G. Fenwick, InternationalLaw, ৩য় সং সংশোধিত (New york: Appleton-Century Grafts, Inc., 1948), পৃ: ১৪০-১৪৮; Hans Kelsen, Principles of International Law, ২য় সং (New york: Holt, Rinehart and Winston, Ince. 1966), পৃ: ৪১৪-৪১৮; এবং Muhammad Hafiz Ghanim, Mabadt al Qanun al Dawit, পৃ: ২৯২-২৯৫.

www.pathagar.com

তখন থেকে জুরীগণের নিকট প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বিশ্বের জন্য কোন প্রকারের ফেডারেল অথবা কনফেডারেল অথবা বহু জাতিক ধরনের রাজনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হয়নি যদিও লেখক ও জুরীগণ এখন আর একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের উপর জোর দিচ্ছেন না। একটি মাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের যেকোন বিকল্পকে দেখা হয় কাঙ্ক্ষিত অবস্থার চেয়ে আরও কঠোর প্রয়োজন হিসাবে। এ অবস্থান গ্রহণ করে মুসলিম চিন্তাধারা মুসলিম জনগণকে দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি এবং সমকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক বাস্তবতার ধারাও স্রোতের পশ্চাতে চলতে থাকে। ক্ষমতা এবং রাজনীতির কলাকৌশল সম্পর্কে মুসলমানদের উপলব্ধিকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করার বাস্তব প্রয়োজন রয়েছে যে পর্যায় থেকে ইসলামী তত্ত্ববিদগণ কার্যভিত্তিক ঐক্য এবং নকল সমতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন এবং মুসলিম শক্তি এবং ঐক্যের প্রতীক হিসাবে সহজ কেন্দ্রীয় অথবা আধা কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিকল্প হিসাবে সুষ্ঠু এবং বাস্তবধর্মী সংমিশ্রণকে গ্রহণ করতে পারেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম দেশগুলো ক্রমবর্ধিত সংখ্যায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে এবং ঘনিষ্ট সংযোগ এবং সহযোগিতার জন্য প্রায় সবগুলো প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ অর্জন করে। আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের সংগঠন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান (দ্যা এবার ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক), আরব অর্থনৈতিক ইউনিয়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন একটি পরিষদ (দ্যা এরাব কমন মার্কেট) আরব লীগের রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে যৌথ প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য স্বাক্ষরিত হয় অনেক চুক্তি (এরাব কালেকটিভ সিকিউরিটি প্যাকট)।[৫৯] মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যোগাযোগের একটি ব্যাপক ভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি হল আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও, আই, সি)। এটির রয়েছে একটি স্থায়ী সচিবালয়। এ সচিবালয়ের অন্তর্গত বহু সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক, আর্থিক এবং বিচার সম্পর্কীত প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

---

[৫৯] এরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হল : The Convention for Facilitating Trade Exchange and the Regulation of Transit Trade between States of the Arab League, the Convention for the Settlement of Payments of Current Transactions and Movements of Capital between States of the Arab League, the Convention on the Privileges and Immunities of the League of Arab States, the Federation of Arab Lawyers, the Arab Journalists Union, the Arab Teachers Union, the Federation of Arab Physicans, the Arab Leagues series of Arab social Welfare seminars and Arab health seminars, the Arab Manuscript Institute, the Cultural Museum, the Cooperative Training Centre, the Institute of Advanced Arab Studies, the Organization of the Arab Scientific Federation, the Arab Telecommunications Union, the Arab Postal Federation, the Arab Broadcasting Union, the Arab Civil Aviation Council, etc.

www.pathagar.com

এগুলো এবং অন্যান্য যেসব চুক্তি সমঝোতা, সম্মেলন ও প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভ করেছে সেগুলো দেখে বুঝা যায় যে, আরব এবং অনারব মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন এবং সহযোগিতা জোরদার করণ ও তাদের মধ্যে বিরাজমান উত্তেজনা এবং দ্বন্দ্ব প্রশমনের জন্য আর কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কদাচিত প্রয়োজন হবে।[৬০] এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর ভূমিকাই মুসলমানদের কথিত স্বাধীনতা, ক্ষমতা, সম্মান এবং আন্তর্জাতিক সমাজে তাদের অংশ গ্রহণের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম বিশ্বে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং প্রতিষ্ঠানের কোন অভাব নেই। আমাদের বিশ্লেষণে যে জিনিষটির প্রয়োজন, সেটি হল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি এমন হওয়া চাই যা সম্পদের সংগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠান সমূহের ধারণাগুলোর এবং লক্ষ্যাভিসারী কার্যক্রমগুলোর জন্য হবে উপযোগী। মুসলিম জনগোষ্ঠী যদি মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান রাজনৈতিক অবকাঠামোগুলোকে পুনর্বিন্যাসের জন্য এ ইতিবাচক চেতনা নিয়ে এবং যত বেশী সম্ভব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয় এবং সামাজিক যোগাযোগের এবং সংগঠনের সমস্যাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রসর হয় তাহলো মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হতে পারে।[৬১]

রাজনীতির মৌল তাৎপর্য এবং ক্ষমতার চালিকাশক্তিগুলো সম্পর্কে ইসলামী পন্ডিত, গবেষক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের নতুন ধারণা ও আরও কার্যকর উপলব্ধি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উত্তর আমেরিকা, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন (সাবেক) এবং বিকাশমান ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের আধুনিক ফেডারেল এবং বহুজাতিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গভীরভাবে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন।[৬২]

---

[৬০] দ্রঃ 'Abd al Qadir al Jammal, Min Mushklat al Sharq al Awsat (Cairo; Maktabat al Anjlu al Misryah, 1955), পৃ: ৩২০-৪৭৭; Norman D. Palmer and Howard C. perkins, International Relations: The World Community inTransititon (Boston: HJoughton Miflin, 1969), পৃ: ৫৮০-৫৮৩; and Robert W. Macdonald, The League of Arab States : A Study in the Dynamism of Reginal Organization (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965), পৃ: ২৪১.

[৬১] উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্তগুলো দেখুন : Daniel Katz, "Nationalism and Strategies of International Conflict Resolution, "in International Behawior : A Social Psychological Analysis, ed. Herbert C. Kelman (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1965), পৃ: ৩৫৪-৩৯১; John H. Herz, "The Territorial State Revisited : Reflections on the Future of the Nation-State, in International Politics and Foreign Policy: A Reader in Researchand Theory, ed. James N. rosenau (New york : Free press, 1969), পৃ: ৭৬-৯০; and Karl W. Deutsch, Nationalism andSocial Communication: An Inquiry into the Foundation of Nationalsim, ২য় সং (Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, 1966).

[৬২] Karl W. Deutsch and others, Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Expertience 9Princention, NJ: Princeton University Press, 1968).

www.pathagar.com

সমকালীন ফেডারেল রাষ্ট্র সমূহের মধ্য হতে যে ব্যাপক ভিত্তিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব তার আলোকে বিভিন্ন পন্থায় বহুজাতিক রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনা লাভ করা যাবে। বিভিন্ন প্রকার উদ্যোগে যে দূর দৃষ্টির প্রয়োজন তাও এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা যায় এবং ইসলামের আলোকে সমস্যা সমাধানের জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিও এভাবে প্রশস্ত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে কাঠামো এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান তাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যাবলী এবং স্থানীয় বিষয়গুলোর সমধানের দায়িত্ব স্থানীয় শহর এবং রাজ্য সরকারের উপর ন্যাস্ত। ইউরোপের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং সার্বজনীন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর বাস্তব দিকসমূহের উপর বেশী জোর দেয়া হয়। অপর পক্ষে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল আদর্শিক দিকের উপর।

জিহাদ

সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা এবং বিকাশদাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন এবং সুন্নাহর মাধ্যমে মানব জাতির নিকট যে পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছেন তারই আলোকে আমলকে গঠন করার জন্য মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে যাতে পৃথিবীতে আল্লাহর আমানতদার বা খলিফা হিসাবে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। ব্যক্তিগত, সামষ্টিক আভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক সকল প্রকার প্রচেষ্টা ও কর্মে সকল দিকে একই উদ্দেশ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখার সারার্থই হল ইসলামী অর্থে জিহাদ এবং ইবাদাহ এর মূল কথা (ইবাদাহ হল সঠিক পথে আল্লাহর আনুগত্য)। এরূপ কর্ম প্রচেষ্টার জন্য পরকালে রয়েছে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি। তা ছাড়া ইহকালেও এর ফলশ্রুতিতে আসতে পারে ন্যায় সংগত কল্যাণ। সুস্পষ্টরূপে জিহাদের বিস্তৃতি হতে হবে মানব জীবনের সকল স্তরে। কারণ পৃথিবীতে সম্ভাব্য সকল প্রকার কল্যাণ সাধন করা এবং অনিষ্টকে প্রতিরোধ করা মানুষের দায়িত্বের অন্তর্গত। যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করাও জিহাদেরই অন্তর্গত কাজ। কিন্তু কেবল যুদ্ধের সাথে জিহাদকে সমান করে দেয়ার অর্থ হল ক্ল্যাসিক্যাল সময়কালের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কতিপয় গন্ডির মধ্যে জিহাদের ধারণাকে সীমিত করা এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে ভুল ভাবে উপলব্ধি করা।

একটি যুদ্ধ দলে যোগদানের জন্য মহানবী (সঃ) এর নিকট আগত এক ব্যক্তি এবং নবী করিম (সঃ) এর মধ্যে কথোপকথন সম্পর্কীত একটি হাদিস বোখারী এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

হুজুরপাক (সঃ) লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর পিতামাতা জীবিত আছেন কিনা। লোকটি বললেন, হাঁ। নবী করিম (সঃ) তখন তাঁকে বললেন, পিতামাতার সেবা যত্ন কর এবং তাঁদের জীবন সামগ্রীর যোগান দানে আত্মনিয়োগ কর (ফা ফিহিমা ফা

www.pathagar.com

জাহিদ)।[৬৩]

নবী করিমের (সঃ) এ বক্তব্য থেকে পরিষ্কার রূপে জানা যায়, প্রত্যেক প্রকারের অর্পিত দায়িত্ব পালন করার জন্য সচেষ্ট থাকা *জিহাদের* অন্তর্গত।[৬৩] ইসলামের জন্য, ইসলামী নীতির জন্য সংগ্রামও করতে হবে এমনভাবে যা হবে ইসলামী কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেবল মাত্র যুদ্ধের অর্থে জিহাদকে ব্যবহার করা সঠিক নয়। জিহাদ হল ইসলামী অঙ্গীকার, দায় দায়িত্ব এবং বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে কর্তব্য সম্পর্কীত জ্ঞানের সক্রিয় অভিব্যক্তি।

আক্রমণমূলক এবং প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ ব্যতীত জিহাদকে আর অধিক কোন অর্থে ব্যবহার না করার অর্থ হল জিহাদের মধ্যে যে দর্শন রয়েছে সেটাকে এবং এর সঠিক তাৎপর্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হওয়া। এটা মনে করাও সমানভাবে ভ্রান্তিতে নিমর্জিত হওয়ারই শামিল যে, প্রাক আধুনিক যুগে মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের জন্য পবিত্র যুদ্ধ হিসাবে জিহাদই ছিল একমাত্র ভিত্তি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছে যে, ক্ল্যাসিক্যাল জুরীবৃন্দের নিকট জিহাদের অর্থ ছিল একাধিক। আধুনিক যুগের মুসলমান লেখকবৃন্দ মুসলিম ইতিহাসে জিহাদের সকল কার্যক্রমকে বহিঃসম্পর্ক বিষয়ক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষ করে প্রাথমিক যুগে এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এটাকে তাঁরা একটি আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধ হিসাবে তুলে ধরেছেন। অপরপক্ষে অনেক অমুসলিম লেখক জিহাদকে ব্যাখ্যা করেছেন অমুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণমূলক যুদ্ধ হিসাবে। তারা এও বলেছেন যে এরূপ যুদ্ধের শুরু করা হয়েছে সম্পূর্ণরূপে আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের জন্য মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য এমন কোন ঐতিহাসিক কার্যক্রম পাওয়া যায় না যার উপর তত্ত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি কোন চূড়ান্ত রায় দিয়েছে। যাহোক এখানে এটি আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমাদের এটা উপলব্ধি করাই যথেষ্ট যে, প্রত্যেক লেখক যে সব সংজ্ঞা এবং ধারণা গ্রহণ করেছেন তার উপরই অনেক কিছু নির্ভর করে। আমরা এখানে যে কথাটি বলতে চাই তা হল এই যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যে প্রচেষ্টা এবং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে পবিত্র কুরআন জিহাদের তাৎপর্যকে আরও অধিক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে উপস্থাপন করেছে।[৬৪] কিন্তু এটা অবশ্যই যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতর বিষয়ে স্মরণ রাখতে হবে যে, জিহাদ শব্দটির ব্যবহারের বিশ্লেষণকে ইসলামী কাঠামোর আদর্শিক দিকের মধ্যেই সীমিত রাখা ঠিক নয়। যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের গৃহীত বাস্তব কর্মধারা- সেটাকে জিহাদ বলা হোক বা নাহোক- নির্ভর করে এর আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং সে রাষ্ট্রের ইসলামী মৌলিক আদর্শের প্রতি তার নেতৃবৃন্দের অঙ্গীকারের উপর। এরূপ পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া

[৬৩] দ্রঃ al Khatib al Tabrizri, Mishkah, ed. al Albani, খ. ৩. পৃ: ৩৫৪.

[৬৪] দ্রঃ the Qurian, ২২:৭৭-৭৮, ৪৯:১৪, ২৯:৬৯, ২৫:৫১, ১৬:১১০, ৩:১৫৭, এবং ২:১৯০-১৯৫.

www.pathagar.com

নেতৃবর্গের ইসলামী আদর্শের প্রতি প্রকৃত অঙ্গীকারের অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে কতিপয় খুবই অপবিত্র যুদ্ধের ঘোষণার সৃষ্টি করেছে। এ সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে যে জিহাদের দাবীর অসারতা বিদ্যমান তা উপলব্ধি করা কোন সনাতনপন্থীর পক্ষেও মোটেই কঠিন নয়। যদিও জিহাদে ইসলামের একটি মৌলিক নীতি হিসাবে সশস্ত্র সংগ্রামের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া হয়নি তবুও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের ছাত্রদের কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে জিহাদের বহুমুখী অর্থ এবং প্রয়োগের ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে। এরূপ হলেই কেবল একটি মুসলিম বৈদেশিক নীতির যেকোন বিশেষ উদ্দেশ্য, ফলাফল এবং গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব।

শ্রদ্ধাবোধ এবং অঙ্গীকার পূরণ

এ নীতিটি হল তাওহীদের নীতিরই একটি স্বাভাবিক বিস্তৃতি। মানুষ দায়িত্বশীল। মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নেই। এজন্য ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামষ্টিকভাবে মুসলমানদের মধ্যে নৈতিক দিক দিয়ে এটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, তারা ব্যক্তিগত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁদের অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে সচেষ্ট হবে। ইসলামে এ নীতির প্রকৃত প্রতিষ্ঠান এ আদর্শের অন্যান্য মৌলিক নীতি এবং মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ বিষয়ে কুরআনের অসংখ্য আয়াত রয়েছে। আয়াতগুলোতে মুসলিমদেরকে অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় এ বিষয়ে ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক এবং এ ব্যাপারে দ্বিমুখী ভূমিকা গ্রহণের কোন অবকাশ নেই।[৬৫] কোন মুসলিম সিদ্ধান্ত প্রণেতা বা রাষ্ট্রনায়কের এ নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনার ইসলামী কাঠামোতে অথবা এর নীতি বা মূল্যবোধের আওতায় ইচ্ছাকৃতভাবে বা সরাসরি আচরণের মাধ্যমে অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

এখানে আল সারাখসীর অবস্থানের কথা পুনরায় উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে কোন বড় শত্রুর বিরুদ্ধে সফলতার সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ ও শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সময় ক্ষেপনের জন্য মুসলমান সে শত্রুর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেন এবং শক্তি সঞ্চয়ের পর তা ভঙ্গ করারও অনুমোদন আছে। এরূপ অবস্থান গ্রহণের পটভূমি হল এই যে, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এ যুদ্ধকে পিছিয়ে দেয়ার কৌশলকে তুলনা করা যায় একজন ঋণ গ্রহীতাকে তার ঋণ পরিশোধের জন্য অধিক সময়দানের কৌশলের সাথে।[৬৬]

মুসলিম আইন বিজ্ঞানে এই অবস্থানটি হল একটি ব্যতিক্রম এবং আমার মতে

---

[৬৫] উপরে পাদটীকা ২৪ দেখুন।

[৬৬] দ্রঃ al Shaybani, al Siyar al Kabir, খ. ১. পৃ: ১৯০-১৯১.

www.pathagar.com

এরূপ সাযুজ্যের উদাহরণ প্রদান হল একধরনের ভ্রান্তি। কারণ এ অবস্থানটি হল এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআনের প্রতিটি আয়াতের মূল বক্তব্য এবং চেতনার সুস্পষ্ট লংঘন। বনু কোরাইজা সম্পর্কীত সুস্পষ্ট ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআনের কতিপয় আয়াত আছে। এর সাথে কুরআনের আয়াত (৮ঃ৫৮) সংশ্লিষ্ট। এ আয়াতগুলো আলোচ্য বিষয়ে স্থবির আইনী ব্যাখ্যাকে একটি চুক্তি হতে নিজের অবস্থানকে একতরফাভাবে সরিয়ে নেয়ার অথবা চুক্তিকে বাতিল করার ধারণার ব্যাখ্যার বা বাস্তবায়নের জন্য মানদন্ড হিসাবে সমর্থন করেনা।[৬৭]

পারমানবিক অস্ত্র এবং ব্যাপক ধ্বংস যজ্ঞের যুগে, "বিশ্বাসঘাতকতার ভীতি বলতে কুরআনে কি বুঝানো হয়েছে অথবা রাজনীতির ভাষায় যেটিকে আক্রমণ বলে অভিহিত করা হয়েছে সেটাই বা কি? এরূপ পরিস্থিতিতে কিরূপ দায়িত্বশীল প্রক্রিয়ায় একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে প্রতিক্রিয়া করতে হবে ? এসব বিষয় সম্পর্কেই প্রচলিত পদ্ধতি এবং বিরাজমান অবস্থার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কুরআনের কতিপয় আয়াতে (বিশেষ করে ৮ঃ৫৬-৫৮) এ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। ধারণা প্রদান করা হয়েছে কি করে বাস্তবধর্মী এবং নমনীয় প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে হবে এরূপ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে। সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারীগণ এরূপ পরিস্থিতিতে কিভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয়টিকে মূল্যায়ন করবেন? কি ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করবেন ? আইনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, মুসলিম রাষ্ট্র কিভাবে তার সমাধান খুজে বের করবেন ? এ পরিস্থিতি খুবই জটিল এবং প্রতিনিয়তই তা পরিবর্তিত হচ্ছে।[৬৮] বিদ্যমান অবস্থায় কোন যান্ত্রিক বা আইনী সিদ্ধান্ত প্রয়োগযোগ্য হতে পারে না। সিদ্ধান্ত প্রণেতাগণের এরূপ পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত প্রণয়নের স্বাধীনতা থাকতে হবে।[৬৯] সাবেক উপনিবেশগুলো তাদের প্রভুদের ব্যাপারে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। দুর্বল পক্ষ

---

[৬৭] Ibn Kathir, Tafsir al Quran, খ. ২. পৃ: ৩২০; al Tabari, Jamt al Bayan, খ. ১০. পৃ: ২৬-২৭ এবং দেখুন পাদটীকা ২৪ উপরের

[68] দ্রঃ A. A. Fatouros, "Participation of the 'New' States in the International Legal Order of the Future," in The Future of the International Legal Order, ed. Richard A. Falk and Cyrile E. Black (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969), খ. ১. পৃ: ৩৫০-৩৭১; Adda B. Bozeman, The Future of Law in a Multicultural world (Prainceton, NJ: Princeton University Press, 1971), পৃ: ১৬১-১৮৬; B. S. Murty, "Foundation of Universal International Law," in Asian States and the Development of Universal International Law, ed. R. P. Anand (Delhi: Vicas Publications, 1972), পৃ: ১৭৩-১৭৮; Josef L. Kunz, The changing Law of Nations : Essays on International Law (Columbus: Ohio State University Press, 1968), পৃ: ৩-৫৬; and M. H. Ghanim, উ: গ্র: পৃ: ৩-১৬.

[৬৯] দ্রঃ Inis L Claude, Jr., Power and International Relations (New York : Random House, 1962), পৃ: ১৯৭-২০৪.

www.pathagar.com

হিসাবে তাদের চুক্তি করতে হয়েছে শক্তিশালী পক্ষ প্রভুদের সাথে। এসব চুক্তি অনেক সময় জবরদস্তিমূলকভাবে করা হয়েছে। জবরদস্তি কি পরিমাণ হবে তার উপর নির্ভরশীল ছিল একতরফাভাবে চুক্তি ভঙ্গের যৌক্তিকতা? বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দুর্বল পক্ষের আকাংঙ্ক্ষা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? এখানে এটা উল্লেখ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জন্য প্রয়োজন অঙ্গীকারসমূহ সম্পর্কে সতর্ক পরিকল্পনা গ্রহণ। মারাত্মক রাজনৈতিক ভুলের কারণে অঙ্গীকার ভঙ্গের ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এতে রাষ্ট্রের বিশ্বাস যোগ্যতা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং বিশ্ব শান্তি ও হতে পারে হুমকীর সম্মুখীন। নীতিপ্রণয়নকারীদের এ ধরনের ভুল এড়িয়ে যাওয়ার জন্য হতে হবে সচেষ্ট।

ইসলামী কাঠামোর মধ্যে চুক্তির ক্ষেত্রে ভঙ্গকারী বা কোন পক্ষের অন্যায্য লাভের কোন অনুমোদন নেই। পূর্ণ দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাগুলো সংজ্ঞায়িত এবং গৃহীত হয়। ইসলামী কাঠামো এবং উপরোক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে কোনই সন্দেহ নেই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলামী মন মানসিকতার বৈশিষ্ট্য অনুসারে দায়িত্বশীল অঙ্গীকারকে সুশৃংখল পারস্পরিক যোগাযোগের একটি মৌলিক উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। কুরআন সুস্পষ্টভাবে এটা দেখতে চায় যে, মুসলিম জাতি তাদের আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবেকের আয়নায় এ বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক পদ্ধতির সদস্যবর্গকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে যেন তাঁরা চুক্তির আইনগত দিকগুলোকে মাত্রাতিরিক্তভাবে সম্প্রসারিত না করেন। তাদের এটা উপলব্ধি করা উচিৎ যে, দ্বি-পাক্ষিক এবং বহু পাক্ষিক চুক্তির উপাদানগুলো- যেমন সদিচ্ছা, বন্ধুত্ব এবং মৌলিক পারস্পরিক স্বার্থ যেন চুক্তির প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয়। এগুলো চুক্তির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য একান্তই জরুরী। অসৎ উদ্দেশ্য, প্রতারণা এবং স্বার্থের মারাত্মক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পরিণতি লাভ করে শত্রুতা, চুক্তি ভঙ্গ অথবা সশস্ত্র সংঘর্ষের মাধ্যমে। যুদ্ধ একবার শুরু হয়ে গেলে অনেক চুক্তি এবং অঙ্গীকার প্রত্যাখ্যাত হয়। এর পর যুদ্ধের সফলতার জন্য, যেমন নবী (সঃ) বলেন, নির্ভর করতে হয় কলাকৌশলের নিপুণ প্রয়োগের উপর (আল হারব খিদ্'আহ)।[৭০]

মৌলিক মূল্যবোধসমূহ

ইসলামী গ্রন্থাবলী, অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, এমন কিছু মৌলিক মূল্যবোধ আছে যা মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গিকে রঞ্জিত করে এবং কার্যক্ষেত্রে প্রভাবিত করে মুসলিম বিবেক এবং কর্মধারাকে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলো

[৭০] দ্রঃ al Khatib al Tabrizi, Mishkat, ed. al Albani, খ. ২. পৃ: ৩৮৪.

www.pathagar.com

সম্পর্কে ভ্রান্ত উপলব্ধি এবং সনাতনপন্থীদের-যাঁরা বহিঃসম্পর্কসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের কাজের স্বরূপকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন- অনমনীয় আইনী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য মৌলিক মূল্যবোধগুলো কার্যক্ষেত্রে যেরূপ ভূমিকা রাখার কথা সেরূপ ভূমিকা রাখতে পারেনি।

মহানবী (সঃ) এবং আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) এর শাসনামলে মুসলিম নেতৃত্বের মধ্যে যে দক্ষতা এবং গতিশীলতা বিরাজমান ছিল তা পুনরুদ্ধার করতে হলে মৌলিক মূলবোধগুলোকে স্থান কালের উপাদান হতে মুক্ত করে সকল কর্মধারা ও চিন্তা চেতনার কেন্দ্র বিন্দুতে আনয়ন করতে হবে। এসব মূল্যবোধ মূলত সংশোধন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে উন্নীত করে। কোন একটি বিশেষ কর্মের গতির সীমা- চৌহদ্দি কি হওয়া উচিৎ, তা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে এ মূল্যবোধগুলো নীতিপ্রণেতাদের সাহায্য করে। উপায় উপাদানের বেড়াজালে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে পারে না। আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃবিষয়ক ক্ষেত্রে নবী কমির (সঃ) এ মূল্যবোধগুলোর যে উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলো হলঃ আক্রমণ না করা (উদওয়ান), জুলুম না করা *(তুগয়ান)*, দুর্নীতি না করা *(ফাসাদ)*, সীমালংঘন না করা *(ইসরাফ)*।

এ মূল্যবোধগুলোর উপর ইসলাম কতবেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে তা উপলব্ধি করার জন্য কোরআন মজিদ এর কতিপয় আয়াত এবং কয়েকটি হাদিসই যথেষ্ট। আল্লাহ পাক বলেন,

এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করিও না; যাহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না (২৬ ঃ ১৫১-১৫২)।

এবং অনুসরণ করিও না তাহার- যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়, যে কল্যাণের কার্যে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ (৬৮ ঃ ১০-১২)।

তিনি যালিমদিগকে পছন্দ করেন না। দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর উহাতে বিপর্যয় ঘটাইও না ....। (৭ ঃ ৫৫-৫৬)

তোমরা উভয়ে ফিরআওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে। তোমরা তাহার সহিত নম্র কথা বলিবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে, তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি সে আমাদের উপর বাড়া বাড়ি করিবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করিবে (২০ ঃ ৪৩-৪৫)।

কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে যাহারা মানুষের উপর

www.pathagar.com

অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়, উহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি। অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয়, উহা তো হইবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ (৪২ ঃ ৪২-৪৩)।

কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করিবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর (৫ঃ২)।

মহানবী সেঃ) বলেন, "যারা অন্যের প্রতি দয়াদ্র তাঁদের প্রতি আল্লাহ দয়া দেখান। পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া দেখালে তোমার প্রতি দয়া দেখাবেন তিনি, যিনি বেহেস্তে আছেন।[৭১] *এবং আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া দেখাবেন না যে অন্যের প্রতি দয়া দেখায় না।*[৭২]

আধুনিক বিশ্বে বহিঃসম্পর্ক বিষয়ে মুসলমানদের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির কাঠামো

আমরা ইতোমধ্যে কিছু মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করেছি এবং নবী করিম (সঃ) অনুসৃত কিছু বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি এ দৃষ্টি ভঙ্গিগুলো হলো বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, যুদ্ধ এবং সংঘাতের সংমিশ্রণ। এ দৃষ্টি ভঙ্গিগুলোর প্রতিফলন ঘটেছে নীতিসমূহের এবং তাদের বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে। মুসলমানরা ব্যস্ত ছিলেন পারস্পরিক সহযোগিতা সাহায্যের ক্ষেত্রে। তাঁদের ব্যস্ততা ছিল অর্থনৈতিক চাপ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, গেরিলা কৌশল এবং নিয়মিত যুদ্ধের বিষয়ে। এ নীতিগুলোর মধ্য দিয়ে পরিস্কার রূপে আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃবিষয়ে যে সব উপাদান কার্যকর ছিল সেগুলোর প্রেক্ষিতে নবী করিম (সঃ) যে সব মৌলিক ইসলামী নীতি এবং মূল্যবোধের প্রবর্তন করেছিলেন, সেগুলোর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। চলমান পরিস্থিতিতে মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং তাঁদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করাই ছিল এ বৈদেশিক নীতিগুলোর চূড়ান্ত লক্ষ্য। সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারীদের জন্য সম্ভাব্য বিকল্পের আওতায় বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নীতিগুলো হলো কার্যভিত্তিক। আমরা দেখেছি, প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের নীতিমালা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সমূহের মধ্যদিয়ে

---

[৭১] al Khatib al 'Tabrizi, Mishkat, trans, J. Robson, খ. ৩. পৃ: ১০৩৪.

[৭২] প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ: ১০৩১; আরবী দ্রঃ সং al Albani, খ. ৩. পৃ: ৬০৫.

www.pathagar.com

স্থান কালের দিকটির প্রতিফলন ঘটা ছিল অনিবার্য। সমকালীন মুসলিম চিন্তাবিদদের নীতিনির্ধারণ বিষয়ে পরিবর্তন এবং নতুন আবিষ্কারের প্রতি হতে হবে খোলামেলা।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জাতি সমূহের মধ্যে নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি-সে সময় সে দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজমান থাকলেও- তেমন কোন গুরুত্বের অধিকারী ছিল না কারণ সে সময় বৃহৎ শক্তিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিদ্বেষপূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাজনৈতিক পদ্ধতিতে নিরপেক্ষতা ছিল একটি প্রধান উপাদান। এর কারণ ছিল যোগাযোগের নতুন এবং যুদ্ধের সুদূর প্রসারী উপায় উপাদানের প্রাধান্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হতে যোগাযোগ এবং যুদ্ধের প্রযুক্তিতে প্রভূত পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন এসেছে চলমান রাজনৈতিক জোটবদ্ধতার ক্ষেত্রে। এসব বিষয় এখন এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার অনুশীলন করা খুবই দুঃসাধ্য। নতুন ভাবে সৃষ্ট পরিবেশ এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে অনেক বৈষম্য। প্রধান বৈষম্যগুলো গঠনমূলক নীতির অভাবে বিপর্যয়কারী ফলাফল সৃষ্টি করার হুমকি সৃষ্টি করেছে। মৌলিক নীতি এবং মূল্যবোধগুলোর ভূমিকা সম্পর্কীত ভ্রান্ত ধারণা এবং সেগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ক্ষেত্রে দৈন্যতা মারাত্মকভাবে একটা জনগোষ্ঠীর জাতীয় বিবেক এবং বৈদেশিক নীতির সমর্থনে তাঁদের ঐক্য প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। আমরা আলোচনাক্রমে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, মুসলিম চিন্তাধারার মধ্যে এসব বৈষম্য বিদ্যমান আছে এবং এজন্য প্রয়োজন অবিলম্বে আত্মসমালোচনার। ইসলামী কাঠামো এবং এর অন্তর্নিহিত নীতি কৌশলগুলোর স্বরূপ সম্পর্কে একটি উন্নতমানের উপলব্ধি অর্জন করার জন্য ঐ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

চিত্র ১-৩ দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এবং সেগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালার সম্ভাবনাময় গতিশীল প্রকৃতিকে বুঝানো হচ্ছে।

চিত্র-১ এর মাধ্যমে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত *সিয়ার* এবং *জিহাদের* ক্লাসিক্যাল আইন বিজ্ঞানের শিরোনামে সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সনাতন জ্ঞানকে বুঝানো হচ্ছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আর ক্লাসিক্যাল কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

কারণ আমরা দেখছি যে বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিতে এ সনাতন দৃষ্টিভিঙ্গ স্থবির এবং ভাসাভাসা রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য। মুসলিম নীতি নিধারকগণ তা হতে কোন রূপ সাহায্য পান না।

চিত্র-২ আধুনিকপন্থীদের উদাহরণ পেশ করছে। বিদেশী শক্তি এবং বিদেশী পরিবেশের প্রভাব প্রতিফলিত হয় আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর তাঁদের নীতিমালা এবং

www.pathagar.com

অবস্থানে। জনগণ এবং তাদের মধ্যে যে সুপ্ত ক্ষমতা বিদ্যমান আছে তাকে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাজে লাগানোর জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন সেটির তীব্র অভাব রয়েছে আধুনিকপন্থীদের নীতিমালা এবং অবস্থানে। দ্বিতীয় অধ্যায়েও মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যে অবস্থা বিরাজমান আছে তাতে যে আধুনিকপন্থীদের অবস্থান প্রতিফলিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অবস্থানের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে অপরিপক্ক এবং স্থবির মুসলিম চিন্তাধারা। সমকালীন মুসলিম চিন্তাধারায় ব্যাপকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আধুনিকপন্থীদের ভূমিকার প্রভাব বলয়ের মাধ্যমে। আধুনিকপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি হল অনুকরণ করা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে জুড়ে কাহিনী তৈরী করা। আদর্শ এবং পরিবেশের মধ্যে ইতিবাচক যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে মুসলিম ক্ষমতা এবং অংশ গ্রহণের সম্ভাব্য বিকাশই এ উদ্যোগের কোন অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য নয়। আধুনিকপন্থীগণ বিশ্বাস করেন যে, মুসলিম বৈদেশিক নীতিতে দৈন্যতা বিদ্যমান। সেটা এই জন্য নয় যে তাঁদের কোন ইসলামী প্রেরণাও লক্ষ্য নেই। বরং এর কারণ হল মুসলিম নীতি নির্ধারকগণ তাঁদের নীতিমালার সমর্থনে এবং মুসলিম জনগণের জীবন মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

www.pathagar.com

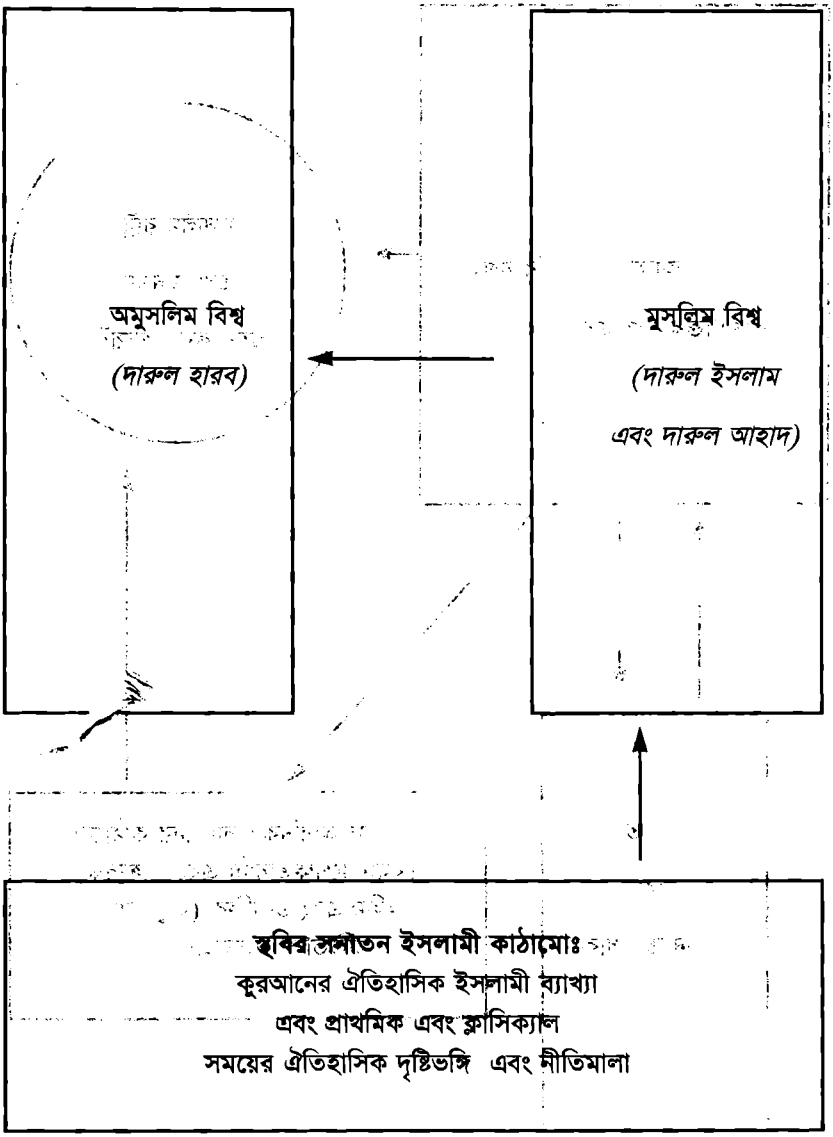

চিত্র-১ সনাতন কাঠামো

www.pathagar.com

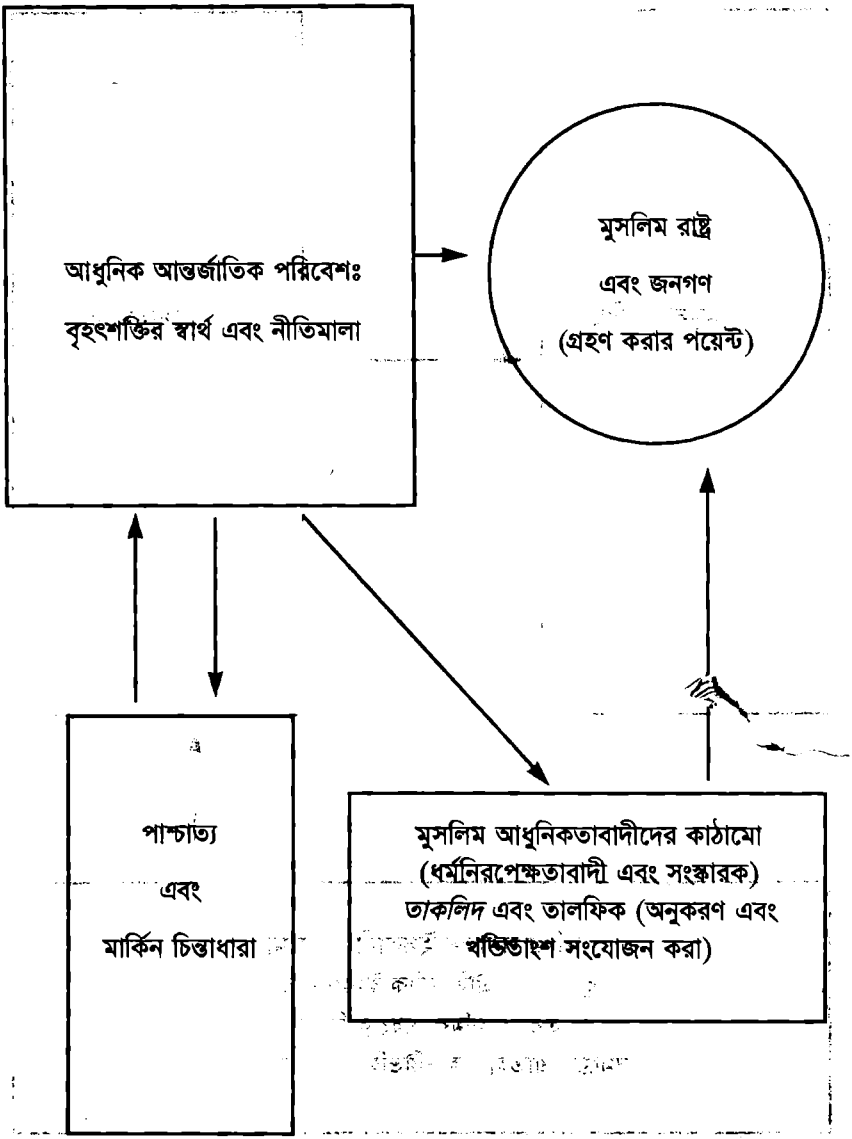

চিত্র -২ আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কাঠামো

www.pathagar.com

চিত্র ৩ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম কাঠামো কি হবে সে সম্পর্কে একটি প্রস্তাব রাখছে। এ কাঠামোতে ইসলাম জনগণের একটি আদর্শের ভূমিকা পালন করছে। নীতি নির্ধারকদের নিকট ইসলাম উপস্থাপিত হয়েছে একগুচ্ছ নীতিমালা এবং মূল্যবোধ হিসাবে। উপস্থাপিত হয়েছে একটি কাঠামো অথবা একরাশ দিকনির্দেশনা হিসাবে। এসব নীতি আদর্শ ও মূল্যবোধ সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক দুর্বলতামুক্ত। এ প্রসংগে স্থান কাল জনিত দুর্বলতার উপাদানাটিকে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত কাঠামোর মধ্যে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির অপরাপর মৌলিক ত্রুটিগুলোকেও অপসারণের ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যবস্থা রয়েছে সুশৃংখলভাবে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্লেষণের দৈন্যতার অভাব দূর করার। কারণ প্রস্তাবিত কাঠামো আদর্শ এবং পরিবেশের মধ্যে গতিশীল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিষয়কে বিবেচনা করে।

প্রস্তাবিত কাঠামো আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান ব্যর্থতাগুলোকেও অপসারণ করছে। উদাহরণ স্বরূপ মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং তাঁদের সম্ভাবনা সমূহকে কাজে লাগানোর অপারগতার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ইসলামী আদর্শের কার্যকর ব্যবহার এবং গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রস্তাবিত কাঠামো বিবেচনায় নিয়ে এ অপসারণ কে কার্যকর করেছে। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, প্রস্তাবিত কাঠামোর উদ্দেশ্য হল মুসলিম মনোবল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাকে বন্ধ্যাত্বের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা। বলা বাহুল্য যে, এ স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছিল ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা সমূহের অপব্যবহারের ফলশ্রুতিতে। প্রস্তাবিত কাঠামো নীতি নির্ধারকগণকে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা প্রদান করে এবং বিদেশী নীতির ক্ষেত্রে যৌক্তিক ইসলামী পদ্ধতি অবলম্বনের পথ অনুসরণের জন্য উধুদ্ধ করে।

চিত্রে উল্লেখিত নীতিমালা এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো সুস্পষ্ট রূপে নৈতিক। কিন্তু এগুলো কোন অপরিবর্তনীয় ফরমুলার অবতারণা করছে না যেগুলো নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে।

www.pathagar.com

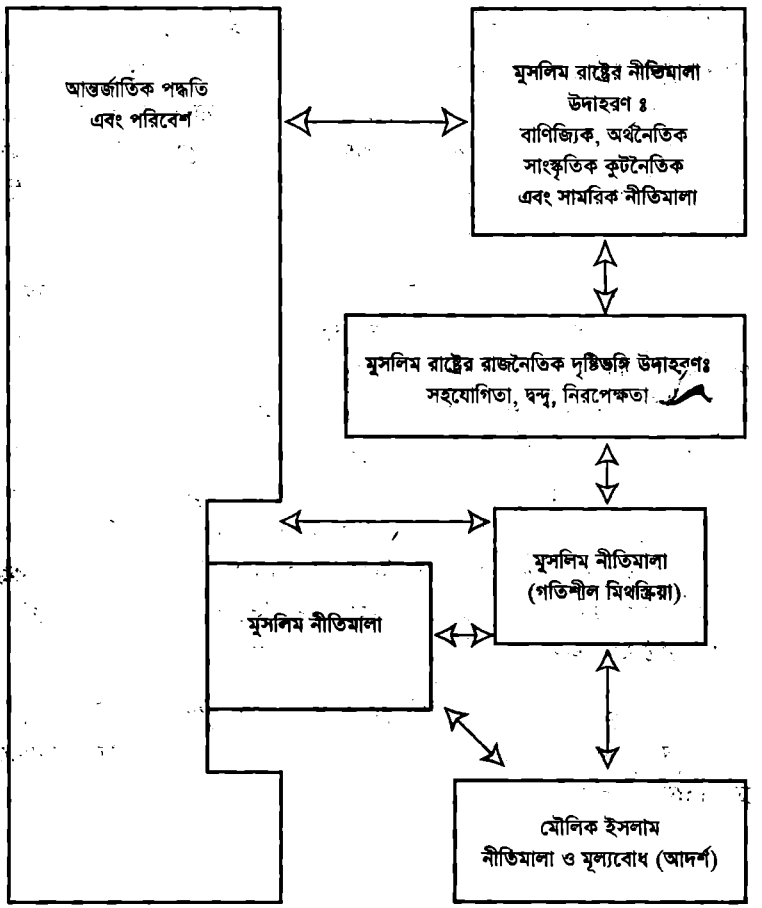

চিত্র-৩ আধুনিক গতিশীল ইসলামী কাঠামো।

www.pathagar.com

মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের যে বিষয়টি প্রয়োজন সেটি হল ইসলামী সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে কাজ করা এবং বাস্তবায়ন করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের একটি পরিস্থিতির জন্য যে নীতি গ্রহণ করতে হবে সেটি গ্রহণ করতে হবে পাঁচটি শর্তের আলোকে। শর্তগুলো হলঃ (১) ইসলামের মৌলিক নীতি ও মূল্যবোধ (২) ইসলামী লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট হুমকি এবং সুবিধাসমূহ (৩) মুসলিম সমাজের শক্তি সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতা (৪) শত্রু এবং মিত্র পক্ষের সম্পদ (৫) পরিবেশের সীমাবদ্ধতা।

সুতরাং এ গতিশীল কাঠামোর মধ্যে সকল প্রকার রাজনৈতিক কৌশলের ছায়াপাত ঘটানো সম্ভব। এ কাঠামোর আওতায় প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্পদায়ের নীতি থেকে যেমন কৌশলের বিষয় জ্ঞান লাভ করা যায় তেমনি নিজেদের লাভবান করা যায় উপনিবেশবাদী ফরাসী সেনাবাহিনী এবং বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে সাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন আলজেরিয়ায় ব্যবহৃত নীতিমালার মূলগত কাঠামো হতে। মুসলিম রাষ্ট্রে যে সমস্ত নীতিমালার কথা বলা হয় সেগুলোর প্রকৃতি কি হবে সেটা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট বিশেষ পরিস্থিতির উপর। সুতরাং এটা মনে করা সঠিক যে নীতি প্রণয়নকারীদের জন্য অতীত কালের ঐসব কঠোর আইনগত ব্যবস্থা অনুসরণ করার সুযোগ আছে যেগুলো ইসলামে বহিঃসম্পর্ক বিষয়ক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম নীতিমালার মূল্যায়ন

আলোচনার কেন্দ্র এখন ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতে আধুনিক মুসলিম জাতিসমূহের নীতি, আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনার দিকে স্থানান্তরিত হবে। আমাদের উদ্দেশ্য এ আলোচনায় কোন একটি বিশেষ দেশের জন্য এ নীতিমালাগুলোর কোন একটিতে বিশেষ কোন পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ পেশ করা নয়। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হল এ আলোচনার মাধ্যমে এটি সুস্পষ্ট করা যে, কোন মুসলিম দেশের বৈদেশিক নীতিমালার মূল্যায়নে সনাতন আইন ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হলে কিরূপ অপ্রাসংগিতা সৃষ্টি হয় তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সাথে সাথে আমরা এটাও উল্লেখ করতে চাই যে, স্থান কালের বাধ্যবাধকতার উর্দ্ধে উঠে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে সুপারিশকৃত সুশৃংখল গতিশীল ভিত্তির উপর নির্মিত আদর্শিক কাঠামোর অনুসরণে একটি মুসলিম দেশের বৈদেশিক নীতিমালা প্রণীত হলে মুসলিম নীতিনির্ধারকদের জন্য রয়েছে যথেষ্ট সুবিধা।

প্রয়োজন তিনটি প্রধান নীতির বিশ্লেষণ। এ নীতিগুলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জন্য কিরূপ সুফল বয়ে এনেছে তাও আমরা বর্তমানে মূল্যায়ন

www.pathagar.com

করে দেখতে চাই। প্রথম নীতিটি ইতোপূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি হল অমুসলিমদের সাথে বৈদেশিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে যুদ্ধ পরিহারের নীতিগ্রহণ করা। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নীতি হল অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক কূটনৈতিক যোগাযোগ প্রবর্তন এবং মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ও ইতিবাচক নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করা।

প্রথমেই এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় এসব নীতিমালার বিস্তারিত দিক বা কৌশলগত দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে না। বিষয়গুলোর উপর এখানে আমরা গুরুত্বারোপ করতে চাই এবং যেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়োজন রয়েছে তা হল এসব নীতিমালার পশ্চাতে যে সব কারণ বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। তাছাড়া এসব নীতিমালার কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। সেগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও আমাদের উদ্দেশ্য।

এ নীতিগুলোর যৌক্তিকতা এবং উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে অবহিত হতে পারলে ইসলামের সাথে এ নীতিগুলোর যে দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে অনুমান করা হয় আমরা সে সম্পর্কে জানতে পারি।

কূটনীতি এবং মৈত্রীর কৌশলসমূহ

আমরা দেখতে পাই ওসমানীয় শাসকগোষ্ঠীর আমলে ইউরোপে কিছু কম ক্ষমতা সম্পন্ন শত্রু ছিল। তাদের বিরুদ্ধে প্রথমদিকের বিজয়ী ওসমানীয়গণের ইতিহাসে কূটনীতির গুরুত্ব এবং ভূমিকা ছিল খুবই সীমিত।[৭৩] ইউরোপে রেনেসাঁর আবির্ভাব ঘটে। সুদূর প্রাচ্যের ব্যবসা কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছার জন্য চলে এর সফল প্রচেষ্টা। এর প্রেক্ষিতে অবশ্য পারস্পরিক স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহযোগিতার নীতিমালার উদ্ভব ঘটে। তাছাড়া এ সময় শুরু হয় ওসমানীয় শাসকগোষ্ঠী এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগ। ওসমানীয় শাসকগণ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের জন্য সুযোগ সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। ইউরোপীয় দেশগুলো ওসমানীয় সরকারের নিকট কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করে (The Ottoman Sublime Porte)।[৭৪] এ সবই করা হয় চুক্তির আওতায় যে চুক্তিগুলোকে আত্ম সমর্পনের চুক্তি হিসাবে অভিহিত করা হয়।

ওসমানীয় সাম্রাজ্য এবং ইউরোপের মধ্যে বৈষম্য বাড়তে থাকে। ইউরোপ শক্তি সামর্থ এবং প্রযুক্তির দিক থেকে ক্রমেই উন্নতির দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখে। অপরদিকে

---

[৭৩] দ্রঃ T. Naff, Reform and Diplomacy, পৃ: ২৯৫.

[৭৪] দ্রঃ R. H. Davison, Turkey, পৃ: ৪৬-৪৭.

www.pathagar.com

অবক্ষয় চলতে থাকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের। দুর্নীতি, স্থবিরতা এ সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সকল দিক থেকেই অবক্ষয়ের ব্যাধিতে ওসমানীয়রা হয়ে পড়ে আক্রান্ত। ইউরোপ এবং তাদের মধ্যকার এ বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে ওসমানীয়রা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে কূটনীতির উপর। কারণ তাঁরা সামরিক দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় শত্রুদের মোকাবিলায় ছিল। এজন্য কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যটিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা। কারণ তাঁরা জানতো তাঁদের আক্রমণের ফলে ক্রমান্বয়ে এ সাম্রাজ্যটি প্রতিরক্ষাহীন হয়ে পড়ে ছিল ওসমানিয়রা কূটনৈতিক মিশনের আদান প্রদান করে। এটা করে স্থায়ী ভিত্তিতেই। খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলোর সাথে তারা চুক্তি করে এবং জোট ভিত্তিক সম্পর্কে প্রবেশ করে। অবশ্য এসব জোটের কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠিত হয় কতিপয় ইউরোপীয় রাষ্ট্রের উদ্যোগে। ঐসব রাষ্ট্রের আরও অধিক সুযোগ সুবিধা আদায় করা লক্ষ্য ছিল। তারা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের স্বার্থের খাতিরেই ঐসব জোটের সৃষ্টি করে।[৭৫]

প্রথম মহাযুদ্ধের সাথে কেন্দ্রীয় শক্তিগুলোর পতন ঘটে। ইতিহাসে ওসমানীয় সাম্রাজ্য অধ্যায়ের ও পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশ্য কামাল আতাতুর্কের তুর্কীস্থান ওসমানীয়দের শুরু করা কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের বহিঃসম্পর্ক বিষয়ক বিষয়াদির ব্যবস্থাপণায় ইসলাম আর অনুমোদিত কোন উৎস হিসাবে থাকলো না। ওসমানীয়দের নীতিমালার মূল্যায়নে কতিপয় লেখক চরম সনাতন পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁরা সেগুলোকে একান্তভাবে অনিবার্য করে নেন। তাঁরা ইসলামকে একগুচ্ছ ঐতিহ্য এবং রীতি নীতির সমাহার হিসাবে দেখতে শুরু করেন। এর যে মৌলিক প্রকৃতি, এর যে মূল্যবোধ এবং কাঠামো, সেগুলোর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই আর রইল না তাঁদের।[৭৬] এসব লেখক ওসমানীয়দের নীতিমালাকে মূল্যায়ন করে হানাফী আইন বিজ্ঞানের নিরিখে। এরই ভিত্তিতে তাঁরা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য ওসমানীয় সুলতানদের নিন্দা করে।[৭৭] তাঁরা যে ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে সেগুলো হল এমন যে, ইসলামে দশ বছরের অধিক কালের জন্য কোন চুক্তির অনুমোদন দেয়ার সুযোগ আছে কিনা?

---

৭৫ দ্রঃ Bernard Lewis, The Middle East and the West (New York: Harper & Row, 1966), পৃ: ১১৬-১১৮; R. H. Davison, turkey, পৃ: ৫৩-৯০; T. Naff, The Setting of Ottoman Diplomacy, পৃ: ২২, ২৬; এবং T. Naff, The Reform of Diplomacy, পৃ: ৩১০.

৭৬ দ্রঃ M. Khadduris introduction to al Shaybani, The Islamic Law of Nations, পৃ: ৬২-৬৭; and M. T. al Ghunaymi, the Muslim International Law, পৃ: ১৮-৫৪.

৭৭ দ্রঃ M. Khadduri, উ: গ্র: পৃ: ৬৩-৬৪.

www.pathagar.com

অথবা কোন মুসলিম প্রজাকে অমুসলিমদের আদালতে বিচারের সুমুখীন করার অনুমোদন আছে কিনা। এ দৃষ্টিভঙ্গি তাদের চূড়ান্ত বিবেচনায় পৌছে দেয়। তা তাদেরকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত করে। তারা মনে করতে থাকে, ফিকাহ এর সনাতন মাজহাবগুলো হতে বিচ্যুতি ইসলাম থেকে বিচ্যুতিরই নামান্তর।

ইসলাম ধর্মীয় এবং ধর্মানিরপেক্ষতার দ্বৈতবাদী মতবাদকে গ্রহণ করে না। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং জুরীগণের মধ্যকার মতামতের ভিন্নতার অর্থ এই নয় যে, জুরীগণ ইসলামী, এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষগুলো ইসলামী নয়। বিষয়টিকে অবশ্যই তার লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে বিবেচনা করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক উপাদানের প্রভাবের মধ্যে থেকে কোন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে কোন্ বিষয় বিবেচনা করতে হয়। পদ্ধতির আদর্শিক দিকের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি এগুলোর কঠোর আইনগত দিক থেকে কম গুরুত্ব দিতে হয়, অপরদিকে জুরীগণের ক্ষেত্রেও এটা পরিলক্ষিত হয় যে, যে সমস্ত রাজনৈতিক উপাদান কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় সেগুলো সম্পর্কেও তাঁদের উপলব্ধিতে থাকে ঘাটতি।

ওসমানীয়দের ইসলামী গঠন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে তাদের যে অপবাদ দেয়া হয় সেটা আসলে এক প্রকার মতামত বৈ অন্য কিছু নয়। তাছাড়া ওসমানীয় শাসকবর্গের সমালোচনা মূলত একপ্রকার গোড়ামী। সমালোচকবৃন্দ বিশেষ করে ওলামাগণ ক্ল্যাসিক্যাল অভিজ্ঞতা হতে যে কোন রূপ বিচ্যুতিকে একপ্রকার নব্যতন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করতেন। ওসমানীয় রাষ্ট্র নায়কগণের নিকট ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা এবং কতিপয় বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পরিপূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ওসমানীয় শাসকগণের সমুখে ছিল প্রগতিশীল আধুনিক ইউরোপের গতিশীলতা এবং এর ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষমতা ও দক্ষতার চ্যালেঞ্জ এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমালোচনার কতটুকু যৌক্তিক তা বিবেচিনার দাবী রাখে। তাঁদের বিরুদ্ধে সমালোচনা এই যে, তাঁরা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। এ সমালোচনা বস্তুত তাঁদের নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণের অধিকারকে অস্বীকার করারই নামান্তর। তাঁদের এ বিচার বিশ্লেষণ মূলত প্রয়োজন ছিল এমন সব নীতি আদর্শেকে এড়িয়ে চলার জন্য যা তাদের জন্য ডেকে আনত চরম বিপর্যয়।[৭৮]

১৮৫৬ সালের প্যারিস শান্তি চুক্তিতে যে ইউরোপীয় রাষ্ট্র পদ্ধতি ছিল তাতে আনুষ্ঠানিকভাবে অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ওসমানীয় শাসকবর্গের রাষ্ট্রকে সদস্য

---

[৭৮] এখানে দ্রষ্টব্য যে ওসমানীয় বা তাদের নীতির সমর্থনে মাসালাহার ক্লাসিক্যাল ধারণা মূলত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে জাগ্রত করেছে।

www.pathagar.com

হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল। সুলতানগণ উদ্ভূত নতুন অবস্থা এবং পরিবর্তন সমূহের প্রেক্ষিতে টিকে থাকার কৌশল হিসাবে কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন।[৭৯] তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এটার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল সংস্কারের নতুন কর্মসূচীর জন্য। এ মৌলিক প্রয়োজনগুলোর প্রেক্ষিতে ওসমানী শাসকগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় প্রশ্নকে বড় করে তুলে ধরা হয়। অমুসলিমদের সাথে দশ বছরের বেশী সময়কালের জন্য ঐক্য জোট বা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অনুমতি আছে কিনা-এ সম্পর্কিত তথ্য সমৃদ্ধ আইনী যুক্তির অবতারণা করে প্রসংগটির যাত্রা শুরু হয় এবং এর ঢেউ গিয়ে লাগে অধিকতর মৌলিক বিষয় সম্পর্কীয় প্রশ্নে। আর সেটি হল ইসলামী লক্ষ্য অর্জনের জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ এবং দক্ষতা সম্পর্কীত।[৮০] তাহলে ওসমানীয় শাসকগণ কেন নতুন কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করলেন? কেন তারা খৃষ্টীয় ইউরোপীয় শক্তির সাথে সহ অবস্থান এবং সহযোগিতার বিষয়কে উন্নয়ন করেন? এসব নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্যই বা কি ছিল?

গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর সুস্পষ্ট কারণ ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির অব্যাহত অবক্ষয় এবং অপরপক্ষে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি বৃদ্ধি। তাদের কার্যকর্মের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যটিকে খন্ড-বিখন্ড হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল হিসাবে তারা ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে শক্তির ভারসাম্যের বিষয়টিকে নিপুনভাবে ব্যবহার করেছেন। এ সময়ের মধ্যে যে সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তার উদ্দেশ্যও ছিল সাম্রাজ্যের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ শক্তির সংরক্ষণ করে আরও অধিক সীমানা দখলের অভিযানকে ঠেকিয়ে রাখা।[৮১] আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে চলমান অবস্থার সাথে খাপখাইয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে এবং যথাযথ প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এ নীতিগুলোর সাফল্য বা ব্যর্থতা প্রতিফলিত হয়েছে।

এটা অত্যন্ত পরিস্কার যে, ওসমানীয় সাম্রাজ্যের নীতি নির্ধারকগণ ওসমানীয় সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারেননি। একটি মাত্র

---

[৭৯] দ্রঃ Charles G. Fenwick, International Law, পৃ: ১৮; and Roderic H. Davison, Reform in the Ottoman Empire: 1850-1870 (New Jersey: Princeton University Press, 1963), পৃ: ৪. আরও দ্র: J. C. Hurewitz, Diplomacy inthe Near and Middle East, পৃ: ১৫৩-১৫৬.

[৮০] দ্রঃ B. Lewis, The Middle East, পৃ: ১১৮: এবং M. Khadduri, উ: গ্র: পৃ: ৬৩-৬৪.

[৮১] দ্রঃ R. H. Davison, উ: গ্র: পৃ: ৬৮-৭৭.

www.pathagar.com

পন্থায় তাঁরা কৃতকার্য হয়েছিলেন। সেটি হল বেশ কিছু কৌশলগত এবং শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রবর্তন। এর কতেক ভাসাভাসা ভাবে অথবা ভুলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। তাঁরা ইউরোপের উত্থান এবং উন্নয়নের বিষয়কে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ওসমানীয় সুন্নী চিন্তাধারার আইনবাদ পরিত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন পরিবর্তনের মূল্যবোধের একটি প্রকৃত সুশৃংখল এবং যৌক্তিক প্রয়োগ করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। এক শতাব্দীর (উনবিংশ)ও বেশী সময়কালের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ধর্ম নিরপেক্ষকরণ এবং পাশ্চাত্য করনের বেশী আর কিছু হল না।[৮২] ইসলামী চিন্তাধারা এবং বিবেকবোধ রয়ে গেল স্থবির অথবা হয়ে পড়লো আরও নিরাশক্ত।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ওসমানীয় সাম্রাজ্যের যখন পতন ঘটল এবং সাম্রাজ্যটি যখন খন্ড-বিখন্ড হয়ে গেল তখন ইউরোপে এবং মুসলিম বিশ্বের মধ্যকার দূরত্ব যেকোন সময়ের তুলনায় আরও বেশী হল। ওসমানীয়দের ত্রুটি এই ছিল না যে, তাঁরা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সচেষ্ট ছিলনা এবং অস্তিত্ব রক্ষা ও সংস্কার করণের জন্য সময় নিতে চেয়েছিল। বরং তাঁদের দোষ ছিল এই যে, তাঁরা ইসলামী সংস্কারের গতিপথে অগ্রসর না হয়ে অগ্রসর হয়েছিল ভাসা ভাসা আধুনিক সস্কারের যাত্রাপথে। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ অংশকেই আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীতে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে স্বাধীন সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কতিপয় মুসলিম দেশ পশ্চিমাদের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার পথে অগ্রসর হয় এবং এর কতেক সাম্প্রতিককালে প্রাচ্যের সাথে হয় জোটভুক্ত। বাকীরা অবলম্বন করে ইতিবাচক নিরপেক্ষতা এবং জোট নিরপেক্ষতার পথ।

আমরা এখন এ দুটি প্রধান নীতিমালা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনার অবতারণা করতে চাই। ওসমানীয়গণ যে বিষয়টি অর্জন করার জন্য উদ্যোগী হয়ে তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল সে সব বিষয়গুলো লাভ করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কের সাফল্য এবং ব্যর্থতা কিরূপ তা নিরূপন করার জন্য এ আলোচনার অবতারণা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর এবং ওসমানীর সাম্রাজ্যের যখন পতন ঘটে তখন পশ্চিমা শক্তিবর্গ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সীমারেখাকে বিভক্ত করে ফেলে। এটা করা হয় ম্যানডেটরী সিস্টেমের আওতায়। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে মুসলিম রাষ্ট্র এবং

---

[৮২] দ্রঃ T. Naff, উ: গ্র: পৃ: ৬২-৬৩; Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal : Mc Gill University Press, 1964), পৃ: ২৩-২৮৯; R. H. Davison, উ: গ্র: পৃ: ৬২-৬৩ এবং ৫৩-১৪৩; B. Lewis, The Emergence of Modern Tukey, পৃ: ১২৪-১২৮.

www.pathagar.com

ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে বহু চুক্তি সম্পাদিত হয়। এসব চুক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার অসংখ্য মুখরোচক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এসব চুক্তির মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যকার নীতিমালা এবং চুক্তির কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি। উপরন্তু এগুলো ছিল এমন পরিভাষা যা নির্দেশিত হয়েছে বিজয়ী ইউরোপীয় শক্তি কর্তৃক বিজ্ঞ মুসলিম দেশগুলোর প্রতি। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৩৬ সালের ফ্রান্স সিরিয়া চুক্তি, ফ্রান্স-লেবানন চুক্তি এবং ১৯২২ ও ১৯৩৬ সালের মিসর চুক্তি এবং ১৯২২ ও ১৯৩০ সালের ইরাক-বৃটেন চুক্তির কথা উল্লেখ করা যায়।[৮৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জোটবদ্ধতার নীতি গুরুত্ব লাভ করে। ঐ সময় আর পশ্চিমা ইউরোপীয় শক্তিবর্গ বিশ্বের বৃহৎ শক্তিরূপে পরিগণিত ছিল না। তাছাড়া ঐ সময় তারা মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণের অবস্থানেও ছিল না। ঘটনা ঘটে যখন বিশ্বের সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র এবং অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐ অঞ্চলে তাদের স্বীয় স্বার্থের অন্বেষণে ব্রতী হয়। নতুন বিশ্ব শক্তি এবং সাবেক শক্তিবর্গের প্রতিযোগিতা চলে ঐ অঞ্চলে নিজ নিজ প্রভাব বলয় এবং নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করার। এরই ফলশ্রুতিতে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে বিকল্প নীতি গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।[৮৪]

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো কর্তৃক অনুসৃত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতিমালার তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য আমাদেরকে এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং ভূরাজনৈতিক উপাদানগুলোকে মনের মধ্যে রাখতে হবে। ঐ ঐতিহাসিক এবং ভূ-রাজনেতিক উপাদানগুলোই তাদেরকে সীমান্তবর্তী অঞ্চল (অথবা যাকে বলা হয় তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় সিঁড়ি) এবং আরব বিশ্ব- এ দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করে। প্রত্যেক এলাকায় স্বার্থের পরিপন্থী হুমকী এবং বিপদগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে। অনুরূপ ভাবে এলাকার রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি

---

[৮৩] উদাহরণ স্বরূপ আরও দ্রঃ ১৯২২ এবং ১৯৩০ সালের গ্র্যাট বৃটেন এবং ইরাকের জোট এবং বস্তুত চুক্তিগুলোর আরবী গ্রন্থে al Sayyid 'Abd al Razzaq al Husayni, Tarkh al 'Iraq al Siyasi al Hadith, ২য় সং (Sayda, Lebanorn: Matba at al Irfan, 1958), খ. ২. পৃ: ৩০-৩৮, ৪১-৪২, ৪৫-৮১, ২০৪-২৩৪; Husayn Fawzi al Najjar, al Siyasah wa a Istratyah fi al Sharq al Awsat (Cairo: Maktabat al 'Irfan, 1958), খ. ২. পৃ: ৩০-৩৮, ৪১-৪২, ৪৫-৮১, ২০৪-২৩৪; Husayn Fawzi al Najjar, al Siyasah wa al Istratyiyah fi al Sharq al Awsat (Cairo: Maktabat al Nahdah al Misryah, 1953), পৃ: ৫০১-৫০৪, ৫১০-১২, ৫৮৬-৬১০, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭৬, এবং মিশর এবং Treaty and Great Britain, আরও দেখুন পৃ: ৫৯২-৬০৯ of the গ্রাট বৃটেন এর মধ্যে বন্ধুত্ব ও ঐক্য জোটের জন্য আবদ্ধ দেখুন Nicola A. Ziyadeh, Syral and Lebanon (Beirut: Lebanon Bookshop, 1968), পৃ: ৫৩-৫৫.

[৮৪] দেখুন J. Hurewitz, "Origins of the Rivalry" in Soviet American Rivalry, ed. I, Hurewitz, পৃ: ১-৭.

www.pathagar.com

তাঁদের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও রয়েছে যথেষ্ট পার্থক্য। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সংলগ্ন এলাকা দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো সাবেক কমিউনিষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখোমুখি। অতীতে যখন এ রাষ্ট্রগুলো ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্য এবং ইরানের অংশ বিশেষ তখন তারা সঞ্চয় করে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া সম্পর্কে তিক্ত অভজ্ঞতা। তাদের মধ্যে ছিল দ্বন্দ্ব সংঘাত। এসব রাষ্ট্রের প্রতি রাশিয়া সৃষ্টি করে হুমকি। পশ্চিমা শক্তিবর্গ কৌশলগত এবং ভূরাজনৈতিক কারণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে মসুলিম দেশগুলোর সাথে স্বীয়স্বার্থে সহযোগিতা করার প্রয়োজন অনুভব করে। রাশিয়া দক্ষিণ দিকে উষ্ণ সাগরগুলোর অভিমুখে তার সম্প্রসারণ অভিযানের নীতি গ্রহণ করে। এ সাগরগুলো সীমান্তবর্তী এলাকায় কতকাংশকে অন্তর্ভুক্ত করে আছে। এ অবস্থা এশিয়া এবং আফ্রিকায় পশ্চিমা উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর স্বার্থের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে।

আফগানিস্তান ব্যতীত সীমান্তবর্তী এলাকার রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক তদানিন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্যকে ভয় পাওয়ার কারণ আছে। আফগানিস্তান এর ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ হল এর চতুর্দিক সুউচ্চ পর্বত রাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ পর্বতমালা রাশিয়ার সীমান্তের অনেক খানি জুড়ে আছে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে দেখা যায় পাকিস্তানের সাথে ভারতের শত্রুতা রয়েছে। আবার ভারত রাশিয়ার বন্ধু। এ দুটি কারণে পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র ও পশ্চিমা শক্তিবর্গের সাথে পাকিস্তানের জোট বাধার নীতির যৌক্তিকথা আছে।[৮৫]

উত্তরাঞ্চলীয় টায়ার পলিসি এসব রাষ্ট্রকে সেন্টো (বাগদাদ চুক্তি) সিয়াটো এবং নেটো নামক জোটগুলীতে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। আরব বিশ্ব অবশ্য অন্যরূপ পরিস্থিতিতে ছিল। তাঁদের ঐতিহাসিক এবং কৌশলগত অভিজ্ঞতা ভিন্ন রূপ। আরব বিশ্ব তার কৌশলগত অবস্থান, যোগাযোগ লাইন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী হতে শুরু করে তার পরবর্তী সময়কালে নিজেদের সীমান্তের উপর ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক উপস্থিতি এবং নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ওসমানীয় এবং কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তি বর্গের সাথে আরবদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জোট হয়েছিল। এসব জোট হয়েছিল তাদের স্বাধীনতা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে। এসব জোটের পরিসমাপ্তি ঘটে ম্যানডেটারী প্রশাসনগুলীর তিক্ত অভিজ্ঞতার সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পরে। এ অঞ্চলের প্রভাবশালী পাশ্চাত্য শক্তি ফ্রান্স এবং বৃটেন

---

[৮৫] উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাগদাদ চুক্তিতে, ইরাকের প্রত্যাহারের পর যার নাম হয় সেন্ট্রাল ট্রিটি অরগানাইজেশন (সেন্টো) এবং যুক্তরাষ্ট্র ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে শুধুমাত্র একজন সহযোগী সদস্য। এভাবে, যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিতে ছিল কিন্তু এর অন্তর্গত ছিল না, ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারী ছিল কিন্তু কোনো আইনগত প্রতিশ্রুতি ব্যতিত। দেখুন N.D. Palmer and H.C. Perkins, International relations, পৃ: ৫৮৩-৫৮৪

www.pathagar.com

দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা আর পূর্বের মত ভূমিকা পালনে সক্ষম ছিল না। তেলের ব্যাপারে এ অঞ্চলে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের স্বার্থ চিন্তা ক্রমেই বাড়তে থাকে। তাদের নিবিড় সখ্যতা গড়ে উঠে ইসরাইলী রাষ্ট্রের ইহুদী খৃষ্টান চক্রের সাথে। এ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হয় আরব প্যালেষ্টাইনীদের ধ্বংসস্তূপের উপর। এ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় বৃটিশ ম্যানডেটের ফলশ্রুতিতে। এসব বিষয় পাশ্চাত্য প্রভাব হতে মুক্তি ও স্বাধীনতার আন্দোলনকে শক্তি যোগায়।

নিরপেক্ষতার কৌশল সমূহ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমাদের প্রতি আরবদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিক্রমেই ব্যাপকতর তিক্ততা এবং শত্রুতার পর্যবসিত হয়। ক্রমে দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে স্নায়ু যুদ্ধের নীতি বিকশিত হতে থাকে। উন্নয়নশীল অঞ্চলগুলোর প্রতি কৌশলের দিক হতে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্টালিন পরবর্তী সময়ে পরিবর্তন আসে। মধ্য প্রাচ্যের প্রতিও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। প্রস্তাব করা হয় সামরিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের। কয়েক বছরের জন্য সুযোগ আসে। সুযোগ আসে নতুন ভাবে মতামত প্রদান এবং তা বিকশিত করার। এ বিষয়গুলো রূপ লাভ করে ইতিবাচক নিরপেক্ষতা এবং জোট নিরপেক্ষ পরিভাষায় মধ্যদিয়ে।[৮৬]

পাকিস্তানের ব্যাপারে কেন পশ্চিমাদের সাথে জোটবদ্ধতার ইতি ঘটলো এবং কেন ইরানের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশী রকম এবং তুরস্কের সাথে তুলনা মূলকভাবে কমপরিমাণে কিছু শক্তি হারালো সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক এবং কৌশল গত বিবেচনা থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ অবস্থায় সৃষ্টি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ভারতকে সামরিক সাহায্য প্রদান করে। এ সামরিক সাহায্য পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতি যে অঙ্গীকার করেছিল এ প্রেক্ষিতে তার উপর নির্ভর করা তখন সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে।[৮৭] পাশ্চাত্যের সাথে ইরাকী জোটের (বাগদাদ চুক্তি) *নূরী আল সাইদ নীতির* উপর মিশরের আক্রমণের সাফল্যকে পূর্বে আলোচিত ঐতিহাসিক এবং কৌশলগত উপাদানগুলোর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের সাথে একটি জোটবদ্ধতার নীতি সৃষ্টি হয়।

---

[৮৬] দ্রঃ Alvin Z. Rubinstein (ed.), The Foreign Policy of the Soviet Union, ৩য় সংস্কর (New York: Random House, 1966), পৃ: ৩৭৯-৩৯২, ৩৯৬-৩৯৭.

[৮৭] দ্রঃ G. W. Chaudhuri, Pakistan's Relations with India (Meerut, India: Meenakshi Prakashan, 1971), পৃ: ১-৮: Muhammed Ahsan, Pakistan and the Great Powers (Karachi : Council of Pakistan Studies, 1970), পৃ: ৩২-৬২ : Mohammad Ayub Khan, Pakistan Perspective (Washington, DC : The Pakistani Embassy, n.d.), পৃ: ১৭-৩৪; এবং Murtaza Rizwi, The Frontiers of Pakistan (Karachi : National Publishing House, 1971), পৃ: ৩-১১ এবং ১৪৩-১৬৮.

www.pathagar.com

যেসব এলাকা পশ্চিমা এবং ইহুদী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে চায় স্বাধীনতা ও উন্নয়নের সাথে ঐ নীতি তার পরিপন্থী। প্রতিকূল সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সাথে আরব বিশ্ব বিশেষ করে মিশর ইতিবাচক নিরপেক্ষতার স্লোগান উচ্চারণ করে।[৮৮] এ স্লোগানের ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয় এবং ভুল বুঝা হয়। এটাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে এ স্লোগানের অন্তরালে যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতি কর্যকর রয়েছে তাকে ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। ঐতিহাসিক বিবর্তন নিশ্চিতরূপেই আরবদেরকে পাশ্চাত্যের বিরোধী অবস্থানে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু একই সময় আরদের অবস্থান ও ছিল দুর্বল। পশ্চিমারা অবস্থান করছিল ঐ এলাকায়। সুতরাং আরবজাতির মধ্যে পাশ্চাত্যের ভয় ছিল। তাদেরকে নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে হতে হতো খুবই সতর্ক।[৮৯] সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং পাশ্চাত্যের শত্রুরা এই জন্য স্বাভাবিক ভাবেই ছিল আরবদের জন্য পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে একই জোট বদ্ধ। যদিও আরদের প্রয়োজন ছিল পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সাহায্য, আদর্শিক পার্থক্য এবং ফ্রন্টিয়ার জোনে তাদের স্বধর্মাবলীদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফলে তাদের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয় ছিল। এটা কোনক্রমেই মৌলিক দিক হতে পাশ্চাত্য শক্তি হতে ভিন্নতর ছিলনা। এভাবে আরবজাতি সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিল তাদের আচার আচরণে। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সহযোগিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও প্রদর্শিত হয়েছে সতর্কতা।[৯০] আরব দেশগুলির ভোট দেওয়ার প্যাটার্ন এর মধ্যে কেন ঝোঁক প্রবণতার এ অস্তিত্ব দেখা যায় তার ব্যাখ্যা এতে সুস্পষ্ট, এ প্রসংগে মিশরের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। মিশর এমন একটি জাতি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ইতিবাচক নিরপেক্ষতার নীতির অনুসারী বলে দাবী করে অথচ তারা নিজেদের দেশে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির প্রতি আঘাত হানে।

ইতিবাচক নিরপেক্ষতা সতর্কতার এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রতিযোগী বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি। তথাপি এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সামগ্রিক বৈদেশিক নীতিতে এ রাষ্ট্রগুলোর এ ইতিবাচক নিরপেক্ষতার নীতি প্রতিফলিত হয় না। অন্যান্য আরব এবং মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ রাষ্ট্রগুলো ভিন্নরূপ

---

[৮৮] Fayez A. Sayegh, "Islam and Neutralism," and P.J. Vaikiotis, "Islam and the Foreign Policy of Egypt," in Islam and InternationalRelations, ed. J. H Proctor, পৃ: ৬০-৯৩ এবং ১২০-১৫৭.

[৮৯] সমসাময়িক বৃহৎ পররাষ্ট্রনীতির উপর এই পরিচ্ছেদে আমরা West বা পাশ্চাত্য দ্বারা পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাচ্ছি।

[৯০] দেখুন Bayard Dodge. "The Significance of Religion in Arab Nationalism," in Islam and International Relations, ed. J H. Procter, পৃ: ১১২-১১৩.

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতিমালা অনুসরণ করে। আদর্শিক, জাতীয় এবং ঐতিহাসিক অনেক উপাদান আছে। এ উপাদানগুলো আলোচ্য সমস্যা, এ সমস্যার ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মব্যবস্থা, সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহ এবং পক্ষবৃন্দ কর্তৃক অনুসৃত অন্যান্য কৌশল ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট। এজন্য এ উপাদানগুলোকে বিবেচনায় আনতে হয়। বিবেচনায় আনতে হয় এই জন্য যে, মুসলিম দেশসমূহে কিকারণে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিবর্তনীয় নীতি মালা অনুসৃত হয়েছে তা বুঝার জন্য।

দুই পরাশক্তির মধ্যে বিরাজমান নীতিমালা এবং কৌশলের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধ এবং মুখোমুখি সংঘর্ষের যুগ হতে শুরু করে উত্তেজনা প্রশমনের সময়কাল পর্যন্ত উভয়ের অনুসৃত কৌশল এবং নীতিমালায় পরিবর্তন এসেছে। পশ্চিমা শক্তিবর্গ ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ আফ্রিকা অঞ্চল এবং রাশিয়ার নিকট আফগানিস্তান ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। এদিকে পাশ্চাত্য শক্তির অনুসারী ইরানের শাহের পতন ঘটে। ইরাক-ইরানে সংঘটিত হয় ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ। এসব কিছুই কৌশলগত পরিবর্তনের ইংগিত প্রদান করে। এটা মুসলিম বিশ্বের জন্য সাধারণ ভাবে এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জন্য বিশেষ ভাবে ক্ষতির কারণ হতে পারতো। এ সর্বনাশ আসতো সোভিয়েত ইউনিয়নকে উষ্ণ সাগর এবং ভারত মহাসাগরের দিকে স্থল পথে যাতায়াতের সুযোগ করে দেওয়ার কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

দুই পরাশক্তির প্রতি ইতিবাচক নিরপেক্ষতার জন্য জোট নিরপেক্ষতা অথবা দুই শক্তির যে কোন একটির সাথে জোট বদ্ধতা এখন আর মুসলিম দেশও জনগণের জন্য কোন কার্যকর নীতি হিসাবে বিবেচিত নয়। মুসলিম দেশগুলোর জন্য একমাত্র করণীয় হল এমন কিছু পথ ও উপায় খুজে বের করা যেগুলোর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে কার্যকর ঐক্য এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয় জোরদার করা যায়। এটা তাদেরকে করতে হবে সীমান্ত অঞ্চলগুলো সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ এবং মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমা শক্তিবর্গ এবং ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের আরও ধ্বংসাত্মক পরাজয় এবং অপমান জনক নিয়ন্ত্রনের হাত হতে নিজেদের রক্ষার জন্য।

বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে সাম্প্রতিক কালে সম্পর্কের ব্যাপারে বেশ পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তন এক নতুন বিশ্বব্যবস্থার দ্বার উন্মুক্ত করছে। এ ব্যবস্থায় সংঘর্ষের পরিবর্তে সহযোগিতার ভাবধারা সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্ত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মুসলিম বিশ্বে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর সম্মুখে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল। এ সুযোগে তারা নিজেদের নিরাপত্তা ও পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়গুলোকে জোরদার করতে পারতো। বিদেশী শক্তিগুলোর সাথে তাদের স্বার্থ

www.pathagar.com

সংরক্ষণের ব্যাপারে দরকষাকষি করতে পারতো। কিন্তু মুসলিম দেশগুলো সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। আমরা আরও লক্ষ্য করছি এ সময়ের মধ্যে আবার এশিয়া এবং ইউরোপে অনেক আন্তর্জাতিক জোটের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ অনেক মুসলিম দেশ নিজেদের মধ্যকার তিক্ত বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে আছে। এর কারণ হল তাদের রাজনৈতিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অনেক দুর্বলতা আছে। তদুপরি তাদের উপর রয়েছে বৈদেশিক শক্তির প্রভাব। সোভিয়েত সাম্রাজ্যের এখন পতন হয়েছে। মার্কসবাদী একদলীয় আদর্শের এখন আর গুরুত্ব নেই। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, উদারতাবাদ, গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদী আদর্শের মাধ্যমে পাশ্চাত্য এখন নিজেদের মধ্যে যে নৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তারা তার সমাধান করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এমতাবস্থায় মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো সৌভাগ্য এবং ভয়ংকর বিপদ উভয়ের সম্মুখীন। এগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা একান্ত জরুরী। কারণ স্বজন প্রীতির ভিত্তিতে আগামী দিনের বেশ কিছু প্রজন্মের জন্য ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে। এমন কি সমগ্র মানব জাতির জন্যও একই পন্থায় ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে।

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে কতগুলো ভয়ংকর বিষয় নিহিত আছে। এগুলো নিয়ে বেশ কিছু দল উপদল প্রতিযোগিতায় মত্ত। এ প্রতিযোগিতার ভিত্তি হল তাদের জাতীয় স্বার্থ। এ অবস্থার অনিবার্য পরিণতিতে সংঘটিত হবে বিশ্বযুদ্ধ। কিম্বার ঘটবে সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা এসবের শিকারে পরিণত হবে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো। বিশ্বযুদ্ধ সমূহ এবং সাম্প্রতিক কালে স্বাধীনতা যুদ্ধগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এসব যুদ্ধে এক বিশ্ব শক্তি অপর বিশ্ব শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এক উপনিবেশিক শক্তি অবতীর্ণ হয়েছে অন্য বা বিশ্ব শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের ভাগ্য বা বিশ্ব শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষায়। শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে তারা বেছে নিয়েছিল ভিয়েতনাম আলজেরিয়া এবং আফগানিস্তানের মত জায়গাকে। এসব থেকে এটা পরিষ্কার যে, কোন একক দেশকে নিজ থেকে ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্প্রতিক পতন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তির যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা থেকে এ বিষয়টির বাস্তবতা সম্পর্কে জানা যায়। এক্ষেত্রে ইতিহাসের শিক্ষা হল এই যে, নিরংকুশ ভাবে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া এবং স্বার্থসিদ্ধির দুঃস্বপ্ন নিয়ে অন্য সকলের বিরোধিতায় এককভাবে নেমে পড়ার অনিবার্য পরিণতি হবে ব্যর্থতা।

বরং সবচেয়ে সম্ভাবনার বিষয় হল এই যে বিশ্ব ব্যবস্থা এমন কোন একটি রূপ পরিগ্রহ করবে যাতে শক্তির আন্তর্জাতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় ঐসব স্থানীয় এবং সীমানায় ভাগের বিষয়ে এবং পরিত্যক্ত বিষয়ে যেগুলো নিয়ে বিতর্কে

www.pathagar.com

জড়িয়ে আছে বৃহৎ শক্তিসমূহ। আধুনিক যুগে অনেক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে নতুন বিশ্বব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর ট্রাজেডি এবং যুদ্ধগুলোর দিকে এমনভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সুযোগ করে দিবে যাতে মনে হয় যে, এ সমস্ত যুদ্ধ একবিংশ শতাব্দীতে যে বস্তুগত এবং মানবিক ক্ষতির কারণ হতে পারে তার তুলনায় তেমন কিছুই না। ব্যাপক ধ্বংসাত্মক সর্বগ্রাসী যুদ্ধ মানবতার জন্য হুমকিস্বরূপ এবং একে এড়িয়ে চলার একমাত্র উপায় হল একটি নতুন এবং কার্যকর ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রবর্তন করা। এটা করা উচিত অবিলম্বে এবং বিশ্ব ধ্বংশ হয়ে যাওয়ার জন্য আর অধিক অপেক্ষা না করে।

নিঃসন্দেহে বিশ্ব ব্যবস্থায় দুর্বলতার অনেক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। লোভাতুরদের দৃষ্টি ঐ ক্ষেত্রগুলোর দিকে। বিশেষ করে তাঁদের আকর্ষণ মুসলিম বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত দুর্বলগুলোর প্রতি। এ দুর্বলতা গুলোর মাধ্যমে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ঘন কুয়াশায় অনেক বিপদের ইঙ্গিত নিহিত আছে। এগুলো বিশ্ব ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বিপদের ঝুঁকিকে আরও বৃদ্ধি করতেই সাহায্য করছে। বিশ্ব ব্যবস্থার এ ঘনকুয়াশা বর্তমানে প্রসারিত হচ্ছে দিক থেকে দিগন্তে।

বিশ্ব মানবতার জন্য মুসলিম বিশ্বের উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। মুসলিম বিশ্বে সরকার এবং জনগণ এমন মৌলিক সংস্কারের প্রবর্তন করতে পারেন যার মাধ্যমে নিজ ভূমিতে বিদেশী শক্তির দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান ঘটানো যায়। এটা এমন এক বিষয় যা মুসলিম জনগণ অথবা মুসলিম নের্তৃবর্গ এবং বুদ্ধিজীবিগণের বিবেককে অবশ্যই স্পর্শ করা উচিৎ।

মুসলিম উম্মাহর সম্মুখে যে সব সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান সেগুলো কেবল উম্মাহর আত্মরক্ষা মূলক অবস্থার মধ্যেই সীমিত রাখা ঠিক নয়। এমন সুযোগ সুবিধা মুসলিম উম্মাহর জন্য রয়েছে এ জন্য যে ইহা দ্বারা মানব সভ্যতার জন্য ইসলামী বিকল্প সৃষ্টি করা যায়। সভ্যতার ভিত্তি তাওহীদ, খিলাফত এবং সকল মানুষের জন্য একই লক্ষ্যাভিসারী নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ইসলামী বিকল্প ব্যবস্থায় সমন্বিত হবে আধ্যাত্মিকতা এবং বস্তুবাদ; আদর্শবাদ এবং বাস্তবতা, দৃশ্যজগত এবং অদৃশ্য জগত এবং যুক্তি ও অবতীর্ণ বিষয়গুলো। তদুপরি সভ্যতার জন্য ইসলামী বিকল্পে ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমানে ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি রয়েছে তা অতিক্রম করা এবং মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বের নিরসন করা। এরূপ করা সম্ভব হলে মানুষের স্বাধীনতার বিভিন্ন দিকগুলো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হবে। দল এবং ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণে এবং তাদের মধ্যে সমন্বিত সম্পর্কের সংরক্ষণ ও বিকাশে যে সুষ্ঠু মানবিক দিকের প্রয়োজন সে সব নীতি আদর্শ মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

www.pathagar.com

অনাগত ভবিষ্যতে যে কঠিন পর্যায় অতিক্রম করতে হবে, সে প্রেক্ষিতে মুসলিম বিশ্বে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল ভাবধারা অগ্রসর হতে হবে সঠিকভাবে ইসলামী সংস্কার মূলক লক্ষ্যসমূহের উপর ভিত্তি করে। এ জন্য প্রয়োজন হবে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে সংহতি। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে নিজেদের মধ্যকার আত্মবিনাশী দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান ঘটাতে হবে। জাতীয় উন্নয়নের জন্য যে সব বিষয় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য সে সব কিছু তাদেরকে সঠিকভাবে নিরূপন করে নিতে হবে। তাদেরকে সবকিছুর পূর্বে বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কারের উপর জোর দিতে হবে। এরূপ সংস্কারের জন্য সংগত কারণেই প্রয়োজন প্রথমে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার। প্রয়োজন ধর্মীয় মনস্তাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক নীতির ভিত্তিতে সামাজিক শৃংখলা আনয়নের। এর পরেই কেবল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সামাজিক পদ্ধতিতে কার্যকারিতা এবং উৎপাদনশীলতার আশা করা যেতে পারে।

মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নীতিমালার ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া, ঐতিহাসিক ইসলামী পদ্ধতি হুবহু বাস্তবায়ন এবং প্রাচীন জুরীবৃন্দের গবেষণাকর্মে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে সেরূপ ভাবে বাস্তবায়নের প্রশ্নে এসে থেমে যাওয়া সমীচীন হবে না। বরং ইসলামের উচ্চতর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ইসলামীকরণ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে বাঞ্ছনীয়। এ প্রক্রিয়ায় ইসলামের মৌলিক নীতি এবং মূল্যবোধগুলোই থাকবে দিক নির্দেশনার ভূমিকায়।

বেদনাদায়ক বিষয় হল এই যে, যাঁরা ওসমানীয়দেরকে অনুসরণ করেছেন তাঁদের অনেকেই তাঁদের ভান্ডারে যা ছিল তার থেকে তেমন ভাল কিছু পরিবেশন করতে পারেননি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালার পরিপক্কতা সত্ত্বেও তাদের নীতিমালার বাস্তবায়ন ভ্রান্তির বেড়াজালে কবলিত হয়েছিল। জোট নিরপেক্ষতা এবং ইতিবাচক নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রেও একই অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে এ নীতিমালা থেকে যা আশা করা হয়েছিল বাস্তবে ঘটেছে তার বিপরীত। সহযোগিতা দরকষাকষি এবং প্রভাবশালী ও লোভাতুর বৈদেশিক শক্তিসমূহের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে গৃহীত কর্মকৌশল পরিচালনায় স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা সৃষ্টির পরিবর্তে অনেক সময় নিজেদেরকে এই বৃহৎ শক্তির নিকট অথবা ঐ বৃহৎ শক্তির ক্যাম্পে ঠেলে দিয়েছে। চূড়ান্তভাবে মুসলিম রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে ঐক্যের আদর্শ একপ্রকার মরিচিকায় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ তাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক বিবর্তন তাদেরকে খোলামেলা দ্বন্দ্বের পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করেছে। এইভাবে ইসলামী বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো হয়েছে দুর্বল থেকে দুর্বলতর। এসব দেশ এবং উন্নত দেশগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক প্রযুক্তিগত এবং সামরিক শক্তির ব্যবধানক্রমেই বেড়ে এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যা প্রকাশিত তথ্যের চেয়েও বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক বেশী।

www.pathagar.com

মুসলিম জনগণ এবং তাঁদের নেতৃবৃন্দ নিজেদের আরও নিষ্ঠাবান করে গড়ে তুলতে হবে। তাঁদেরকে গতিশীল ও বাস্তব ধর্মী নীতিমালার উন্নয়ন করতে হবে। ইসলামের উচ্চতর লক্ষ্য এবং মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কার আনয়ন করতে হবে। এসব না করা গেলে তাদেরকে আরও গভীর এবং ধ্বংসাত্মক সংকটের মধ্যে নিপতিত হতে হবে। তাঁদেরকে বরণ করতে হবে পরাজয় এবং অপূরণীয় ক্ষতি। খুব দ্রুত কিছু করা না গেলে মুসলমানদের একটি সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তাঁরা নিজেদেরকে এবং সমগ্র মানব জাতিকে এমন এক ভয়াবহ ভবিষ্যতে নিয়ে যাবে যা সভ্যতার জন্য হবে বিরাট এক হুমকী।

সার সংক্ষেপ

এ দুটি মৌলিক পররাষ্ট্রনীতির কারণ এবং উদ্দেশ্য উপরোক্ত বিবরণ হতে আমরা (৩ নং চিত্রে) প্রদত্ত পরামর্শমূলক ইসলামী কাঠামো অনুসারে দেখতে পাই যে, স্বয়ং দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর মধ্যে এমন কোন কিছু নেই যা থেকে ঐগুলোকে অনৈসলামিক বা ইসলাম বিরোধী হিসাবে গণ্য করা যায়। সনাতন মতামত (চিত্র-১) অনুসারে অবশ্য এই দৃষ্টিকোণগুলোর ইসলামসম্মত বিবেচিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হবে। কারণ এগুলো সকল দিক দিয়ে ঐতিহাসিক মুসলিম নীতিমালার সাথে খাপ খায় না। আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (চিত্র-২) নীতিগতভাবে এই তিনটি নীতিমালাকে সমর্থন করে। কিন্তু তা ইসলামী চিন্তার (ইসলাহ এবং তাজদিদ) পুনর্জাগরণের প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করে না। ইসলামী আদর্শের সমর্থনের ব্যাপারেও তা কোন গুরুত্ব প্রদান করেনা। সুতরাং আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি উভয়ই এ নীতিমালাগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে। বিরুদ্ধাচরণ হয় তখন যখন এই নীতিগুলোকে ধর্মীয় সংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে মুসলমানদের সুমুখে ইসলামের যোগ সূত্রের ভিত্তি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ হিসাবে অনুসরণ করার প্রসংগ আসে। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন বিশ্ব শক্তির মধ্যে আদর্শিক দ্বন্দ্বের মূলত একটি বলয় হিসাবে মুসলিম বিশ্বকে সক্রিয় রাখাকে অনুমোদন করে।

যেরূপ ইসলামী কাঠামোর (চিত্র-৩) প্রস্তাব করা হয়েছে সেরূপ কাঠামোর সীমারেখার মধ্যে মুসলিম বৈদেশিক নীতিমালার উপর পরিচালিত অনুসন্ধান থেকে একটি বিষয় জানা যায়। আর তা হল মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তা ধারার মৌলিক সংস্কারের জরুরী প্রয়োজনীয়তা। এ কাঠামোর বক্তব্যে একটি বিষয় পরিস্কার। আর সেটা হল সনাতন রাজনৈতিক চিন্তাধারার স্থানকালের সমস্যা এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিকত্ব এবং সামঞ্জস্যের যে অভাব পরিলক্ষিত- এর উভয়টিই দূর করতে হবে। যেরূপ ইসলামী কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়েছে সেরূপ কাঠামো তাওহীদের মৌলিক

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য ও প্রেরণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলামের মূল্যবান নীতিমালা এবং লক্ষ্যসমূহের যথাযথ প্রয়োগের দিকেও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ উপাদানগুলো মুসলিম আদর্শের নৈতিক শক্তিকে মুসলিম বিশ্বের ভিতরে-বাইরে ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। মুসলিম নীতি নির্ধারকদের জন্য এসব বিষয় দিক নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে। প্রস্তাবিত ইসলামী কাঠামোতে বিভিন্নরূপ লক্ষ্য অর্জনের সম্ভবনার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। আমরা দেখি ইতিমধ্যেই মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে (যেগুলো আংশিক ভাবে হলেও ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত)। এ অবস্থানের আরও ইতিবাচক ইসলামী আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির গ্রহণ প্রয়োজন। বিশ্বের যে সব অঞ্চলে উপনিবেশ ছিল সে অঞ্চল গুলোর প্রতি ন্যায়বিচারের দাবীতে আরও সোচ্চার হতে হবে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি এ কাঠামো যৌক্তিক ভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে ইসলামিক পুনর্জাগরণের বিষয়টি অনেক গঠনমূলক পন্থায় ব্যবহৃত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রস্তাবিত কাঠামো অনুসারে বর্ণবাদ এবং জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা যায়। মানুষের জন্য বৈশিষ্ট্য এবং মেধার উপর আরও গুরুত্বারোপ করার বিষয়ে সোচ্চার হওয়ায় যায়। রাজনৈতিক কর্তব্য এবং নীতি নির্ধারণী সংস্থাগুলোর রাজনৈতিক কর্তব্য বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা যায়। মানব কল্যান ও উন্নয়নের, নীতিমালা সাম্য, মেধা এবং সামাজিক ন্যায় বিচারকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে অর্থনৈতিক, কারিগরী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বিষয়ে বৃহত্তর সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সমর্থনের বিষয়কে জোরদার করার জন্য এবং মানুষের সম্মান ও মানবাধিকারের ন্যায় বিষয়গুলো সম্পর্কে ইসলামকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।[৯১]

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের সম্পদের কোন অভাব নেই। তাদের রয়েছে প্রতিষ্ঠান। রয়েছে সমৃদ্ধ মূল্যবোধের ভান্ডার। এসবের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের ন্যায়সংগত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পারে। তাঁদের যা প্রয়োজন তা হল সংশ্লিষ্ট বিষয়, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ধারণাগুলোর প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। গতিশীল গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন সম্পদ, প্রতিষ্ঠান এবং ধারণা গুলোকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপযোগী করে তোলার জন্য। প্রয়োজন জরুরী ভাবে ফল লাভের উদ্দেশ্যে।

---

[৯১] দেখুন Arnold Toynbee, Civilization on Trial, and The World and the West, (Cleveland: World Publishing Co., 1958), যথ. ১৮২-১৮৭; D. Smith, Religion and Development, যথ. ২১-২২; and M. Abu Zahrah, al 'Alagat al Duwaliyah, পৃ: ১৯-৪৬. এ অধ্যায়ে উদ্ধৃত ইসলাম এর মৌলিক নীতি এবং মূল্যবোধের সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াতের বিষয় ও মনে করুন।

www.pathagar.com

মুসলিম চিন্তাধারায় এবং পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনয়ন করা একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। এটা প্রয়োজন একটি সফল ইসলামিক সমাজ পদ্ধতি সৃষ্টি এবং সংরক্ষণের জন্য। সংস্কার প্রয়োজন মুসলমানদের ভূমিকা এবং অবস্থার পরিবর্তনের সফলতা লাভ করার লক্ষ্যে। এ সফলতা আভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিষয়ক উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজন।

মুসলিম সরকারসমূহ এবং মুসলিম জনগণকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় মুসলিম ঐক্য এবং প্রগতির সত্যিকার তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে হবে। তাঁদেরকে মুসলিম ঐক্যের স্বার্থে এবং ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্যও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক বিকল্প সমাধান এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য তাঁদের নিজেদের সক্ষম করে তুলতে হবে।

ইসলামের সংরক্ষণ ও সেবা এবং মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা ও মুসলিম ঐক্য জোরদার করার লক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহ এবং মুসলিম জনগণকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মুসলিম সংগঠন বিশেষ করে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এবং প্রধান সচিবালয় সহ এবং অন্তর্ভুক্ত সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক এবং কারিগরী সংস্থাসমূহের ব্যবহারও উন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে।

এই গবেষণার সারমর্ম এই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে নীতি, আদর্শ, লক্ষ্য ও মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে মুসলিম জনগণ যদি সত্যিকার অর্থেই এসব বিষয়ের অনুসারী হন তাহলে এ জীবনাদর্শ আজও সাফল্যের সার্থে বহিঃসম্পর্কের গঠন মূলক দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম। তাঁদেরকে তাঁদের চিন্তাপদ্ধতির পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে সঠিকভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগকে। ঘটাতে হবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ ইসলামী গবেষণার একটি সুবিন্যস্ত উপলব্ধির উন্নয়ন। এভাবেই মুসলিম চিন্তাবিদ এবং রাষ্ট্রনায়কগণ সক্ষম হতে পারেন উম্মাহর কল্যাণের লক্ষ্যে, মানবতা ও ইসলামের লক্ষ্যে, বিদ্যমান বিকল্প কর্মপন্থার কার্যকর মূল্যায়ন করতে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট (Addenda)

পরিশিষ্ট (Appendix)

প্রথম অধ্যায়

১. দেখুন A. Hourani, Arabic Thought, পৃ: ১৫০, ১৫৩, ২৩৫, এবং ২৭২; Jerome N.D. Anderson and Norman J. Coulson, "Islamic Law in Contemporary Cultural Change" অপ্রকাশিত গ্রন্থ যা লেখা হয়েছে *Enzyklopadia des Kuturwandels im 20. Jahrhundert.* এর জন্য বইয়ের গ্রন্থকার প্রফেসর কোলানকে ধন্যবাদ দিয়েছেন যে তার জন্য তিনি এ প্রবন্ধটির ব্যবস্থা করেছেন। আরও দেখুন মজিদ খাদুরীর "From Religious to National Law," *Modernization of the Arab World,* ed. Jack H. Thompson and Robert D. Reischauer (New York; Nostrand, 1966), পৃ: ৪১।

২. দেখুন A. al 'Aqqäd, Ma yuqal *'an al Islam,* পৃ: ১২৯-৩৪; 'Abd al Hamïd Mutawallî, *Mabädi' Nizam al Hukm fi al Islam; Ma al Muqäranah bi al Mabädi' al Dasturîyah al Hadithah (wa bihi bäbän tamhidïyän 'an masädir al ahkam al dasturïyah fi al sharï ah al Islamïyah wa manähij (aw madäris) al tafsïr fi al fiqh al Islämî)* (Principals of Political Systems in Islam; in Comparison with Modern Constitutional Principles (with two introductory chapters about "Sources of Constitutional Rules in the Islamic Shari`ah" and Methods [or Schools] of Interpretation in Islamic Jurisprudence)): (Alexandria, Egypt; Där al Ma 'ärif, 1966), পৃ: vii-xvii, ৭-৩৫,২৭০-২৭৩ এবং ৩৮১-৩৮৯; 'Abd al Wahhäb Khallaf, *'Ilm Usul al Figh* (The Science of *Usul al Fiqh),* 8th ed. (Kuwait; al Dar al Kuwaitiyah, 1968), পৃ: ১১-১৫; 'Abd al Wahhab Khallaf, *Masädir al Tashri al Islämî fi mä la Nassa fih* (The Sources for Islamic Legislation in Matters for which there is no Directo Text), ৩য় সং (Kuwait; Dar al Qalam, 1972); পৃ: ৭-১৭; J.N.D. Anderson, Islamic Law in the Modern World (New york; New York University Press, 1959), পৃ: ২-১৬; Muhammad Abu Zahrah, *Usul al Figh* (Cariro; Dar al Fikr al 'Arabi, 1957), পৃ: ৩-৬ এবং ৩৭৯-৪০১; Mustafa Ahmad al Zarqa' *Al Figh al Islami fi Thawbih al Jadid; al Madkhal al Fighï (Reintroduction of the Islamic Figh,* vol. 1,

www.pathagar.com

Introduction to [Islamic] Jurisprudence), ৭ম সংশোধিত সং (Beirut; Dár al Fikr, n.d.) পৃ: ৩-৫ এবং ৩০-৩২; এবং N.J. Coulson, Islamic Law, পৃ: ৬-২০, ৭৫-১০২ এবং ২২৩-২২৫.

৩. ফিক্‌হ বিজ্ঞানের উপর লেখাগুলো মৌলিক উৎসসমূহ (কুরআন এবং সুন্নাহ) হতে ইজাতিহাদ এবং আইনগত বিবরণ মতামত সমূহের ভূমিকা এবং প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। এসব ব্যাখ্যার জন্যই বিভিন্নমূখী অবস্থানে যাওয়া সম্ভব হয়। পরবর্তীতে মুসলিম ইতিহাসের যুগে এ বহুমূখীতা এবং দ্বৈততা সুলতান গণ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে। তাঁরা বহুমূখী অবস্থানের যেকোন একটি গ্রহণ করেন অথবা অথবা একটির উপর অনুমোদন দান করেন অথবা নিজ খুশীমত কাজ করেন। এভাবে ফিক্‌হ এর ম্যানুয়্যাল কি বলেছে এবং সাধারণ মুসলিম কর্তৃপক্ষ কি করেছেন এর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কাজেই আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণা অনুসারে ফিক্‌হ এর লেখাগুলোকে আইনের উৎস হিসাবে গণ্য করা উচিৎ। রাজনীতি এবং সিয়ার এর লেখাগুলোর (জাতিপুঞ্জের সম্পর্ক) ক্ষেত্রে এটা খুবই পরিষ্কার। দেখুন : 'Abd al Wahhab Khallaf, *Khulasat Tarikh al Tashri al Islami* (The Essnce of the History of Islamic Law), ৯ম সং (Kuwait: Dar al Qalam, 1971), পৃ: ২৩-৪৯ এবং ৬৫-৮২; Muhammad Abu Zahrah, Al Imam Zayd: Hayatuh wa *'Asruh wa Arauh wa Fiqhuh* (Imam Zayd: His Life, His Age, His Opinions and His Figh) Cairo: Dar al Fikr al Arabi, 1959), পৃ: ১১-১৭, ১৭৩-১৭৯, এবং ৪৬৩-৪৮১; Muhammad Yusuf Musa, Al *Figh al Islami: Madkhal li Dirasatih; Nizam al Muamalat rhi* (slamic Jurisprudence: An Introductionfor its Study and its Approach to Legal Interactions), ৩য় সং (Cairo: Dar al Kutub al Hadithah, 1958), পৃ: ১১-৮৩; N.J. Couslon, Islamic Law, পৃ: ৮৬-৮৮ এবং ১৪৭-১৪৮; Said Ramadan, *Three Major Problems Confronting the World of Islam* (Takoma Park, Crescent Publications, n.d.) পৃ: ১-৬; *Shihab al Din Abu* al 'Abbas Ahmad Ibn Idris al Qarafi, *Al Ihkam fi Tamyiz al Fatawa 'an al Ahkam wa Tasarrufat al Qadi wa al Imam* (The Perfect Work - Distinguishing Legal Opinions from [Judicial and Executive] Decisions and Functions of the Judge and the Imäm), ed. 'Abd al Fattäh Abü Ghuddah, (Halah, Syria: Maktab al Matbu at al Islamiyah, 1967), পৃ: ৭৫-৮৫; Wahbah al Zuhayli, *Athar al Harb fi al Figh al Islämi: Diräsah Muqaranah,* (Damascus: Al Maktabah al Hadithah, 1965), পৃ: ১৩০, ১৩৫.

www.pathagar.com

৪. দ্রঃ Albert H. Hourani, "Minorities," in The *Comtemporary Middle East: Tradition and Innouation,* Benjamin Rivlin and Joseph S. Szyliwicz (New york: Random House, 1965), পৃ: ২০৫-২১৭; Amir Hassäin Siddiqi, Non-Muslim Rule (Karachi: Jamiyatul Falah Publications), যয. ৫৫-৬৩; M. al Bahi, Al Fikr al Islami, পৃ: ৪৮৭; Roderic H. Davison, Turkey (England Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1968), পৃ: ৭৮-১০৮; Sidney Nettleton Fisher, *The Middle East:* A History, ২য় সং (New York: Alfred A. Knopf, 1969), পৃ: ২৯৫-৩২০; এবং Thomas Naff, "Reform and the Conduct of Ottoman Diplomacy in the Reign of Selim III: 1789-1807," *Journal of the American Oriental Society* 83:6 (1963), পৃ: ৩০১-৩০২; আরও দেখুন for documents on capitulations and minorities, J.C. Hurwitz, Diplomacy inthe Middle East: A Documentary Record: 1535-1914 (New york: 1956), খ. ১. পৃ: ২০, ২৪-৩২, ১১৩-১১৬, ১৪৯-৫৩, ১৬৪-১৬৫, এবং খ. ২. পৃ: ২-৩ এবং ১২৭-২৮. For the Syrian Lebanese Case, see the three-volume work of Philip and Fred al Khäzin, *Majmu at al Muharrarät al Siyäsiyah wa al Mufäwadät al Dawliyah 'an Suriya wa Lubnah:* 1840-1910 (Collection of International Political Documents and Negotiations about Syria and Lebanon: 1840-1910) (Beirut: Matba at al Sabr, 1910).

৫. দ্রঃ N.J. Coulson, A History of Islamic Law, পৃ: ৭৫-৮৫ এবং ২০২-২০৩; M. Khadduri, *"From Religious to National Law."* in Modernization of the Arab World, ed. J.H. Thompson and E.R.D. Reischauer (New York: Van Nostrand, 1966), পৃ: ৪০-৪১; N.Y. Müsa, *Al Figh al Islämï,* পৃ: ২৭-৬১; and S. Ramadän, *Islamic Law,* ২৭-৩০.

৬. দ্রঃ A. Hourani, *Arabic Thought,* পৃ: ১৫৭-১৬০; Muhammad Husay, *Al Isläm wa al Hadärah al Gharbiyah* (Islam and Western Civilization) Beirut: *Där al Irshäd,* 1969), পৃ: ৯১-১০৪; এবং W.C. Smith, *Islam,* এবং ৫৫-৭৩.

৭. সনাতন পদ্ধতি বিজ্ঞানে মাস্‌লাহ্ (জনস্বার্থ) এর নীতির অংশ হওয়ার কারণে (প্রয়োজন) এবং তাকলিদ পাশ্চাত্য হতে রাজনৈতিক ধারণা এবং প্রতিষ্ঠান ধার করার প্রক্রিয়ায় একসাথে কাজ করেছে।

দ্রঃ দারূরাহ্ এবং মাসলাহ্ এর জন্য Wahbah al Zuhayli, *Nazariyat al Darurah al Shar iyah Muqäranah Ma a la Qänün al Wad i* (The Theory of Necessity in Islamic Law compared with Man Made Law) (Damascus: Maktabat al Färäbi, 1969), পৃ: ৪৯-৫৩, ৬৪-৬৯ এবং ১৪০-২৭২.

www.pathagar.com

৮. H. A. Sharabi, "Islam and Modernization in the Arab World," in *Modernization of the Arab World,* J.H. Thompson and R.O. Reischauer ed. পৃ: ৩২; H.A.R. Gibb, *ModernTrends in Islam,* পৃ: ৬৬; Malik Bennabi, *Wijhat* al *'Alam al Islämi* (The Direction of the Muslim World), 'Abd al Sabur Shähin, trans., *Mushkilat al Hadärah,* ২য় সং (Beirut; Där al Fikr, 1970), পৃ: ৭৭; also A. Hourani, Arabic Thought, পৃ: ৩৭২-৩৭২, for a brief introduction to Malik Bennabi; Malcolm H. Kerr, *Islamic* Reform; The *Political and Legal Theories of Muhammad* 'Abduh and Rashid Radä (Berkley: Univ. of California Press, 1966), পৃ: ২২১-২২২; A. A. Mahmud, Al Da *'wah al Islamiyah,* পৃ: ৩১৭-৩৪২; M. F. Abu Hadid, *"Risalat al Salam wa al Tahrir"* (The Mission of peace and Liberation) in Al Muhadarat al 'Ammah, ২য় সং The Public Administration for Islamic Culture at al Azhar, পৃ: ৩৬৭-৩৯১; এবং Mahmud Shaltut, Al Islam wa *al 'Aläqät al Duwaliyah fi al Silm wa al Harb* (Cairo; Maktab Shaykh al Jami ' al Azhar li al Shuun al 'Ammah, 1951), পৃ: ২৬-৬৯).

www.pathagar.com

পরিভাষা (Glossary)

প্রায়ই ব্যবহৃত কিছু আরবি শব্দের তালিকা ও অর্থ নিম্নে দেওয়া হল।

আদ্‌ল ঃ ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার

আহ্‌দ ঃ অঙ্গীকার, চুক্তি।

আহলুল কিতাব ঃ সহনীয় বলে গণ্য, সম্মানিত ও নিরাপত্ত প্রাপ্ত, লোক, আসমানি গ্রন্থধারী লোক (প্রধানত ইহুদি ও খ্রিস্টান)।

আমান ঃ নিরাপদ আচরণ, নিরাপত্তা চুক্তি।

আমীরুল মুমিনীন ঃ বিশ্বাসীগণের তথা মুসলমানদের নেতা, খলিফা।

আসবাবুল নুযুল ঃ কুরআনের কোনো আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ, কারণ, প্রেক্ষাপট বা পটভূমি; শানে নুযুল। (একবচন, সাবাবুন নুযুল)

আসূল ঃ উসূল শব্দের একবচন মূলনীতি, আইনের মূলনীতি;

আসার ঃ ঐতিহ্য, বর্ণনা; কখনো কখনো হাদীসের সমার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

দারুল আহ্‌দ (না দারুস সুলহ্‌) ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম রাষ্ট্র (শব্দটি ইমাম শাফী সর্বপ্রথম প্রচলন করেন)।

দারুল হারব ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন অমুসলিম রাষ্ট্র (দারুল ইসলামের বিপরীত)।

দারুস সুলহ্‌ ঃ দেখুন-দারুল আহ্‌দ।

জিম্মা ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিক ও ইসলামী সরকারের মধ্যে স্থায়ী সাংবিধানিক ব্যবস্থা, যার আওতায় অমুসলিম নাগরিকগণ ইসলামী শাসনের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান ও আনুগত্য প্রকাশ এবং জিযয়া প্রদানের বিনিময়ে নিরাপত্তা লাভ করবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে।

জিম্মি ঃ যে ব্যক্তি জিম্মা লাভ করে; ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক।

ফাত্‌ওয়া ঃ আইগত মতামত বা ধর্মীয় আইনের ব্যাখ্যা।

ফিক্‌হ ঃ মুসলিম আইন ব্যবস্থা; কুরআন ও সুন্নাহ্‌ থেকে উৎসারিত বিধিবিধান বা ইসলামের আইনগত সিদ্ধান্ত ও মতামতের সমষ্টি প্রাচীন ও সনাতনপন্থী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারার মূল হাতিয়ার।

হাদীস নবীজির বানী; নবীজির ঐতিহ্য

হারবি ঃ শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিক

www.pathagar.com

হিল্‌ফ ঃ মৈত্রী

হুদনাহ ঃ সাময়িক অস্ত্র বা যুদ্ধ বিরতি

ইজমা ঃ ঐক্যমত

ইজতিহাদ ঃ প্রচেষ্টা চালানো; শরীআর উৎসগ্রন্থগুলো ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগ করা; মৌলিক আইনগত/ফিকাই মতামত

ইমাম ঃ নেতা ঃ খলীফা ঃ নামাজে নেতৃত্বদানকারী; ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে রায় প্রদানের ক্ষমতাধারী ধর্মপ্রাণ মুসলিম পন্ডিত।

ইমামত ঃ খেলাফত, ইমামের পদ বা দায়িত্ব।

ইসতিহ্‌সান ঃ কয়েকটি আইনগত/ফিকহি মতামতের মধ্যে একটি মতকে অন্য মতের চেয়ে প্রাধান্য দেয়া বা শ্রেয়তর মনে করা।

জিহাদ ঃ সংগ্রাম; আত্মসংশোধন ও সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব পূরণের জন্য একজন মুসলিমের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া; আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো কাজ করা বা যুদ্ধ করা।

জিযয়া ঃ রাষ্ট্রীয় সেবাগ্রহণের বিনিময়ে অমুসলিম নাগরিকরা ইসলামী রাষ্ট্রকে যে কর প্রদান করে। এটিকে অনেক সময় পোল ট্যাক্স্ বলা হয়।

খিলাফত ঃ খলীফার পদ বা দায়িত্ব; পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার কাজ।

খলীফাতুর রাসূলুল্লাহ ঃ আল্লাহর রাসূলের উত্তরাধিকারী খলীফা।

খারাজ ঃ অমুসলিম নাগরিকগণ ইসলামী রাষ্ট্রকে যে ভূমি রাজস্ব প্রদান করে।

খুলাফায়ে রাশিদা ঃ সঠিকপথের নির্দেশনাপ্রাপ্ত ইসলামের প্রথম চার খলীফা হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ)

মাসলাহাহ ঃ জনস্বার্থ, গণপূর্ত।

মিসাক ঃ চুক্তিপত্র; চুক্তি; সন্ধি।

মুআহাদাহ ঃ চুক্তি সমঝোতা।

মুশরিক ঃ যে আল্লাহর সাথে শরিক করে; পৌত্তলিক মূর্তি পূজক। বহুবচন-মুশরিকুন।

মুসতামান ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিক।

নাবজ ঃ মুসলিমদের পক্ষ থেকে সমঝোতা বা চুক্তি বাতিল বা অবসান করা।

নাস্‌খ ঃ পূর্বে অবতীর্ণ কুরআনের কোনো আয়াত বা আদেশ স্থগিত করা, রহিত করা, বা সাময়িকভাবে বাতিল করা।

নাস ঃ মূল পাঠ্য

www.pathagar.com

কিয়াস ঃ পূর্বের কোনো ঘটনা বা সিদ্ধান্তের সাথে তুলনার দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

কুরআন ঃ ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতমগ্রন্থ, আল্লাহর শ্বাশত বাণী।

কুরাইশ ঃ মক্কার নেতৃস্থানীয় আরব গোত্র

রিদ্দাহ ঃ স্বধর্ম ত্যাগ করা।

মুরতাদ ঃ স্ব-ধর্ম ত্যাগী।

সগর ঃ অপদস্থতা, লাঞ্ছনা।

সহীফাতুল মাদীনা ঃ মদীনার ইহুদি গোত্রগুলোর সাথে নবীজির সাংবিধানিক সমঝোতা; মদীনার সনদ।

শরীআ ঃ মানব আচরণের জন্য আল্লাহর ইচ্ছা, যা নবী মুহাম্মদের (সঃ) মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

সিয়ার ঃ পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে মুসলিমদের অর্জনের বিবরণ; মুসলিম পররাষ্ট্র নীতির আইনগত উৎস।

সুলহ ঃ সন্ধি চুক্তি; যুদ্ধ বিরতি

সুন্নাহ ঃ অনুমোদিত পন্থা; নবীজির বাণী, কর্ম ও সম্মতি; হাদীস

সুন্নী ঃ সনাতনপন্থী মুসলিম; সুন্নাহের ভিত্তিতে বিভক্ত চার মাজহাবের এক মাজহারের অনুসারী; নবীজির শুদ্ধ অনুসারী; অধিকাংশ মুসলিম জনসংখ্যা। বিপরীত শিয়া)।

তালফীক ঃ একত্র করা, চয়ন করা

তাকলীদ ঃ অনুকরণ করা, অনুসরণ করা

উলামা ঃ মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী ধর্মপ্রাণ শিক্ষিত ও পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ; (একবচন-আলিম)।

উম্মাহ ঃ সম্প্রদায় লোক, জাতি, একদল লোক।

উরফ ঃ কোনো সমাজের বিশেষ প্রথা;

প্রথাগত আইন।

উসূল ঃ সনাতন মুসলিম আইন ব্যবস্থার উৎস ও পদ্ধতি যথা- *কুরআন, সুন্নাহ, কিয়াস, ইজমা* এবং *ইজতিহাদের* অন্যান্য নিয়মনীতি। (একবচন-আস্‌ল)

উসূলুর ফিক্‌হ ঃ দেখুন *উসূল*

যাকাত ঃ গরিবের পাওনা; মুসলিমগণ তাদের অতিরিক্ত সম্পদের উপর যে বাৎসরিক কর দেয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রন্থ বিবরণী (Bibliography)

গ্রন্থ সূত্র-আরবী (References-Arabic)

Bukhari, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ismäil, al, *Matnal Bukhäri bi Hashiyat al Sindi* (Bukharis Collection of Hadith with the Commentary of all Sindi) Caro: Dar Ihyä al Kutub al 'Arabiyah, 1960).

Hamidullah, Muhammad, *Majmu at al Wathaiq al Siyasiyah li al 'Ahd al Nabawi wa a al Khilafah al Rashidah* (Political Documents Concerning the Period of the Prophet and the Rightly-Guided Caliphs) (Bbeirut: Där al Irshäd, 1959).

Ibn Manzur, al Imäm al 'Allämah Abu al Fadl Jamal al Dïn Muhammad Ibn Muqarrin, *Lisän al 'Arab* (The Arab Language) (Cairo: al Matba 'ah al Kubra, 1882).

Kahhalah, 'Umar Rida, *Mu jam al Muallifin: Tarajim Musannifi al Kutub al 'Arabiyah* (Index of Authors: Bibliography of Authors of Arabic Books) (Damascus: Al Maktabah al 'Arabiyah, 1957).

Khazin, Philip al and Fred al, *Majmu* 'at al Muharrarat al Siyasïyah wa al *Mufawadat al Duwalïyah 'an Suriya wa Lubnan:* 1840-1910 (Collection of International Political Documents and Negotiations About Syria and Lebanon: 1840-1910) (Beirut: Matba 'at al Sabr, 1910).

Mujaddidï, al Muftï al Sayyid Muhammad Amïn al Ihsan, al, (ed.), *Qawaid al Figh* (The Rules [and Definitions of Terms] of Muslim [Hanafi] Jurisprudence) (Dhaka: The Secretary, Research and Publication Committee, Madrasah-i-Aliah, 1961).

Mundhirï, al Häfiz 'Abd al 'Azim ibn 'Abd al Qawï, al, *Mukhtasar Sahih Muslim* (Summary of Muslim's [Selection of the] Authentic Sumah), ed. Näsir al Dïn al Albanï (Kuwait: The Ministry of Endowments and Islamic Affairs, 1969).

Nusayr, 'Ayadah Ibrahim, *Al Kutub al 'Arabiyah allati Nußhirat fi al*

www.pathagar.com

Jumhuriyah al 'Arabiyah al Muttihidah (Misr) Bayna 'Amay 1926-1940 (The Arabic Books Published in the United Arab Republic [Egypt] between 1926-1940) (Cairo: The American University of Cairo, 1969).

Räzï, Muhammad ibn Abi Bakr, al, *Mukhtär al 'Sihäh* (Selection of Correct Definitions [an Arabic dictionary]) (Cairo: Mustafa al Babi al Häläbi wa Awladuh, 1950).

Tabrizi, Wali al Din Muhammad ibn 'Abd Allah al Khatib al, *Mishkat al Masabih* (Collection of Authentic Traditions of the Prophet), ed. Muhammad Nasir al Din al Albani (Damascus: Al Maktab al Islami, 1961).

গ্রন্থসূত্র-ইংরেজী (References-English))

'Ali, 'Abd Allah Yusuf, *The Holy Quran, Text, Translation and Commentary* (Washington, DC: the American International Printing Co., 1945).

The Encyclopedia of Islam, 2nd ed. (Leiden: E.J. Brill, Luzac and Co., 1960).

Hurewitz, J.C., *Diplomacy in the Near and Middle East: A Documentary Record 1535-1914* (New York: van Nostrand, 1956).

Khan, Muhammad Muhsin, *The Translation of the Meaning Sahih al Bukhari* (Gujaranwala, Pakistan: Sethi Straw Board Mills Conveersions, Ltd., n.d.).

Index Islamicus: A Catalogue of Articles on Islamic Subjects in Periodicals and Other Collective Publications (Cambridge: W. Heffer and Sons, Ltd., 1972).

Peaslee, Amos J., *Constitutions of Nations*, prepared by Dorothy Peaslee Xydis (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965).

Pickthall, Muhammad Marmaduke, *The Meaning of the Glorious Koran* (New York: New American Library, n.d.).

Tabrizi, Wali al Din Muhammad ibn 'Abd Allah al Khatib al 'Imari, al,

www.pathagar.com

Mishkat al Masabih, translated with explanatory notes by James Robson (Lahore, Pakistan: Sh. Muhammad Ashraf, 1963).

পর্যালোচিত গ্রন্থাবলী-আরবী (Works Consulted-Arabic)

'Abduh, Muhammad, *Al Islam wa al Nasraniyah Ma 'a al 'Ilm wa al Madaniyah* (Islam and Christianity with Regard to Knowledge and Civilization) Cairo: Maktabat wa Matba at Muhammad 'Ali Sabih wa Awladuh, 1954).

'Abduh, Muhammad; *Al Islam wa al radd 'Ala Muntaqidih* (Islam and Answers for Its Critics) (Cairo: Al Maktabah al Tijariyah al Kubra, 1928).

Abu Zahrah, Muhammad, *Al 'Alaqat al Duwaliyah fi al Islam* (International Relations in Islam), Al Maktabahal 'Arabiyah (Cairo: Al Dar al Qawmiyah li al Tiba 'ah wa al Nashr, 1964).

Abu Zahrah, Muhammd, *Al Imam Zayd: Hayatuh wa 'Asruh wa Arauh wa Fighuh* (Imam Zayd: His Life, His Age, His Opinions and His Figh) (Cairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1959).

Abu Zahrah, Muhammad, *Al Mujtama 'al Insiani fi Zill al Islam* (Human Society under the Rule of Islam) (Beirut: Dar al Fikr, n.d.).

Abu Zahrah, Muhammad, *Ibn Hanbal: Hayatuh wa 'Asruh wa Arauh wa Fighuh* (IbnHanbal: His Life, His age, His Opinions and His Figh) (Cairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1947).

Abu Zahrah, Muhammad, Malik: Hayatuh wa 'Asruh wa Arauh wa Fighuh (Malik: His Life, His Age, His Opinions and His Figh) (Cairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1963).

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al Figh* (Methodology of Muslim Jurisprudence) (Cairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1957).

Abu Zayd, Mustafa, *Al Nasikh wa al Mansukh: Dirasah Tashriiyah Tarikhiyah Naqdiyah* (The Abrogating and the Abrogated: A Juristic, Historical and Critical Study) (Cairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1963).

'Ali, Jawad, Al *Mufassal fi Tarkh al 'Arab Qabl al Islam* (Detailed

www.pathagar.com

Account of Arab History before Islam) (Beirut: Dar al 'Ilm li al Malayin, 1970).

Amin, Ahmad, *Fajr al Islam: Yabhath 'an al Hayat al 'Aqliyah fi Sadr al Islam ila Akhir al Dawlah al Umawiyah* (The Dawn of Islam: Discussionon Inteellectual Life inthe Early Period of Islam until the End of the Umayyad Dynasty), 9th ed. (Cairo: Maktabat a Nahdah al Misriyah, 1964).

Amin, Ahmed, *Yawam al Islam* (The Day of Islam (Cairo: Muassasat al Khanji, 1958).

'Aqqad, 'Abbas Mahmud, al, *Haqaiq al Islam wa Abatil Khusumih* (The Facts of Islam and the allegations of its Adversaries), 3rd ed. (Cairo: Dar al Qalam, 1966).

'Aqqad, 'Abbas M., al, Al Islam fi al Qarn al *'Ishrin: Hadiruh wa Mustaqbaluh* (Islam in the Twentieth Century: Its Present and Its Future), 2nd ed. (Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi, 1969). 'Aqqad, 'Abbas Mahmud, al, Ma Yuqalu 'an al Islam (On What has been Said about Islam), 2nd ed. (Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi, 1966).

Arsalan, Shakib, *Li Madha Taakhkhara al Muslimum wa Li Madha Taqaddama Ghayruhum* (Why Muslims are Declining and Why Others are progressing) (Beirut: Dar Maktabat al Hayah, 1965).

Badawi, 'Adb al Rahman, ed. *Al Turath al Yunani fi al Hadarah al Islamiyah: Dirasat li Kibar al Mustashriqin* (The Greek Heritage in Islamic Civilization: Studies by Prominent Orientalists) (Cairo: Dar al Nahdah al 'Arabiyah, 1965).

Al Bahi, Muhammad, *Al Fikr al Islami al Hadith wa Silatuh bi al Isti 'mar al Gharbi* (Contemporary Islamic Thought and Its Relation to Western Imperialism), 4th ed. (Cairo: Maktabat Wahbah, 1964).

Darwazah, Muhammad *'Izzat, Al Tafsir al Hadith* (Contemporary Interpretation of the Quran) (Cairo: 'Isa al Babi al Halabi, 1964).

Fakhri, Majid, *Dirasah fi al Fikr al 'Arabi* (A Study in Arabic Thought)

www.pathagar.com

(Beirut: Dar al Nahar, 1970).

Farra, Abu Yala Muhammad Ibn Husayn, al, Al Ahkam al Sultaniyah (The Ordinance of Governement), ed. Muhammad Hamid al Faqi (Cairo: Mustafa al Babi al Halabi, 1966).

Ghanim, Muhammad Hafiz, *Mabadi al Qanun al Duwali al' Amm* (Principles of International Law), 4th ed. (Cairo: Matab at Nahdat Misr, 1964).

Ghazali, Muhammad, al, *Al Islam fi Wajh al Zahf al Ahmar* (Islam Figting Communist Expansion) (Kuwait: Maktabat al Amal, n.d.).

Ghazali, Muhammad, *al, Al Taassub wa al Tasamuh Bayn al Masihiyah wa al Islam: Dahad Shubuhat wa Radd Muftarayat* (Fanaticism and Tolerence Between Charistianity and Islam: Rebutting and Answering Misunderstandings and False Accusations) (Kuwait: Dar al Bayan, n.d.).

Ghazali, Muhammad, al, *Figh al Sirah* (Normative Understanding of the Sirah), 4th ed. (Cairo: Dar al Kutub al Hdithah, 1964.

Hamadhani, Abu Bakr Muhammad ibn Musa Ibn Hazm, al, *Kitab al I tibar fi al Nasikh wa al Mansukh Min al Athar* (Book of Lessons About the Abrogator and the Abrogated of the Traditions), ed. Ratib al Hakim (Hims, Syria: Matba at al Andalus, 1966).

Hawatmah, Nayif, *Azmat al Thawrah fi al Janub al 'Arabi: Naqd wa Tahlil* (The Crisis of the Revolutionin South Yemen: Analysis and Criticism) (Beirut: Dar al Tali ah, 1968).

Hell, J., *Al Hadarah al 'Arabiyah* (Arab Civilization), trnslated from German by I. al 'Adawi, ed. H. Munis, Al Alf Kitab no. 88 (Cairo: Maktabat al Anjlu al Misriyah, 1956).

Husayn, Muhammad, *Al Ilam wa al Hadarah al Gharbiyah* (Islam and Western Civilization) (Beirut: Dar al Irshad, 1969).

Husayni, Sayyid 'Abd al Razzaq, al, *Tarikh al 'Iraq al Siyasi al Hadith* (The Modern Political History of Iraq), 2nd rev. ed. (Sayda, Lebanon: Matba at al 'Irafan, 1958).

www.pathagar.com

Ibish, Yusuf, *Nusus al Fikr al Siyasi al Islami:* Al Imamah Inda al Sunnalh (Readings in Islamic Political Theory: The Sunni Doctrine of the Imamah) (Beirut: Dar al Tali ah, 1966).

Ibn al Athir, 'Izz al Din Abu al Hasan 'Ali Ibn Abi al Karam Muhammad Ibn 'Abd al Karim Ibn 'Abd al Wahid al Shaybani, *Al Kamil fi al Tarikh* (The Comprehensive [Study] of History) (Beirut: dar Bayrut li al Tiba ah wa al Nashr, 1965).

Ibn Hisham, Abu Muhammad 'Abd al Malik, Al *Sirah al Nabawiyah* (The Biography of the Prophet), ed. M. al Saqqa, I. al 'Ibyari and A. Shalabi, 2nd ed. (Cairo: Mustafa al Babi al Halabi, 1955).

Ibn al Qayyim, Shams al Din Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Abu Bakr, *Ahkam Ahl al Dhimmah* (Rules for Non-Muslim Subjects of the Islamic state), ed. Subhi al Salih (Damascus: Matba 'at Jami' at Dimashq, 1961).

Ibn Qudamah, Abu Muhammad 'Abd Allah ibn Ahmad, Al Mughni (The Sufficient) (Cairo: Matba `at al `Asimah, n.d.).

Ibn Rushd al Hafid (Averroes), Abu al Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd al Qurtubi al Andalusi, Bidayat al *Mujtahid wa Nihayat al Muqtasid* (A Begining for the Independent Legal Interpreter and an end for the Limited), ed. Muhammad Amin al Khanji (Cairo: Maktabat al Khanji, n.d.).

Ibn Salamah, Abu al Qasim Hibat Allah, *Al Nasikh wa al Mansukh* (The Abrogating and the Abrogated), 2nd ed. (Cairo: Al Halabi wa Awladuh bi Misr, 1967).

Ibn Taymiyah, Taqiy al Din Ahmad ibn 'Abd al Halim, *Al Siyasah al Shar iyah fi Islah al Rai wa al Ra iyah* (Policies of the Shariah in Reforming the Affairs of the Ruler and the Ruled) (Beirut: Dar al Kutub al 'Arabiyah, n.d.).

'Ishmawi, Hassan, al, *Qalb Akhar li Ajl al zaim* (Another Heart for the Leader) (Beirut: dar al Fath, 1970).

www.pathagar.com

Jammal, 'Abd al Qadir, al, Min *Mushkilat al Sharq al Awat* (Some Problems of the Middle East) (Cairo: Maktabat al Anjlu al Misryah, 1955).

Kahlani, al Imam Muhammad Ibn Isma il, al, *Subul al Salam: Sharh Bulugh al Muram min Adillat al Ahkam* (The Ways of Peace: A Commentary on the Attainmnt of the Desired Support [of Quran and Sunnah] of [the Islamic] Rules) (Cairo: Al Maktabah al Tijariyah al Kubra, n.d.).

Khallaf, 'Abd al Wahhab, *'Ilm Usul al Figh* (The Science of Usul al Figh), 8th ed. (Kuwait: Dar al Kuwaytiyah, 1968).

Khallaf, 'Abd al Wahhab, *Khulasat Tarikh al Tashri al Islami* (The Essence of the History of Islamic Law), 9th ed. (Kuwait: dar al Qalam, 1971).

Khallaf, 'Abd al Wahhab, *Masadir al Tashri al Islami fima la Nassa fih* (Sources of Islamic Legislation in Matters for Which there is no Specific Text), 3rd ed. (Kuwait: dar al Qalam, 1972).

Khattab, Mahmud Shit, *Al Rasul al Qaid* (The Leader Messenger), 2nd ed. (Baghdad: dar Maktabat al Hayah wa Maktabat al Nahdah, 1960).

Kishk, Muhammad Jalal, *Mafahim Islamiyah: Al Qawmiyah wa al Ghazw al Fikri* (Islamic Perspectives: Nationalism and the Cultural Invasion) (Kuwait: Maktabat al Amal, 1967).

Lilah, Muhammad Kamil, *Al Mujtama al 'Arabi wa al Qawmiyah al 'Arabiyah* (ArabSociety and Arab Nationalism) (Cairo: Dar al Fikr al 'Arab, 1966).

Mahmasani, Subhi, *al Awda al Tashriyah fi al Duwal al 'Arabiyah; Madiha wa Hadiruha* (Legal Systeems in Arab States: Past and Present), 3rd rrev. ed. (Beirut: Dar al 'Ilm li al Malayin, 1965).

Malik Ibn Anas, *Al Mudawwanah al Kubra* (The Great Compendium) (Beirut: dar al Sadir, 1905).

Mansur, *'Ali, Muqaranah Bayana al Shariah al Islamiyah wa al Qawanin al Wadiyah* (A Comparative Stydy Between the Islamic Shariah and Secular Laws) (Beirut: Dar al Fath, 1970).

www.pathagar.com

Mawardi, Abu al Hasa 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al Basri al Baghdadi, *al, Al Ahkam al Sultaniyah wa al Wilayat al Diniyah* (The Ordinance of Government and the Religious Offices), 2nd ed. (Cairo: Mustafa al Babi al Halabi, 1966).

Mawdudi, Abu al Ala, al, *Nazariyat al Islam wa Hadyuh* (Islamic Theory and Guidance), translated from Urdu by Jalil Hasan al Islahi (Beirut: Dar al Fikr, 1967).

Mawdudi, Abu al Ala, al, Hasan al Banna, and Sayyid Qutub, *Al Jihad fi Sabil Alaah* (Jihad inthe Cause of Allah) (Beirut: al Ittihad al 'Alami li al Jam 'iyat al Tullabiyah, 1970).

Mawdudi, Abu al Ala, al, *Al Islam fi Muwajahat al Tahaddiyat al Mu asirah* (Islam in Confrontation with Contemporary Challenges), translated by Khali Ahmad al Hamidi (Kuwait: Dar al Qalam, 1971).

Mubarak, Muhammad, al, *Al Fikr al Islami al Hadith fi Muwajahat al Afkar al Gharbiyah* (Contemporary Islamic Thouth in Confrontiation with Western Ideas) (Beirut: Dar al Fikr, 1968).

Mundhiri, al Hafiz 'Abd al 'Azim ibn 'Abd al *Qawi, al, Mukhtasar Sahih Muslim* (Summary of Muslim's [Selection of the] Authentic Sunnah), ed. Nasir al Din al Albani (Kuwait: The Ministry of Endowments and Islamic Affairs, 1969).

Musa, Muhammad Yusuf, *Al Figh al Islami: Madkhal li Dirasatih; Naizam al Mu amalah fihi* (Islamic Jursprudence: An Introduction to Its Study and Its Approach to Legal Transactions), 3rd ed. (Cairo: Dar al Kutub al Hadithah, 1958).

Mutawalli, 'Abd al Hamid, *Mabadi Nizam al Hukm fi al Islam: Maa al Muqaranah bi al Mabadi al Dusturiyah al Hadithan* (Principles of the Political System in Islam: In Comparison with Modern Constitutional Principles) (Alexandra, Egypt: Dar al Ma arif, 1966).

Najjar, Husayn, al, Al Siyasah wa al Istratijiyah fi al Sharq al Awast (Politics and Strategy inthe Middle East) (Cairo: Maktabat al Nahdah al

www.pathagar.com

Misryah, 1953).

Naysaburi, Abu al Hasan 'Ali ibn Ahmad al Wahidi, *al, Asbab al Nuzul* (Reasons for Revelation of the Quran) (Cairo: Mustafa al Babi al Halabi 1959).

Qal'aji, Jihad, *Al Islam Aqwa* (Islam is Stronger) (Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi, n.d.).

Qarafi, Shihab al Din Abu al 'Abbas Ahmad ibn Idris, al, *Al Ihkam fi Tamyiz al Fatawa 'an al Ahkam wa Tasarrufat al Qadi wa al Imam* (The Perfect Work in Distinguishing Legal Opinions from [Judicial and Executive] Decisions and Functions of the Judge and the Imam), ed. 'Abd al Fattah Abu Ghuddah (Halab, Syria: Maktab al Matba ah al Islamiyah, 1967).

Qutub, Sayyid, *Al Salam al 'Alami wa al Islam* (World Peace and Islam) (Cairo: Dar Ihya al Kutub al 'Arabiyah, 1967).

Rayyis, Muhammad Diya al Din, al, *Al Nazariyat al Siyasiyah al Islamiyah* (Islamic Political Theories), 4th ed. (Cairo: Dar al Ma arif 1967).

Razi, al Imam Fakhr al Din, al, *Al Tafsir al Kabir* (The Great Commentary on the Quran) (Cairo: 'Abd al Rahman Muhammad, 1938).

Rida, Muhammad Rashid, *Tafsir al Qur an al Hakim al Mushtahar bi Islm Tafsir al Manar* (Commentary of the Perfect Quran, better known as the Manar Commentary), 4th ed. (Cairo: Dar al Manar, 1954).

Dabiq, al Sayyid, *Figh al Sunnah* (Understanding the Sunnah) (Kuwait: Dar ai Bayan, 1968).

Saidi, 'Abd al Muta al, al, *Al Hurriyah al Diniyah fi al Islam* (Religious Freedom in Islam), 2nd ed. (Cairo: Dar al Fikr al 'Arabi, n.d.).

Shafii, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Idris, *al, Al Umm* (The Mother, i.e., Basic Work of Jurisprudence) (Cairo: Dar al Sha b, 1903).

Shaltut, Mahmud, Al Islam wa al *'Alaqat al Duwaliyah fi al Silm wa al Harb* (Islam and International Relations inPeace and War) (Cairo : Maktabat Shaykh al Jami al Azhar li al Shuun al ' Ammah, 1951).

www.pathagar.com

Shaybani, Muhammad Ibn al Hasan, *al, Sharh al Siyar al Kabir* (Commentary on the Book of the Great Siyar), dictationof Muhammad Ibn Ahmad al Sarakhsi, ed. Salah al Munajjid (Cairo: Ma had al Makhtutat bi Jami at al Duwal al Arabiyah, 1958).

Shumayl, Muhammad Ba, *Ghazwat Bani Qurayzah,* vol. IV of *Min Ma arik al Islam al Fasilah* (The Battle of Bani Qurayzah, vol. IV of The Decisive Battles of Islam) (Beirut: Dar al Fath li al Tiba ah wa al Nashr, 1966).

Shumayl, Muhammad Ba, *Ghazwat Badr al Kubra,* vol. I of *Min Ma arik al Islam al Fasilah* (The Great Battle of Badr, vol. I of The Decisive Battles of Islam), 4th ed. (Bdirut: Matba at Dar al Kutub, 1968).

Tabari, Abu Ja 'far Muhammad ibn Jarir, al, *Jami 'al Bayan 'an Tawil Ay al Quran* (The Master of Clarity in Interpreting Verses of the Quran), 2nd ed. (Cairo: Mustafa al Babi al Halabi, 1945).

Tabbarah, 'Afif 'Abd al Fattah, *Al Yahud fi al Quran: Tahlil 'Ilmi li Nusus al Quran fi al Yahud 'ala Daw' al Ahdath al Hadirah, Ma a Qasas Anbiya' Allah, Ibrahim wa Yusuf wa Musa 'Alayhim al Salam* (The Jews and the Quran: Scientific Analysis of the Quranic Text Pertaining to the Jews in the Light of Contemporary Events: With the Stories of the Prophets, Abraham, Josepha nd Moses), 2nd ed. (Beirut: Dar al 'Ilm li al Malayin, 1966).

Tabrizi, Wali al Din Muhammad ibn 'Abd Allah al Khatib al 'Imari, *al, Mishkat al Masabih* (Collections of Authentic Traditions of the prophet), ed. Muhammad Nasir al Din al Albani (Damascus: Al Maktab al Islami, 1961).

'Uthman, 'Abd al Karim, *Al Nizam al Siyasi fi al Islam* (Political System in Islam) (Beirut: Dar al Irshad, 1968).

'Uthman, Muhammad Fathi, *Dawlat al Fikrah allati Aqamaha Rasul al Islam 'Aqab al Hijrah: Tajrubah Mubakkirah fi al Dawlah al Iydyulujiyah fi al Tarikth* (The Ideological State Which the Messenger of Islam Established After the Immigration: An Early Attempt in History at an Ideological State) (Kuwait: Al Dar al Kuwaytiyah, 1968).

www.pathagar.com

'Uthman, Muhammad Eathi, *Al Fikr al Islami wa al Tatawwur* (Islamic Thought and Change), 2nd rev. ed. (Kuwait: Al Dar al Kuwaityah, 1969).

'Uthman, Muhammad Fathi, *Al Fikr al Islami wa al Tatawwur* (Islamic Thought and Change), 2nd rev. ed. (Kuwait: Al Dar al Kuwaitiyah, 1969).

Zarakhshi, al Imam Badr al Din Muhammad ibn 'Abd Allah, *al Burhan fi 'Ulum al Quran* (The Proof in the Sciences of Quran), ed. Muhammad Abu al Fadl Ibrahim (Cairo Dar Ihya al Kutub al 'Arabiyah, 'Isa al Babi al Halabi, 1957).

Zarqa, Mustaf Ahmad, *al, Al Figh al Islami fi Thawbih al Jadid,* vol. I of Al Madkhal al Fighi (Reintoroduction of the Islamic Figh, vol. I of Introduction to [Islamic] Jurisprudence), 7th rev. ed. (Beirut: Dar al Fikr, n.d.d).

Ziyadeh, Nicola (ed.), *Dirasat Islamiyah* (Islamic Studies) (Beirut: Dar al Andalus, 1960).

Zuhayli, Wahbah, al, Athar al Harb fial Figh al Islami: Dirasah Muqaranah (The Effects of War in Islamic Jursprudence: A Comparative Study), 2nd ed. (Damascus: Al Maktabah al Hadithah, 1965).

Zuhayli, Wahbah, *al, Nazariyat al Darurah al Shar iyah Muqaranah Ma a al Qanun al Wad i* (The Theory of Necessity in Islamic Law in Comparison with secular Law) (Damascus: Maktabat al Farabi, 1969).

পর্যালোচিত গ্রন্থাবলী-ইংরেজী (Works Consulted-English))

Abdul Hakim, Khalifah, *Islam and Communism,* 3rd ed. (Lahore, Pakistan: Institute of Islamic Culture, 1962).

Adams, Charles C., *Islam and Modernism in Egypt* (New York: Russell and Russell, 1933).

Ahmad, 'Aziz, *Islamic Modernism in India and Pakistan: 1857-1964* (London: Oxford University Press, 1967).

Ahmad, Khurshid, *Fanaticism, Intolerance and Islam,* 3rd ed. (Karachi:

www.pathagar.com

Islamic Publications, Ltd., 1967).

'Ali, Sayid Ameer, *The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Ideals of Islam with a Life of the Prophet* (London: Methuen, 1922).

Anand, R.P. (ed.), *Asian States and the Development of Universal International Law* (Delhi: Vicas Publications, 1972).

Anderson, Jerome, N.D. and Coulson, Norman J., "Islamic Law in Contemporary Cultural Change" (unpublished essay writtenin connection with the *Enzyklopadie des Kulturwandels in 20. Jahrhundert).*

Anderson, J.N.P., *Islamic Law in the Modern World* (New York: New York University Press, 1959).

Arnold, Sir Thomas W., *The Caliphate, with* a concluding chapter by Sulbia G. Haim (New York: Barnes & Noble, 1965).

'Azzam, 'Abd al Rahman, *The Eternal Message ofMuhammad,* translated from Arabic by Caesar E. Farah (New York: New American Library, 1965).

Berkes, Niyazi, *The Development of Secularism in Turkey* (Montreal: McBill University Press, 1964).

Bozeman, Adda B., *The Picture of Law in a Multicultural World,* (Princetion: Princeton University Press, 1971).

Brockelmann, Carl: *History of the Islamic Peoples*, translated by Joel Carmichael and Moshe perlman (New York: Enpriarn Books Edition, Alien Property Custodian, 1960).

Brohi, A.K., *Islam in the Modern World,* compiled and edited under the auspices of the Islamic Research Academy of Karachi by Khurshid Ahmad (Karachi: Chiragh-e-Rah Publications, 1968).

Chaudhri, Muhammad Ahsan, *Pakistan and the Great powers* (Karachi: Council for Pakistan Studies, 1970).

Choudhry, G.W., Pakistas Relations with India (Meerut, India: Meenakshi Prakshan, 1971).

Claude, Inis L., Jr., Power and International Relations (New York:

www.pathagar.com

Random House, 1962).

Coulson, N.J., A *History of Islamic Law* (Edinburgh University Press, 1960).

Davison, Roderick H., *The Modern Nations in Historical perspective: Turkey* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1968).

Deutsch, Karl W., *Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundation of Nationalism*, 2nd e. (Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1966).

Deutsch, Karl W., and others, *Political Community and the North Atlantic Area: International Organization* in the *Light of Historical Experience* (Princeton: princeton Univrsity Press, 1968).

Dougherty, James E., and Phaltzgraff, Jr., Robert L., *Contending Theories of International Relations* (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1971).

Falk, Richard A., and Black, Cyrile E. (ed.) *The Future of the International Legal Order* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969).

Faruqi, Ismail Raji, al "Toward a New Methodology for Quranic Exegesis," *Islamic Studies, I* (March 1962).

Fenwick, Charles G., *International Law*, 3rd rev. ed. (New York: Appleton-Century Crofts, 1948).

Fisher, Sidney Nettleton, *The Middle East: A History*, 2nd ed. (New York: Alfred A. Knopf, 1969).

Gabrielli, Francesco, *Muhammad and the Conquests of Islam, translated from* the Italian by Virginia Luling and Rosamund Linell (New York: World University Library, McGraw-Hill Co., 1968).

Ghunaymi, Muhammad Tal'at, *The Muslim Conception of International Law and the Western Approach* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1968).

Gibb, H.A.R., Modern *Trends in Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1947).

Gibb, H.A.R., *Muhammadanism: A Historic Survey*, 2nd ed. (New York:

www.pathagar.com

Oxford University Press, 1962).

Gibb, H.A.R., *Studies on the Civilization of Islam,* ed. Stanford J. Shaw and Willam R. Polk (Boston: Beacon Press, 1962).

Halpern, Manfred H., *The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa* (Princeton, NJ : Princeton University Press, 1963).

Hamidullah, Muhammad, *The Muslim Conduct of State, 5th rev. ed.* (Lahore, Pakistan: Sh. Muhammad Ashraf, 1963).

Hamidullah, Muhammad, *The First Written Constitution in the World: An Important Document of the Time of the Holy Prophet,* 2nd rev. ed. (Lahore, Pakistan: Sh. Muhammad Ashraf, 1968).

Hourani, Albert, *"Minorities" in the Contemporary Middle East: Traditin and Innouation,* ed. BenjaminRiulin and Josephs Szyliowics (New York: Random House, 1965).

Hourani, Albert, *Arab Thought in the Liberal Age: 1998-1939* (London: Oxford University Press, 1970).

IbnKhaldun, Abu Zayd Abd al Rahman Ibn Muhammad, *The Muqqaddimah* (An Introuction to History), translated from the Arabic by Franz Rosenthal, ed. N.J. Dawood, Gollingen Series (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1967).

Kelman, Herbert C. (ed.), *International Behavior: A Social-Psychological Analysis* (New York: Holt, Rinehart, Winston, 1965).

Kelsen, Hans, *Principles of International Law,* 2nd ed. (New York: Holt, Rinehart, Winston, 1966).

Kerr, Malcom H., Islamic Reform: *The Political and Legal Theories of Muhammad 'Abduh and Rashid Rida* (Berkeley: University of California Press, 1966).

Khadduri, Majid, *War and Peace in the Law of Islam* (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1952).

Khan, Mohammad, Ayub, *Pakistan Perspective* (Washington, DC:

www.pathagar.com

Pakistani Embassy, n.d.).

Khan, Muhammad Muhsin, *The Translation of the Meaning of Sahih al Bukhari* (gujaranwala, Pakistan: Sethi Straw Board Mills Conversion Ltd., n.d.).

Kunz, Josef L., *The Changing Law of Nations: Essays on Inernational Law* (Columbus: Ohio State University Press, 1968).

Lewis, Bernard, *The Middle East and the West* (New York: Harper & Row, 1960).

Lewis, Bernard, *The Middle East and the West* (New york: Harper & Row, 1966).

Lewis, Bernard, *The Emergence of Modern Turkey,* 2nd ed. (London: Oxford University Press, 1968).

Lewis, Bernard, *Race and Color in Islam* (New York: Harper & Row, 1970).

MacDonald, Robert W., *The League of Arab States: A Study in the Dynamism of Regional Organization* (Princeton NJ: Princeton University Press, 1965).

Mitchell, Richard P., "The Setting and Rational e of Ottoman Diplomacy inthe Reign of Selim III, "unpublished paper.

Naff, Thomas, "Reform and the Conduct of Ottoman Diplomacy in the Reign of Selim III, 1789-1807, *Journal of the American Oriental Society,* 83:6 (1963).

Nasr, Sayyed Hossein, *Islamic Studies: Essays on Law and Society, the Science and Philosphy of Sufism* (Beirut: Libraire du Liban, 1967).

Palmer, Norman D., and Perkins, Howard C., *International Relations: The World Community in* Transition, 3rd ed. (Boston: Houghton Mifflin co., 1969).

Peretz, Don, The Middle East Today (New york: Holt, Rinehart & Winston, 1965).

www.pathagar.com

Proctor, J.H. (ed.), *Islam and International Relations* (New York: Frederick A. Prager, 1965).

Qadiri, Anwar Ahmad, *Islamic Jurisprudence in the Modern World: A Reflection Upon Comparative Study of the Law* (Bombay: N.M. Tripathi Pvt., Ltd., 1963).

Rafi ud Din, M., *Ideology of the Future, 3rd ed.* (Lahore, Pakistan: Sh. Muhammad Ashraf, 1970).

Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965).

Ramadan Said, *Three Major Problems Confronting the World of Islam* (Takoma Park, MD; Crescent Publications, n.d.).

Ramadan Said, *Islamic Law: Its Scope and Equity,* (London: P.R. MacMillan Ltd., 1961).

Razi, Murtaza, *The Frontiers of Pakistan* (Karachi: National Publishing House, 1971).

Rosenau, James N., *International politics and Foreign Policy: A reader in Research and Theory* (New York: Free Press, 1969).

Rosenthal, Erwin, I.J., *Islam in the Modern National State* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1965).

Rosenthal, Erwin, I.J., *Political Thought in Medieval Islam* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1958).

Rubenstein, Alvin Z. (ed.), *The Foreing Policy of the Soviet Union, 2nd ed.* (New York: Random House, 1966).

Safran, Naday, *Egypt in Search of Political Community* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1961).

Schacht, Joseph, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Oxford University Press, 1950).

Shaybani, Muhammad al, *The Islamic Law of Nations,* translated from Arabic by Majid Khadduri (Baltimore: Johns Hopkins University Press,

www.pathagar.com

1966).

Siddiqi, Amir Hasan, *Non-Muslims Under Muslim Rule and Muslims Under Non Muslim Rule* (Karachi: Jamiyatul Falah Publications, n.d.).

Sills, David L. (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences* (New York: MacMillan Free press, 1968).

Smith, Donald Eugene, *Religion and political Development* (Boston: Little, Brown & Co., 1970).

Smith, Wilfred Cantwell, *Islam in Modern History* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957).

Thompson, Jack H. and Reischauer, R.D. (eds.), *Modernization of the Arab World* (New York: Van Nostrand, Inc., 1966).

Toynbee, Arnold, *Civilizationon Trial and The World and the West* (Cleveland: World Publishing Co., 1958).

Turhan, Mumtaz, *Where Are We in Westernization?* translated by David Garwood (Istanbul: Research Centre, Robert College of Istanbul, 1965).

Watt, W. Montgomery, *Muhammad: Prophet and Statesman* (London: Oxford University Press, 1961).

Watt, W. Montgomery, *What is Islam?* (New York: Frederick A. Praeger, 1968).

Ziyadeh, Nicola A., *Syria and Lebanon* (Beirut: LebanonBookshop, 1968).

www.pathagar.com

বি আই আই টি প্রকাশনাসমূহ

1. *A Young Muslim's Guide to Religions in the World (1992) by Dr. Syed. Sajjad Husain*
2. *Islam in Bengali Verse (1992) by Poet Farrukh Ahmad, Translated into English by Dr. Syed Sajjad Husain*
3. *Directory of Specialists (1993) edited by M. Zohurul Islam FCA and Dr. A.K.M. Ahsanullah*
4. *Civilization and Society 1st Print (1994) 2nd Print (2002) by Dr. Syed Sajjad Husain*
5. *Social Laws of Islam (1995) by Shah Abdul Hannan*
6. *ইসলামী উসূলে ফিকাহ (১৯৯৬) মূলঃ ডঃ তাহা জাবির আল আলওয়ানী অনুবাদঃ মুহাঃ নূরল আমীন জাওহার*
7. *Leadership : Western and Islamic (1996) by Dr. M. Anisuzzaman and Prof. Md. Zainul Abedin Majumder*
8. *Guide lines to Islamic Economics : Nature, Concepts and Principles (1996) by Prof. M. Raihan Sharif*
9. *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী (১৯৯৬) মূলঃ বি, আইশা লিমু ও ফাতিমা হীরেন, অনুবাদঃ ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান*
10. *মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক (১৯৯৭)*
    মূল ঃ ডঃ জামাল আল বাদাবী, অনুবাদ ঃ মোঃ শামীম আহসান
11. *Islamization of Academic Disciplines (seminar proceedings) 1997 Edited by M. Zohurul Islam FCA*
12. *কোরআন ও সুন্নাহ ঃ স্থান-কাল-প্রেক্ষিত (১৯৯৭) মূল ঃ ডঃ তাহা জাবির আল-আলওয়ানী ও ডঃ ইমাদ আল দীন খলিল, অনুবাদ ঃ শেখ এনামুল হক*
13. *Origin and Development of Experimental Science (1997) by Dr. Muin-ud Din Ahmad Khan*
14. *রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (১৯৯৮)*
    মূল ঃ আকরাম জিয়া আল উমারী, অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম
15. *ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ (১৯৯৮)*
    মূল ঃ মারওয়ান ইবরাহিম আল-কাইজি, অনুবাদ ঃ শেখ এনামুল হক
16. *Man and Universe (1998)*
    by Maj. Md. Zakaria Kamal
17. *আত-তাওহীদ ঃ চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য (১৯৯৮)*
    মূল ঃ ডঃ ইসমাঈর রাজী আল-ফারুকী, অনুবাদ ঃ অধ্যাপক শাহেদ আলী
18. *Al-Zaka : A Hand Book of Zakah Administration (1999) by M.*

www.pathagar.com

Zohurul Islam FCA

19. *The Islamic Theory of Jihad and The International System (1999) by Md. Moniruzzaman*

20. *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ (২০০০)*
মূল ঃ ডঃ এম উমার চাপরা, অনুবাদ ঃ ডঃ মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব

21. *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (২০০০)*
মুল ঃ ডঃ এম, উমর চাপরা, অনুবাদ ঃ ডঃ মাহমুদ আহমদ

22. *ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ,*
মূল ঃ ডঃ আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান, অনুবাদ ঃ মাওঃ আকরাম ফারুক

23. *Accounting : Philosophy, Ethics and Principles-AnIslamic Perspective by M. Zohurul Islam FCA*

24. *আমাদের সংস্কৃতি ঃ বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ (সেমিনার প্রবন্ধ ও বক্তব্য সংকলন) ২০০১*
সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার

25. *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid (2002) by Prof. Md. Athar Ali*

26. *রসূলের (সঃ) যুগে নারী স্বাধীনতা (২য় খন্ড)*
মূল ঃ আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক
সম্পাদনা ঃ আবদুল মান্নান তালিব

27. *ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*
মূল ঃ ডঃ আবদুলহামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান
অনুবাদ ঃ অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. *রসূলের (সঃ) যুগে নারী স্বাধীনতা (৪র্থ খন্ড), মূল ঃ আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, অনুবাদঃ অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী, সম্পাদনা ঃ আবদুল মান্নান তালিব*

2. *On Openness, Integration and Economic Growth by Dr. M. Kabir Hassan*

3. *A Dynamic Analysis of Trade and Development in Islamic Countries : Selected Case Studies by Dr. Masudul Alam Chowdhury*

4. *The Economy of the Muslim Countries in the New World Order by Dr. M. Kabir Hassan*

5. *ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা ঃ সামাজিক প্রেক্ষাপট (প্রবন্ধ সংকলন) অনুবাদ ঃ এম, রুহুল আমিন*

www.pathagar.com

গ্রন্থকার পরিচিতি

গ্রন্থকার ডঃ আব্দুলহামিদ আহমাদ আবুসুলাইমান ১৯৩৬ খৃঃ মক্কাতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যলয় হতে ১৯৫৯ সালে বাণিজ্যে স্নাতক এবং ১৯৬৩ সালে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম. এ, ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্যানসেলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর ছিলেন। ডঃ আব্দুলহামিদ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বর্তমানে এর প্রেসিডেন্ট। এর পূর্বে ও তিনি অন্য দায়িত্বে যাওয়ার আগে এ প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৬৩-৬৪ সালে সৌদী আরব সরকারের স্টেট প্লানিং কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৮২-৮৪ সালে সৌদি আরবের কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ১৯৭২ খৃঃ এসোসিয়েশন অব মুসলিম সোস্যাল সাইন্টিস্টস্ (AMSS) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ১৯৮৫-৮৮ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ডঃ আবদুলহামিদ ১৯৭৩-৭৯ সালে ওয়ার্ল্ড এসেম্বালী অব মুসলিম ইয়থস্ (WAMY) এর সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন যার অধিকাংশই উম্মাহ এর সংস্কার মূলক। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে *আজমল আল আকল আল মুসলিম (আরবী)*, ক্রাইসিস ইন দ্য মুসলিম মাইন্ড (ইংরেজী), ইসলামিক থিউরী অব ইকোনমিকস ঃ ফিলোসফি এন্ড কন্টেম্পোরারী মিনস্।

ডঃ আবুসুলাইমান অনেক আন্তর্জাতিক শিক্ষা কনফারেন্স এবং সেমিনারের আয়োজনে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

সাম্প্রতিককালে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিশ্ববিবেক সোচ্চার হচ্ছে। ইতোপূর্বে এলক্ষ্যে বিকশিত 'বিশ্বসমাজ আদর্শ' 'লীগ অব নেশনস্' এবং 'কমিউনিজম' স্বীয় আদর্শিক দুর্বলতার ফলশ্রুতিতে মুখথুবড়ে মরেছে। একই কারণে বর্তমান জাতিসংঘের অবস্থাও তেমন আশাপ্রদ নয়।

বর্তমান পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন এমন এক ব্যবস্থা যার পতাকা তলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও অঞ্চল নির্বিশেষে সকল মানুষ যাবতীয় বৈধ অধিকার নিয়ে শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারবে। এরূপ একটি ব্যবস্থার সন্ধানে ব্রতী হলে চিন্তাশীল মানুষের স্মৃতিপটে যে রূপরেখা উদ্ভাসিত হবে সেটি কেবল ইসলামের কালজয়ী আদর্শ থেকেই উৎসারিত হতে পারে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্'র চিন্তাধারায় সুদীর্ঘকালের স্থবিরতা, সনাতন (Classical) যুগের প্রেক্ষিত বিবর্জিত ফিকহ্ এর কতিপয় বির্তকিত সিদ্ধান্ত, ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ এ কালজয়ী আদর্শের বিশ্বজনীন রূপকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে রেখেছে। এ থেকে উৎরিয়ে কাঙ্খিত বিশ্ব ব্যবস্থার আইন কাঠামো ও মূল্যবোধ বিনির্মাণের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করার জন্য দিক নির্দেশনা রয়েছে এ বইতে। 'ইসলাম ও আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক' শিরোণামে অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার অনুদিত বইটির বাংলা সংস্করণ থেকে বাংলা ভাষাভাষী অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে আধুনিক চিন্তা বিকাশের উপাদান পাবেন।

www.pathagar.com